Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামে নারী শিক্ষা (১৯৭১-২০০০ খ্রি.)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের
অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **অভিসন্দর্ভ**

গবেষক
রোজিনা আক্তার
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আবদুল বাছির
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ও
যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
ড. এ.কে.এম. খাদেমুল হক
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জানুয়ারি, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, *'চট্টগ্রামে নারী শিক্ষা (১৯৭১-২০০০ খ্রি.)'* শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণভাবে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে, এই শিরোনামে ইতোপূর্বে কোন গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত। এই অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

(রোজিনা আক্তার)
এম.ফিল দ্বিতীয় বর্ষ
পরীক্ষার রোল নং: ০২
রেজিস্ট্রেশন নং: ১৬১/২০১৬-২০১৭
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমরা এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, জনাব রোজিনা আক্তার কর্তৃক ***'চট্টগ্রামে নারী শিক্ষা (১৯৭১-২০০০ খ্রি.)'*** শীর্ষক এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছেন। এটি আমাদের নির্দেশনায় পরিচালিত গবেষকের একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। গবেষকের বক্তব্য স্পষ্ট ও ভাষা প্রাঞ্জল। এতে ব্যবহৃত তথ্য উপাত্তসমূহ নির্ভরযোগ্য। আমার জানা মতে, এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে অন্য কোন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার জন্য অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপন করা হয়নি।

আমরা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর নিমিত্তে উপস্থাপন করার জন্য সুপারিশ করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

(ড. আবদুল বাছির)
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

(ড. এ.কে.এম. খাদেমুল হক)
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

বাণিজ্যিক রাজধানী বলে খ্যাত চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রাম পাহাড়, সমুদ্র, উপত্যকা প্রভৃতি নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত চট্টগ্রামের অধিবাসীরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে দীর্ঘকাল বসবাস করছে। চট্টগ্রাম কৃষ্টি, কালচার, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যেও বৈচিত্রতা রয়েছে। চট্টগ্রামের বিদ্যাসাধনার ইতিহাসও সুপ্রাচীন। চট্টগ্রামের আদি শিক্ষা কেন্দ্র 'পন্ডিত বিহার' হতে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা অথবা ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত 'চট্টগ্রাম জেলা স্কুল' প্রভৃতি শিক্ষার ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাচীন জনপদ চট্টগ্রাম শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক কিন্তু নারী শিক্ষায় কিছুটা পশ্চাৎপদ। ধর্মীয় ভাবধারা ও ধর্মের চর্চাও চট্টগ্রামের সমাজ ধারায় খুব বেশি প্রকট। রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থা চট্টগ্রামের আধুনিক গতিশীল সমাজ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্থ করছে। প্রাচীন পদ্যকার হীরা মণি, মধ্যযুগের কবি রহিমুন্নেসা, আইনুন্নাহার, আধুনিক যুগের কবি ও লেখক উমরতুল ফজল, ফাহমিদা আমিন, সালমা চৌধুরী, অধ্যাপিকা ফেরদৌস আরা আলীমসহ অসংখ্য মহিলা কবি ও লেখিকার জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলা। বাংলাদেশে আধুনিক ভাস্কর্য শিল্পের পথিকৃৎ নভেরা আহমেদ, ফ্যাশন জগতের আইডল বিবি রাসেল এবং প্রথম *Seven Summits* সম্পন্নকারী পবর্তারোহী ওয়াসফিয়া নাজনীন প্রমুখ চট্টগ্রামেরই মেয়ে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের উজ্জল নক্ষত্র আফরোজা সুলতানা রত্না বা শাবানা ও কবরী সরোয়ারের জন্মভূমি চট্টগ্রাম। বাংলাদেশকে অসংখ্য খ্যাতিমান মহিলা সংগীত তারকা উপহার দিয়েছেন চট্টগ্রাম জেলা। শিক্ষা ও ক্রীড়া জগতেও চট্টগ্রামের নারীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সুনাম অর্জন করেছেন। এতদ্সত্ত্বেও চট্টগ্রামের নারী শিক্ষা কোন এক অদৃশ্য কারণে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। আমি চট্টগ্রামের নারী সমাজের পরিধি ও ব্যাপ্তি অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য কৌতুহলী হয়েছি। 'চট্টগ্রামে নারী শিক্ষা (১৯৭১-২০০০ খ্রি.)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে জমা দেওয়ার সময়েই আমার কৌতুহল নিরসন হয়। এখানে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে আমি চট্টগ্রামে নারী শিক্ষা (১৯৭১-২০০০ খ্রি.) বিষয়ে অভিসন্দর্ভ নির্মাণ করার প্রয়াস গ্রহণ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত: কয়েকটি প্রশ্নকে সামনে রেখেই এ অভিসন্দর্ভটির অবয়ব নির্মাণ করা হয়েছে। ১৯৭১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলার নারী শিক্ষার হার কিরূপ ছিল? বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষানীতি, নারী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ, নারী শিক্ষানীতি, নারী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, জনগণনা জরিপে উপজেলা/থানাওয়ারি শিক্ষার হার, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান কিরূপ? চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার প্রকৃতি ও পরিধি, গঠন ও প্রকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান কিভাবে বিস্তৃতি হয়েছে? এসমস্ত বিষয়াবলীর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনার ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়ে চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার অবস্থাও কিছুটা তুলে ধরা হয়েছে।

এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রী প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত হল। আমার এ গবেষণাপত্র রূপায়নের সর্বক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির এবং অধ্যাপক ড. এ.কে.এম খাদেমুল হক এর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্যতিত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করা সম্ভব হত না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জামান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. আতাউর রহমান মিয়াজী, বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া, সম্মানিত প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. কে.এম গোলাম রাব্বানী, প্রফেসর ড. সিদ্দিকুর রহমান খান, ড. মো. আবদুর রহিমসহ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সকল সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আমাকে গবেষণা করার সুযোগ, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী বিশেষ করে জনাব মো. ছরোয়ার হোসেনকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকা অবস্থায় যে সকল শিক্ষকমন্ডলী আমাকে গবেষণা কাজে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি এর মাননীয় উপাচার্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া (অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. তৌহিদ হোসেন চৌধুরী, প্রফেসর ড. সেকান্দার চৌধুরী, প্রফেসর ড. বশির আহমদ, প্রফেসর সাবিনা নার্গিস লিপি এবং ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী চৌধুরী এর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে যেসকল গ্রন্থাগার, সংস্থা, অফিস, সংগ্রহশালা ও বিশেষ প্রতিষ্ঠান সহায়তা প্রদান করেছে সেগুলি হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গণগ্রন্থাগার ঢাকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর, চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার ঢাকা, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম জেলা শিক্ষা অফিস, চট্টগ্রাম জেলা নির্বাচন কমিশন অফিস, জাতীয় আর্কাইভস, ঢাকা, জাতীয় সংসদ সচিবালয় লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন অফিস উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অফিস ও লাইব্রেরি থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। আমি সংশ্লিষ্ট সকল গ্রন্থাগারিক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অফিস সংশ্লিষ্টদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সর্বশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বাবা আলহাজ্ব ছফুর কোম্পানী ও মা হাজী ছালেহা বেগম এবং আমার জীবন সঙ্গী মোহাম্মদ মীর সাইফুদ্দিন খালেদ চৌধুরীকে। যারা আমার সকল কাজের অনুপ্রেরণার উৎস এবং তাঁদের নিকট আমি চিরঋণে আবদ্ধ।

রোজিনা আক্তার
এম.ফিল দ্বিতীয় বর্ষ
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ঘোষণা পত্র	I
প্রত্যয়ন পত্র	II
মুখবন্ধ	III-V
ভূমিকা	**১-৭**
প্রস্তাবনা	১
গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৪
গবেষণার পরিধি	৪
গবেষণার যৌক্তিকতা	৫
গবেষণা পদ্ধতি	৬
অধ্যায় বিভাজন	৬-৭
প্রথম অধ্যায়	**৮-৫৮**
ব্রিটিশ আমলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও নারী শিক্ষা	**৮**
১.১ প্রাক ব্রিটিশ আমলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা	৮
১.২ ব্রিটিশ আমলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা	১২
১.২.১ বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও শিক্ষার অবনতি	১২
১.২.২ আধুনিক শিক্ষা ও খ্রিষ্টান মিশনারি	১৩
১.২.৩ বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আধুনিক শিক্ষার প্রারম্ভ কাল	১৫
১.২.৪ আধুনিক শিক্ষার প্রসার ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি	১৬
১.২.৫কোম্পানির আধুনিক শিক্ষানীতি	১৮
১.৩ ব্রিটিশ আমলে বাংলায় নারী শিক্ষা	১৯
১.৩.১ বাংলায় আধুনিক নারী শিক্ষার সূচনা ও খ্রিস্টান মিশনারি	২০
১.৩.২ আধুনিক নারী শিক্ষায় দেশীয় প্রচেষ্টা	২১
১.৩.৩ বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক নারী শিক্ষা ও বেথুন স্কুল	২৪
১.৩.৪ নারী শিক্ষার বিকাশ	২৭

Dhaka University Institutional Repository

১.৩.৫ নারী শিক্ষায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ৩১

১.৩.৬ মুসলিম সম্প্রদায়ের নারী শিক্ষায় অগ্রগতি ৩৪

১.৩.৭ বিশ শতকে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ৪০-৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৯-৯৪

বাংলাদেশে শিক্ষার প্রকৃতি ও ধরণ ৫৯

২.১ বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো ৬০

২.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৬১

২.৩ প্রাথমিক শিক্ষা ৬১

২.৩.১ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকরণ ৬২

২.৩.২ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী ৬৩

২.৩.৩ প্রাথমিক শিক্ষাকে আকর্ষণীয়করণ ৬৫

২.৩.৪ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৬৫

২.৩.৫ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ৬৬

২.৪ মাধ্যমিক শিক্ষা ৬৭

২.৪.১ মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো ৬৮

২.৪.২ মাধ্যমিক শিক্ষার বিকাশ ধারা ৭১

২.৪.৩ মাধ্যমিক স্তরে পাঠদানকারী শিক্ষক ৭৩

২.৪.৪ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা ৭৪

২.৪.৫ মাধ্যমিক শিক্ষার দূর্বলতা ৭৫

২.৫ উচ্চ শিক্ষা ৭৫

২.৫.১ উচ্চ শিক্ষা কাঠামো ৭৬

২.৫.২ উচ্চ শিক্ষা বিকাশের ধারা ৭৭

২.৫.২.ক. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৮১

২.৫.২.খ. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ৮২

Dhaka University Institutional Repository

২.৫.৩ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৮২

২.৫.৪ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ ৮৫

২.৫.৫ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ৮৬

২.৬ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ৮৭

২.৭ মাদ্রাসা শিক্ষা ৮৭

২.৭.১ আলিয়া মাদ্রাসা ৮৮

২.৭.২ কওমী মাদ্রাসা ৯০

২.৮ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ৯১

২.৯ বিশেষ শিক্ষা ৯২-৯৪

তৃতীয় অধ্যায় ৯৫-১০৯

বাংলাদেশে নারী শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ ৯৫

৩.১ প্রাথমিক শিক্ষা ৯৫

৩.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ৯৮

৩.৩ উচ্চ শিক্ষা ১০০

৩.৪ মাদ্রাসা শিক্ষা ১০২

৩.৫ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ১০৪

৩.৬ নারী শিক্ষা প্রসারে সরকারের উদ্যোগ ১০৫

৩.৬.১ শিক্ষা উপবৃত্তি ১০৬

৩.৬.২ বালিকা বর্ষ ১০৬

৩.৬.৩ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন ১০৬

৩.৬.৪ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১০৭

৩.৬.৫ নারী উন্নয়ন পরিষদ ১০৮

৩.৭ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও নারী শিক্ষা ১০৮-১০৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় **১১০-১৩৩**

চট্টগ্রাম জেলার শিক্ষার ইতিহাস **১১০**

৪.১ চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষার প্রারম্ভকাল ১১০

৪.২. ব্রিটিশা আমলে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিক্ষার স্কুলসমূহ ১১২

৪.২. ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ১১২

৪.২. খ. প্রাথমিক শিক্ষা ১১২

৪.২. গ. মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১১৪

৪.৩ পাকিস্তান আমল ও স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ ১১৭

৪.৪ কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা ১২০

৪.৫ আইন শিক্ষা ১২১

৪.৬ চিকিৎসা শিক্ষা ১২২

৪.৭ নার্সিং শিক্ষা ১২৩

৪.৮ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ১২৩

৪.৮. ক. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ১২৩

৪.৮. খ. চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমেল সায়েন্স ইউনির্ভাসিটি ১২৫

৪.৮. গ. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১২৫

৪.৮. ঘ. প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা ১২৬

৪.৯ চারুকলা কলেজ ১২৭-১৩৩

পঞ্চম অধ্যায় **১৩৪-১৫১**

চট্টগ্রাম জেলার নারী শিক্ষার ইতিবৃত্ত **১৩৪**

৫.১. আধুনিক নারী শিক্ষার প্রারম্ভকাল ১৩৪

৫.২ নারী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক স্কুলসমূহ ১৩৯

৫.৩ নারী শিক্ষার কলেজসমূহ ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ নারীর উচ্চ শিক্ষা ১৪৫

৫.৫ নারীর চিকিৎসা ও নার্সিং শিক্ষা ১৪৬

৫.৬ নারীর প্রকৌশল, কারিগরি ও অন্যান্য শিক্ষা ১৪৬

৫.৭ এশিয়ান ইউনির্ভাসিটি ফর উইমেন প্রতিষ্ঠা ১৪৭-১৫১

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৫২-১৮৬

চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার প্রকার, ধরণ কাঠামো ও অগ্রগতি ১৫২

৬.১ নারী শিক্ষার প্রকরণ ১৫৩

৬.১.১ চট্টগ্রাম জেলায় নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৫৩

৬.১.২ চট্টগ্রামে সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৫৫

৬.১.৩ চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার প্রকৃতি ১৫৬

৬.২ নারীর ক্ষমতায়ন ১৬২

৬.৩ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে ১৬৪

৬.৩.১ কবি ও সাহিত্যিক ১৬৪

৬.৩.২ রাজনীতি ১৬৭

৬.৩.২. ক নারী ভোটাধিকার আন্দোলন ১৬৭

৬.৩.২. খ. ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৬৭

৬.৩.২. গ. ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ১৬৮

৬.৩.৩. ঘ. বাংলাদেশের রাজনীতি ১৭০

৬.৩.৪ সাংবাদিকতা ১৭৫

৬.৩.৫ সংস্কৃতি ১৭৬

৬.৩.৬ শিক্ষা ১৭৮

৬.৩.৭ চিকিৎসা বিদ্যা ১৭৮

৬.৩.৮ ক্রীড়া ১৭৯-১৮৫

উপসংহার ১৮৬-১৯১

পরিশিষ্ট ১৯৫-২০৮

গ্রন্থপঞ্জি ২০৯-২২৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

প্রস্তাবনা :

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত 'চট্টগ্রাম' একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। পূর্ব বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষা চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র এবং বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবেও পরিচিত। স্বাধীনতাত্তোর সময়ে জেলাটি উত্তর চট্টগ্রাম, দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার মহকুমা (বর্তমানে জেলা) নিয়ে গঠিত হয়। সমগ্র অঞ্চলটির আয়তন ২,৭৮৭ বর্গমাইল। এটি ২০.৩৫ ও ২২.৫৯ উত্তর দ্রাঘিমাংশ এবং ৯১.২৭ ও ৯২.২২ পূর্ব অক্ষাংশে অবস্থিত। ১৯৮৪ সালে কক্সবাজার পৃথক জেলায় রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে উত্তর চট্টগ্রাম, দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও মহানগর নিয়ে চট্টগ্রাম জেলা গঠিত।

১৭৬০ সালের ১৫ অক্টোবর মীর কাশিম ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে 'চট্টগ্রাম' হস্তান্তরিত জেলা হিসেবে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসে। কিন্তু উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত পাঠশালা-টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসা ও কেয়াং, বিহারই ছিল শিক্ষার সর্বজনীন মাধ্যম। ১৯৩৫ সালের জুলাই সংখ্যা 'যুগধর্ম' এ প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, খ্রিস্টান মিশনারিরা ১৮১৮ সালের মধ্যে এলাহবাদ থেকে আকিয়াব পর্যন্ত ১৮০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। যার মধ্যে ১১১টি বিদ্যালয় শ্রীরামপুর মিশনারির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এজন্য তৎকালীন সময়ে চট্টগ্রামে মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ছিল বলে অনুমান করা হয়। ১৮৩৬ সালে 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন' চট্টগ্রামে 'চট্টগ্রাম জেলা স্কুল' নামে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করে। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এখানে সরকারিভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। উনিশ শতকের গোড়ায় মিশনারিরা চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার জন্য পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৯০৮ সালে প্রাথমিক ১৯৫টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল এবং যার ছাত্রী সংখ্যা ৩৯৩৫। মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৮৭৮ সালে চট্টগ্রাম শহরের জামালখানে ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীরের প্রতিষ্ঠিত মধ্য বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বালিকাদের শিক্ষা প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। ১৯০৭ সালে এটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। চট্টগ্রামে ১৮৩৬ সালে প্রথম ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পর নারীদের ইংরেজি বিদ্যালয় গড়ে উঠার কারণ সকল সম্প্রদায়ের নারীরা ছিলেন অন্তঃপুরচারিণী।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামের মুসলিম সমাজে আধুনিক নারী শিক্ষা প্রসারে দেওয়ান হাটের পশ্চিমে ঈদগাহ অঞ্চলের ইব্রাহিম কন্ট্রাক্টর অন্যতম পথিকৃৎ। চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার প্রসারে নূর আহমদ চেয়ারম্যান যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম উপমহাদেশের পৌর এলাকায় বালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করেন। তিনি ১৯২৫ সালে পৌর এলাকার ১৭টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আসমা খাতুন নামে চট্টগ্রাম শহরের ধনিয়ালা পাড়ার এক সম্ভ্রান্ত মহিলা ১৯১৮ সালে নিজ বাড়িতে নারীদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বর্তমানে বিদ্যালয়টি 'পাঠানটুলি মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। নারী শিক্ষার প্রসারে নিবেদিত প্রাণ আম্বিয়া খাতুন নামে আরেকজন মহিলা ১৯২২ সালে নিজ বাসভবনে 'চন্দনপুরা মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়' নামে আরেকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯৩৪ সালে বিদ্যালয়টি 'গোলএজার বেগম বালিকা বিদ্যালয়' এ পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় চট্টগ্রামে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৪। এগুলোর মধ্যে একটি সরকারি ও ৩টি মঞ্জুরি প্রাপ্ত। মহিলাদের কোন স্বতন্ত্র কলেজ ছিল না। চট্টগ্রাম কলেজ ও কানুনগোপাড়া কলেজে সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬৩ সালেও দেখা যায় সমগ্র জেলায় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ১২টি। ১৯৫৭ সালে চট্টগ্রামের মহানগরীতে বেসরকারি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি সরকারিকরণের অনেক বছর পর ১৯৭০ সালে এনায়েত বাজার মহিলা কলেজ বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার শিক্ষার প্রসারের উপর জোর দেয়। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪) অনুযায়ী প্রাথমিক স্কুলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ৩৩ ভাগ, জুনিয়র মাধ্যমিক স্কুলে ২০ ভাগ এবং মাধ্যমিক স্কুলে ১০ ভাগ। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা রক্ষণশীল। সরকার অভিভাবকদের রক্ষণশীল মনোভাবে নারী শিক্ষার গতি শ্লথ না হওয়ার জন্য অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের নিরক্ষতা ও কুসংস্কার দূর করার উপর গুরুত্বরোপ করেছেন। অষ্টম শ্রেণির পর মেয়েরা প্রয়োজনমত মাধ্যমিক স্কুলগুলোর সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সহশিক্ষার বিদ্যালয়গুলোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিকা নিয়োগ করার সুপারিশ করা হয়। ১৯৭৩ সালে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করেছেন এবং ১৯৯৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যা নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। চট্টগ্রামের সমাজ ব্যবস্থা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। অভিভাবকদের রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারের জন্য নারীদের স্কুলে যাওয়ায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য আশির দশকের শুরুতে চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান খুব বেশি ছিল না। সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতেও নারীর সংখ্যা খুবই কম। সমগ্র চট্টগ্রাম জেলায় শিক্ষার চিত্র ছিল নাজুক। আশির দশকে হাটহাজারী থানায় ৪টি, পটিয়ায় ১টি ও কক্সবাজারে ১২টি বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে। উত্তর চট্টগ্রামের একমাত্র মহিলা কলেজ 'কাটিরহাট মহিলা কলেজ' যা ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পূর্বে চট্টগ্রাম মহানগরীতেও মাত্র ৩টি মহিলা কলেজ ছিল। চট্টগ্রাম মহানগরীতে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরী (১৯৯৪-২০০৫) মেয়র থাকাকালীন সময়। এই সময়ে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ৪৪টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১৩টি কলেজ এবং একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে ২৩৪৯টি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। বর্তমানে চট্টগ্রামে ৮৮টি বালিকা বিদ্যালয় এবং ৩১টি মহিলা কলেজ রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ও রয়েছে এবং সহশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে। এছাড়া ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত ডা. খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বর্তমানে মহানগরীতে ১৬টি মহিলা কলেজ রয়েছে। চট্টগ্রামের মেয়েরা রাজনীতি, প্রশাসন, সমাজ সেবা, সাহিত্য, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, সাংবাদিকতা, সংগীত, চলচ্চিত্র, ক্রীড়াসহ বিভিন্ন সেক্টরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত হয়েছেন। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী বীনা দাস, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত থেকে ভাষা সৈনিক ইডেন কলেজ প্রাক্তনী প্রিন্সিপাল চেমন আরা, বাংলাদেশের রাজনীতির কবরী সরোয়ার, লায়লা সিদ্দিকী ও নারী মন্ত্রী কামরুন্নাহার জাফর চট্টগ্রামের রাজনীতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। চট্টগ্রামের কবি রহিমুন্নেসা, কবি আইনুনন্নাহার, লেখিকা রাহাত আরা বেগম, বেগম মুশতারি শফি, উমরতুল ফজল, ফাহমিদা আমিন, রমা চৌধুরী, সেলিনা শেলী প্রমুখ কৃতি নারী মনিষীর লিখনী চট্টগ্রামের সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সাংবাদিক হিসেবে আয়শা সালাম, বিলকিস আজম জহির, মায়মুনা আলী খান অথবা বর্তমান সময়ের ইয়াসমিন ইউসুফ, ডেইজী মওদুদ, পূরবী দাশ গুপ্ত প্রমুখের অবদান অনস্বীকার্য। অন্যদিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে জনপ্রিয় গীতিকার, সংগীত তারকা, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, ফ্যাশন ডিজাইনার প্রভৃতি অঙ্গনেও চট্টগ্রামের মেয়েদের খ্যাতি রয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনেও চট্টগ্রামের মেয়েদের অর্জন ঈর্ষনীয়। সুতরাং চট্টগ্রাম জেলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী এবং মেধা লালন ও বিকাশের একটি উর্বর ক্ষেত্র। এ সকল বিবেচনায় চট্টগ্রামের নারীদের শিক্ষার অধিকতর সুযোগ প্রদান ও কর্মের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি জরুরী। এজন্য আমি গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে ‘চট্টগ্রামে নারী শিক্ষা (১৯৭১-২০০০ খ্রি.)’ নির্বাচন করেছি। চট্টগ্রাম জেলায় নারী শিক্ষার বিষয়ে এ পর্যন্ত বিশদ কোন আলোচনা ও গবেষণা হয়নি। তাই এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

একুশ শতকের বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য শিক্ষিত দক্ষ নারী জনশক্তির প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যমেই গড়ে উঠা দক্ষ জনশক্তি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারবে। বাংলাদেশের পশ্চাদপদ নারী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ একটি জেলা চট্টগ্রাম কিন্তু ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল। চট্টগ্রাম জেলার নারী শিক্ষার অগ্রগতি স্বাধীনতাত্তোর কালে আশানুরূপ হয়নি। এ জেলায় নারী শিক্ষার অগ্রগতি ১৯৭১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত খুবই কম। চট্টগ্রাম জেলায় নারীর আধুনিক শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিশ্লেষণ ও কর্মকৌশল নির্ধারণ জরুরী। একজন গবেষক হিসেবে আমি মনে করি, চট্টগ্রামের নারী শিক্ষার ১৯৭১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ যাচাই এবং পর্যালোচনা প্রয়োজন। এ সময়ে চট্টগ্রাম জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার পরিবেশ, নারীদের স্কুল-কলেজ গমণের হার, নারী শিক্ষার অগ্রগতি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং কর্মক্ষেত্রে অবদান পর্যালোচনা জরুরী। চট্টগ্রাম জেলায় আলোচ্য সময়ে নারী সমাজের এসকল তথ্য-উপাত্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং শিক্ষার পরিবেশ ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের মাধ্যমে নারী শিক্ষা অগ্রগতিতে সহায়তা করাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারী শিক্ষার অগ্রগতি এবং শিক্ষিত, দক্ষ জনশক্তি হিসাবে নারীকে জনসম্পদে পরিণত করলে সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সহায়ক হবে। এ সকল বিবেচনায় চট্টগ্রামে নারী শিক্ষায় উল্লেখিত সময়ের অগ্রগতি সম্পর্কে গবেষণা অপরিহার্য।

গবেষণার পরিধিঃ

চট্টগ্রাম জেলায় মুসলিম নারী শিক্ষার চিত্র বাংলাদেশের অন্য যে কোন জেলার চেয়ে আলাদা। আমার আলোচ্য গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়াবলী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ক) ১৯৭১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলার নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা, সরকারের শিক্ষানীতি, সরকারের নারী শিক্ষানীতি ও বিভিন্ন আদেশসমূহ বিশ্লেষণ করা।

খ) উক্ত সময়ের নারীদের স্কুল-কলেজে গমণের হার, নারী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান নিরূপন।

গ) ১৯৭১ সালের পূর্বে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে জনগণনা জরিপসহ নারী শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা।

ঘ) ১৯৭১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলায় নারীর শিক্ষায় অগ্রগতি, নারীর ক্ষমতায়ন ও জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান বিশ্লেষণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার যৌক্তিকতাঃ

স্বাধীন বাংলাদেশের রজত জয়ন্তী ২০২১ সাল। এ সময় বাংলাদেশে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়। জাতিসংঘের ২০০০ সালে ঘোষিত '*Millennium Development Goals (MDGs)*' অর্জনের জন্য বাংলাদেশের নারী শিশুকে অধিকতর স্কুলগামী করা, নারীর ক্ষমতায়ন, বয়স্ক নারীদের শিক্ষার মাধ্যমে কর্মদক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। এ সকল শিক্ষিত নারী অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদের দারিদ্রতা দূর করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশ কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে (MDGs Goals, 2030) প্রয়োজন নারীকে শতভাগ শিক্ষিত করা। তবেই বাংলাদেশের *Sustainable Development Goals* বা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য অর্জনের জন্যও দেশের সর্বস্তরের নাগরিকের শতভাগ শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান বাংলাদেশের জনসংখ্যার নারী ও পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান। এমতাবস্থায় নারী সমাজের উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ব্যতিত সরকারের লক্ষ্য অর্জন প্রায় অসম্ভব। নারীকে আধুনিক শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর এবং সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কর্মদক্ষতাকে ব্যবহারের মাধ্যমেই কেবল উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সম্ভব।

এক্ষেত্রে সমগ্র বাংলাদেশের সকল জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে শিক্ষার কর্মসূচি প্রয়োজন। বর্তমান সরকারও এ লক্ষ্যে কাজ করছে। বাংলাদেশের একটি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ জেলা চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম জেলা বন্দর, শিল্প, প্রবাসীদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়, কৃষিসহ অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবে ধর্মীয়ভাবাপন্ন এবং সমাজও তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল। আমার গবেষণার আলোচ্য সময়ে চট্টগ্রামের নারী শিশুদের স্কুল গমণ হার, নারীর ক্ষমতায়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং সামাজিক উন্নয়নের ধারা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এ গবেষণার মাধ্যমে চট্টগ্রামে নারী সমাজের বাস্তবতা উপলব্ধির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ প্রয়োজন মনে করি। এতে চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও গতিশীল হবে। বাংলাদেশের 'অর্থনৈতিক হাব' চট্টগ্রামের অগ্রগতি জাতীয় অর্থনীতিকেও সমৃদ্ধ করবে। আমার 'চট্টগ্রামের নারী শিক্ষা ১৯৭১ থেকে ২০০০ খ্রি.' গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশ সরকারের যৌক্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে বলে মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতিঃ

গবেষণাটি মূলতঃ মৌলিক উৎসের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে দ্বৈতীয়িক উৎসের সহায়তা নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টাটিসটিকস রিপোর্ট, জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, সরকারি প্রশাসনিক কাগজপত্র এবং অফিসিয়াল রেকর্ড, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রেকর্ড ইত্যাদি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলা শিক্ষা অফিস, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদসহ চট্টগ্রামের স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি অফিসও এসব প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তের উৎস। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন থানা ও মহানগরের স্কুল, কলেজ, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে দেশী-বিদেশী বই, গবেষণা রিপোর্ট, জার্নাল প্রভৃতি বিবেচনা করা হয়েছে। মৌলিক উৎস সমূহের মধ্যে অপ্রকাশিত রেকর্ড, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টাটিসটিকস রিপোর্ট, জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, সরকারি প্রশাসনিক কাগজ পত্র এবং অফিসিয়াল রেকর্ড ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও জার্নাল, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং গবেষণার রিপোর্ট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন থানা ও মহানগরের স্কুল, কলেজ, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন পেশার নারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এসব তথ্যাবলী কোয়ালিটেটিভ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজনঃ

অভিসন্দর্ভটির 'ভূমিকা'-শিরোনামে গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুবিশ্লেষণ, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণার যৌক্তিকতা, গবেষণা পদ্ধতি, ও অধ্যায় বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ 'ব্রিটিশ আমলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও নারী শিক্ষা'-শিরোনামের এ অধ্যায়টিতে ব্রিটিশামলে বাংলায় আধুনিক শিক্ষার প্রসার, চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষার বিস্তৃতি, বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসার এবং চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার প্রারম্ভকাল আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ 'বাংলাদেশে শিক্ষার প্রকৃতি ও ধরণ'-শিরোনামে বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা, মাদ্রাসা শিক্ষা, নারী শিক্ষা প্রভৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত বর্ণনা এ অধ্যায়ে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়: 'বাংলাদেশে নারী শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ'-শিরোনামে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নারী শিক্ষার বাস্তব চিত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। নারী শিক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এ অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: 'চট্টগ্রাম জেলার শিক্ষার ইতিহাস' শিরোনামের অধ্যায়টিতে চট্টগ্রাম জেলায় আধুনিক শিক্ষার প্রারম্ভকাল, আধুনিক শিক্ষার বিস্তার, বর্তমান সময়ে শিক্ষার চিত্র এবং নারী শিক্ষার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: 'চট্টগ্রাম জেলার নারী শিক্ষার ইতিবৃত্ত' শিরোনামে অধ্যায়টিতে চট্টগ্রাম জেলার নারীর আধুনিক শিক্ষার প্রারম্ভকাল, ব্রিটিশ আমালে নারী শিক্ষার স্বরূপ, স্বাধীন বাংলাদেশে নারী শিক্ষা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: 'চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার প্রকার, ধরণ, কাঠামো ও অগ্রগতি' শিরোনামে অধ্যায়টিতে চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার প্রকৃতি, ধরণ ও কাঠামো, নারীর শিক্ষার হার, স্কুল গমণের হার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চট্টগ্রামের নারীদের অবদান পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে 'উপসংহার' এ গবেষণার সারসংক্ষেপ ও গবেষকের নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গি এবং নারী শিক্ষা উন্নয়নের কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ব্রিটিশ আমলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও নারী শিক্ষা

পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রি.) ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জয় লাভের মধ্য দিয়ে এদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা (১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রি.) এর পতনে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় হাজার বছরের অতীত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন পদ্ধতির পরিবর্তন সূচিত হয়। ব্রিটিশদের প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা ভারত তথা বাংলার সমাজ ও জাতীয় জীবনে নূতন ভাবধারার সৃষ্টি করে। তৎকালীন সরকারের নারী শিক্ষার পৃষ্টপোষকতায় গতিশীল সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এই আধুনিক নারী শিক্ষা বিংশ শতাব্দীতে পরিবার, সমাজ ও রাজনীতিতে নবধারার সংযোজন করেছে এবং জাতীয় মুক্তি অর্জিত হয়েছে।

১.১ প্রাক ব্রিটিশ আমলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা

ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ পর্যন্ত (১৭৫৭ খ্রি.) প্রায় ১০২ জন মুসলিম শাসক অথবা রাজা বাংলা শাসন করেন।[১] তাদের অনেকেই আফগান, তুর্কি, মুঘল, পারসিক বা আরব বংশোদ্ভুত। এসব শাসকগণ রাজনৈতিক চিন্তার সাথে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য এদেশে নিয়ে আসেন এবং সর্বোপায়ে শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে সচেষ্ট হন। বাংলায় সুলতানি আমলের শাসকগণ (১২০৪-১৫৭৬ খ্রি.) জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য স্মরণীয়। অপরদিকে বাংলায় মুঘল শাসকগণও (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি.) শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের পান্ডিত্য, বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য বিখ্যাত। এদেশে মুঘল শাসনের সূচনা হলে উত্তর ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষক, চিকিৎসক, শিল্পী, কারিগর ও অন্যান্য পেশার ব্যক্তির অধিক হারে বাংলায় আগমণে বাংলার বুদ্ধিদীপ্ত জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন হয়।[২] মুঘল সুবেদারগণের শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার অবকাঠামো ও ঐতিহ্য বাংলার নবাবগণও অব্যাহত রাখেন। কথিত আছে, নবাব মুর্শিদকুলি খান ২৫০০ বিদ্বান ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।[৩] নবাব আলীবর্দী খানও উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও বাগ্মিতার জন্য বিখ্যাত। তাঁর দরবারের খ্যাতনামা আলেম ও পন্ডিতদের মধ্যে যায়ির হোসেন খান, তকী কুলি খান, মৌলবি নাসিরের পুত্র আলী ইব্রাহিম খান, হাজি মুহাম্মদ খান, মীর মুহাম্মদ আলী ফাজিল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান আলী ফাজিলের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার এবং এতে প্রায় দু'হাজার গ্রন্থের তথ্য সিয়ারুল মুতাখ্‌খেরীনের অনুবাদক হাজি মুস্তফা উল্লেখ করেন।[৪]

প্রাক ব্রিটিশ আমলে শিক্ষার সামগ্রিক পর্যালোচনায় তিনটি দিক পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত: বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র সমূহ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত: হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থা টিকে থাকলেও ধারাটি ক্ষীণ হয়ে যায়। তৃতীয়ত: রাজশক্তির আনুকূল্য লাভ করে শক্তিশালী ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা। এই ত্রিধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। হিন্দু ও ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে একটি সমন্বয় সাধিত হয়েছে।[৫]

মধ্যযুগে বাংলায় অসংখ্য আরবি-ফার্সি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মক্তব-মাদ্রাসা গড়ে উঠে। মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার প্রাথমিক কেন্দ্রসমূহকে মক্তব ও উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রসমূহকে মাদ্রাসা বলা হয়। অ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে (১৮৩৫-১৮৩৮ খ্রি.) বাংলায় এক লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল বলে উল্লেখ করেন।[৬] এ প্রসঙ্গে এম.এ. রহিমের মত হচ্ছে, অ্যাডাম কর্তৃক উল্লেখিত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ হচ্ছে মুসলিম শাসনামলে স্থাপিত এবং অধিকাংশ পুরানো মক্তব।[৭] প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য ফার্সি ও আরবির সাথে বাংলা ভাষা শিক্ষারও প্রচলন ছিল। ষোড়শ শতকের মুসলিম কবি বাহরমের বর্ণনানুসারে বালক-বালিকারা উভয়ে একই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করত।[৮] এতে ধারণা করা যায় যে, তৎকালীন সময়ে সহশিক্ষার প্রচলন ছিল। মুসলিম বিজয়ের পর বাংলার লখনৌতি বা গৌড়, সাতগাঁও, তান্ডা, ফিরোজাবাদ (পান্ডুয়া) সোনারগাঁও, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি সরকারের প্রধান কেন্দ্র বা রাজধানী উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রও ছিল। তাছাড়া মহিসুন (রাজশাহী), নাগর, মান্দারণ, বাঘা, রংপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে গড়ে উঠা মাদ্রাসায় সুবিখ্যাত পন্ডিতগণ পাঠদান করতেন। এসব উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে বাংলা তথা ভারত ও বহির্বিশ্বের জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রগণ ভীড় করত।[৯] শিরিন মুসভি মুঘল আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার আলোচনায় ত্রিস্তর শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। প্রথমস্তরে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল মক্তব বা দাবিস্তান। দ্বিতীয়ত: সামান্য উচ্চশিক্ষা ও মূলত ধর্মীয় শিক্ষার জন্য ছিল মাদ্রাসা। তৃতীয়ত: উচ্চ শিক্ষার জন্য ছিল ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান যেখানে ইনশারা লিখন ও সিয়াক লিখন শেখানো হত অর্থাৎ হিসাবশাস্ত্র, ফরমান, নানাবিধ হুকুমের মুসাবিদা করা শেখানো হত, যা আমলা হয়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছিল।[১০] ১৪৬৮-৬৯ খ্রি. রচিত শব্দার্থকোষ "মিস্তাউল ফজলব শাহবাদী'- এর মুদ্রিত ক্ষুদ্রচিত্তে লক্ষ্য করা যায় যে, একটি মক্তবে একজন বালিকা সম্ভবত তার ভাইয়ের পাশে বসে একটি কাষ্টখন্ডে নাম লেখার চেষ্টা করছে। এরূপ কাষ্ঠখন্ডকে 'তখতি' বলা হয়। বালিকাটির পাশে রয়েছে আরেকজন বালক সম্ভবত তার ভাই এবং বালিকাটির সম্মুখে বসে তাকে জনৈক পুরুষ শিক্ষক শেখাচ্ছেন।[১১] এতে মক্তবে ছাত্র-ছাত্রী উভয়ের পড়াশোনার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া মুসলমান রাজা বাদশাহ্গণ দ্বারা

প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন 'জেনানা স্কুল'-এর কথাও জানা যায়। বাংলার মুসলমানদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশংসা করে এ.এম.ই.সি. বেইলি বলেন:

> "They possessed a system of education which,' to use the words of the Indian statesman who knows them best, 'however inferior to that which we have established, was yet by no means to be despised; was capable of affording a high degree of intellectual training and polish; was founded on principles not wholly unsound, though presented in an antiquated form; and which was infinitely superior to any other system of education then existing in India;-a system which secured to them an intellectual as well as a material supremacy, and through the medium of which alone the Hindus could hope to fit themselves for the smallest share of authority in their native country."[১২]

মধ্যযুগে হিন্দুদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়, টোল ও চতুষ্পাঠী প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে প্রচলিত ছিল। টোল ও চতুষ্পাঠীগুলোতে ব্রাহ্মণ বালকরাই শিক্ষা গ্রহণ করত এবং ক্ষেত্র বিশেষে অল্পসংখ্যক উচ্চবর্ণের ছাত্রও পড়ার সুযোগ পেত। নিম্নবর্ণের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠশালার ব্যবস্থা করা হয়।[১৩] মূলত: মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও সার্বজনীন শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি ও শিক্ষায় ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদ খর্ব হয়। বৈষ্ণব গুরু শ্রী চৈতন্য (১৪৮৫/৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) সকল শ্রেণির জন্য সাম্য ও সমান অধিকার ঘোষণা করায় ব্রাহ্মণগণ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিম শাসকের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন।[১৪] অবশ্য এতে ব্রাহ্মণদের আপত্তি মুসলিম শাসকগণ অগ্রাহ্য করে শিক্ষার অবারিত সুযোগ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেন। মুসলিম শাসকগণ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে লাখেরাজ সম্পত্তি (করমুক্ত ভূমি) প্রদান করতেন, মুর্শিদাবাদ এস্টেটের দেওয়ান ফজলে রাব্বি (১৮৪৯-১৯১৭ খ্রি.) হিন্দুদের জন্য পাঁচ প্রকার লাখেরাজ সম্পত্তি প্রচলনের কথা উল্লেখ করেন।[১৫] 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামক কাব্যে মুসলিম শাসনামলে হিন্দু নিম্ন শ্রেণির 'হরি' ও 'সউদ' গণ দলিল পত্র পড়া ও লেখার মত শিক্ষিত ছিলেন বলে জনৈক হিন্দু কবি উল্লেখ করেন।[১৬] হিন্দু শিক্ষার্থীগণ প্রাথমিক শিক্ষা পাঠশালায় গ্রহণ করত। হিন্দু বালিকারাও পাঠশালার শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করত। 'সারদামঙ্গল' কাব্যে সপ্তদশ শতকের একটি পাঠশালায় পাঁচ জন রাজ্য কন্যার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়।[১৭] 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' সূত্রে দেখা যায়, ব্যাধ নারী ফুল্লরা, বিপুলা ও রাজদেবীর হিন্দুশাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।[১৮] এই সময়ে হিন্দু সমাজে ফার্সি শিক্ষারও প্রসার লাভ করেছে। সরকারি চাকুরী পাওয়ার আশায় হিন্দুরা সুলতান ইব্রাহিম লোদীর (১৫১৭-১৬২৬ খ্রি.) শাসনকালে ফার্সি শেখা আরম্ভ করে।[১৯] মুসলমানদের পরিচালিত ফার্সি শিক্ষার বিদ্যালয়সমূহে হিন্দু ছাত্ররা ব্যাপক হারে অধ্যয়ন করত। অনেকক্ষেত্রে হিন্দু ছাত্ররা

আরবি ভাষাও শিক্ষা গ্রহণ করত। অ্যাডামের রিপোর্টে দেখা যায় যে, বাংলার অনেক অঞ্চলে আরবি ফার্সির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ছাত্র সংখ্যায় মুসলিম ছাত্রের তুলনায় অনেক বেশি ছিল।[২০] মুসলিম শাসনামলে নবদ্বীপ, সাতগাঁও, ফুল্লশ্রী (বরিশাল), সিলেট, চট্টগ্রাম, বিষ্ণপুর (বাকুড়া) প্রভৃতি অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল।[২১]

হিন্দু শাসকদের আমলে ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির একমাত্র মাধ্যম সংস্কৃত ভাষাটি রাজদরবারের ভাষা হিসেবেও আধিপত্য বজায় রাখে। বাংলায় সাধারণ জনগণের মাতৃভাষা বাংলা শাসকশ্রেণির ঘৃণা ও অবহেলার শিকার হয়।[২২] মুসলমান শাসকগণই প্রথম রাষ্ট্র এবং সমাজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁরা বাঙালি কবি ও পন্ডিতদের রাজদরবারে আমন্ত্রণ করেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় সহযোগিতা করেন। মুসলিম শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতা ও মুসলিম কবিদের বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ এবং চর্চার ফলে এটির মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।[২৩] বাংলার স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের মাধ্যমেই বাঙালির ইতিহাসের সুচনা হয় এবং বাঙালি সমাজ, সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে ইউসুফ জুলেখা, ভগবৎ, শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, মনসা মঙ্গল, মনসা বিজয়, মহাভারত ও রামায়ণের অনুবাদ, বিদ্যাসুন্দর, চণ্ডীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, লায়লী-মজনুঁসহ অসংখ্য সাহিত্যকর্মের সৃষ্টি হয়। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯ খ্রি.) বাংলা সাহিত্যে মুসলিম শাসকদের অবদান স্বীকার পূর্বক ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন:

> "হিন্দু রাজাদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকলে বাংলা ভাষা রাজদরবারে স্থান লাভ করার কোন সুযোগই পেত না। এমনিভাবে মুসলিম শাসক ও আমির ওমরাহ্‌র পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহের ফলে হিন্দু জমিদারগণ বাঙালি কবিদের প্রতি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে অনুপ্রাণিত হন।"[২৪]

মুসলমানদের ইতিহাস লিখন পদ্ধতির প্রর্বতন, লেখার উপাদান হিসেবে কাগজের ব্যবহার, পুস্তক নকলকরণ ও বিতরণ এবং শিক্ষাকে সার্বজনীন প্রসারে পদক্ষেপসমূহে বাংলায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মুসলমানদের কার্যাবলী প্রশংসা করে যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮ খ্রি.) বলেন, "পুস্তক বিতরণ ও নকলকরণের দ্বারা জ্ঞানবিস্তার রীতির জন্য আমরা মুসলমানদের নিকট ঋণী। অথচ সাধারণ রীতি হিসেবে প্রাথমিক যুগের হিন্দু লেখকগণ তাঁদের রচনাবলী গোপন রাখতে ভালবাসতেন।"[২৫] আরবি, ফার্সি সাহিত্যের বিপুল সম্পদ ও শব্দকোষ বাংলা ভাষায় সংযোজন এবং সাহিত্যের চর্চার মাধ্যমে বাংলা ভাষার উৎকর্ষতার সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষাটির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

১.২ ব্রিটিশ আমলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

প্রাক ব্রিটিশামলে বাংলায় মক্তব, মাদ্রাসা, টোল ও চতুষ্পাঠী ভিত্তিক হিন্দু ও মুসলমানের উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭ খ্রি.), বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৬৯-১৭৭০ খ্রি.) ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ খ্রি.) প্রভৃতির ফলে বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। ফলশ্রুতিতে বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ব্যবস্থাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে খ্রিস্টান মিশনারীগণ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় আধুনিক শিক্ষার গোড়াপত্তন করে, যা এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

১.২.১ বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও শিক্ষার অবনতিঃ

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৭ খ্রি. রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ১৭৬৫ খ্রি. দেওয়ানি লাভ করে। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাগণ অপশাসন, শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়। কোম্পানি দেওয়ানি লাভের প্রথম বৎসরেই (১৭৬৫-১৭৬৬ খ্রি.) বাংলা অঞ্চল থেকেই ১৬,৮১৪২৭ পাউন্ড রাজস্ব আদায় করে।[২৬] তাছাড়াও বিভিন্ন প্রকার কর প্রজাদের নিকট থেকে আদায় করে। রাজস্ব আদায়ে কোন রকম সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় নির্মম শোষণের দরুণ ১৭৬৯-৭০ সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষে দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায় এবং এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে ও ঘনবসতি এলাকা জঙ্গলে পরিণত হয়।[২৭] এমতাবস্থায় দেশে ভূমি রাজস্ব তথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বাংলার গর্ভণ ওয়ারেন হেস্টিংসের (১৭৭২-১৭৮৫ খ্রি.) প্রত্যেক জেলায় ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ এবং 'পাঁচশালা বন্দোবস্ত' ও 'একসালা বন্দোবস্ত' প্রবর্তনে পুরাতন জমিদারগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অপরদিকে প্রজাসাধারণ এর দুঃখ, দুর্দশা বাড়তে থাকে। ১৭৯৩ খ্রি. লর্ড কর্ণওয়ালিশের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব্যবস্থায় বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু পুরাতন জমিদারি হারিয়ে যায়। কিন্তু নব্য হিন্দু ধনিক শ্রেণি নতুন জমিদারি লাভ করে। ব্রিটিশ সিভিলিয়ন মি. জেমস ও কেনেলি মন্তব্য করেন, "রাজস্ব বিভাগের সামান্য পদে কর্মরত হিন্দু কর্মচারী এই বন্দোবস্তে জমিদার পদমর্যাদা লাভ করে। জমির মালিকানার অধিকার ও সম্পদ আহরণে তাদেরকে সুযোগ প্রদান করা হয়, অথচ মুসলিমরা নিজেদের শাসনকালে একচেটিয়াভাবে এসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে।[২৮] মুসলিম আমলের লাখেরাজ সম্পত্তি মুর্শিদাবাদের দেওয়ান খন্দকার ফজলে রাব্বি ২৭ প্রকার ভোগ দখলকারীর নাম বর্ণনা করেছেন। এসব সম্পত্তির সাত প্রকার হিন্দু সম্প্রদায় ও পনের প্রকার মুসলমানেরা ভোগ করত। 'আয়মা' ও 'মদদ'-ই মাশ' নামক লাখেরাজ সম্পত্তির আয়ে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পন্ডিত ব্যক্তিদের ব্যয় নির্বাহ করা হত। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সকল লাখেরাজ সম্পত্তির দানপত্রের উপযুক্ত প্রমাণ দাখিলের জন্য একটি আদেশ জারি করেন।[২৯] শত শত বৎসর পুরানো দলিলপত্র বিভিন্ন কারণে হারিয়ে যাওয়া এবং সরকারের নানা আইন

প্রবর্তন, বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন মিথ্যা মামলা ও অপকৌশলের দরুণ ১৮২৮ খ্রি. পর্যন্ত অধিকাংশ লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। রাজা রামমোহন রায় লাখেরাজ সম্পত্তি সম্পর্কে সুবিচার লাভের আশায় ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে পর্যন্ত আবেদন করেন কিন্তু সফল হননি।[৩০] লাখেরাজ আইনে কোন কোন জেলায় শতকরা ৮৮ জনের নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়।[৩১] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় বাংলার শত শত পুরানো অভিজাত মুসলিম পরিবারগুলো ধ্বংস হয় এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অপমৃত্যু ঘটে।[৩২] ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ খ্রি. পর্যন্ত অ্যাডামের বাংলা ও বিহারের শিক্ষা ব্যবস্থার রিপোর্টে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের দূর্দশার তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারি চাকুরীতে মুসলমানরা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। বাংলার কৃষক, তাঁতীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ নানা প্রকার শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ঠ হয়েছে। বিশেষতঃ বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের এই দুর্দশা অর্থনৈতিক কাঠামোতেও আঘাত করে। ইংরেজ প্রভাবিত নব্য সামাজিক ধারায় সমাজের এই বৃহৎ অংশটি নি:স্ব হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে তৎকালীন শিক্ষা কাঠামোটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সিভিলিয়ান উইলিয়াম হান্টার (১৮৪০-১৯০০ খ্রি.) এর মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

> "Hundreds of ancient families were ruined and the educational system of the musalmans which was almost entirely maintained by rent, free grants, received its death blow. The scholastic classes of the Muhammadans emerged from the eighteen years of harrying absolutely ruined."[৩৩]

১.২.২ আধুনিক শিক্ষা ও খ্রিষ্টান মিশনারি:

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যের সুর্বণ যুগে মিশনারীদের সহায়তায় শিক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়। মূলত খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য শিক্ষা প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেছেন। ১৬৯৮ খ্রি. কোম্পানির সনদে পাদ্রীদের ধর্মপ্রচারকে উৎসাহিত করেছে এবং প্রত্যেক কুঠি বা সেনানি অবস্থানে স্কুল খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাছাড়া ইংল্যান্ড থেকে আসা জাহাজ সমূহে অন্তত: একজন পাদ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়।[৩৪] ইংল্যান্ড থেকে পাদ্রী পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয় কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গকে খ্রিষ্টান ধর্মাচরণে সহায়তা করা। দ্বিতীয়ত: ইউরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয় শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত: ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করে তাদের ধর্মান্তরিত করা। ভারতে ইংরেজ কোম্পানি *'Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK)'*-কে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য প্রদান করে কোম্পানি স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়। মাদ্রাজের সেন্ট মেরী (১৭১৫ খ্রি.), বোম্বাই এর কব (১৭১৯ খ্রি.) এবং কলকাতার বেলারমী (১৭২০ খ্রি.) দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩৫] কার্য়েনান্ডার ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ১৭৪২

খ্রি. কোর্ট সেন্ট ডেভিডে একটি দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দক্ষিণ ভারতে সোয়ার্জ শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন, তিনি অঞ্জোয়, ত্রিচিন পল্লী, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মহীশূয়ের হায়দার আলী সোয়ার্জকে আর্থিক সহায়তা দান করেন এবং মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঞ্জোরো ইংরেজ রেসিডেন্ট সুলিভানের উৎসাহে তিনি তাঞ্জোর, রামনাদ ও শিবগঞ্জে তিনটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৭৮৭ খ্রি. ইংল্যান্ডের বোর্ড অব ডিরেক্টরস প্রতি বিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক অনুদান মঞ্জুর করেন। এতে বলা হয় এই বিদ্যালয়সমূহ ছাড়াও ইংরেজি শিক্ষার জন্য নূতন কোন বিদ্যালয় চালু হলে তারাও এই অনুদান পাবে।[৩৬] এই মহতী প্রচেষ্ঠা ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে।

১৭২০ খ্রি. বিলেরামি প্রতিষ্ঠিত স্কুলের মাধ্যমে বাংলায় আধুনিক শিক্ষার শুরু হয়। ১৭১৯ খ্রি. *The Society for promoting Christian Knowledge* নামে একটি সমিতি কলিকাতায় আসে এবং ১৭৩১ খ্রি. একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে। এই প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের আহার ও পরিধেয় বস্ত্র বিনামূল্যে দেওয়া হত।[৩৭] ১৭৫৮ খ্রি. *Zacharich Kiernander* নামে সুইডেনের একজন পাদ্রী কলকাতায় আরেকটি ইংরেজি বিদ্যালয় খোলেন। এই বিদ্যালয়ে ইউরোপীয় ও ভারতীয় গরীব ছেলেরা বিনামূল্যে শিক্ষা লাভ করত। অবশ্য তাদের শিক্ষা সাধারণ নীতি ও খ্রিষ্টীয় উপদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে বিদ্যালয়টি জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং ৪ মাসের মধ্যে ৪০ জন ছাত্র ভর্তি হয়।[৩৮] ১৭৮০ খ্রি. মি. আচার্য শুধু বালকদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে বালক ও বালিকা উভয়ের পড়ালেখার সুযোগ হয়। ১৭৮৯ খ্রি. *'The Free School Society'* নামেও একটি স্কুল স্থাপিত হয়। মিশনারীদের উপমহাদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের প্রধান উদ্দেশ্য খ্রিস্টধর্ম প্রচার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের পৃষ্ঠপোষকতা করেনি। বরং খ্রিষ্টান মিশনারীদের শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারে বাধা প্রদান করে। কোম্পানি মূলত: সুষ্ঠুভাবে দেশ শাসন ও ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি না করার জন্য শিক্ষায় নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে। এজন্য মি. ব্রাউন, চার্লস গ্রান্ট (১৭৪৬-১৮২৩), ডা. জন থমাস প্রমুখ কলকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।[৩৯] ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ চার্লস গ্রান্ট, উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪), ডা. জন থমাস প্রমুখ ১৭৯৩ খ্রি. অক্টোবরে ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।[৪০] তাঁরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উইলভার ফোর্সের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করেন। এই সোসাইটি হিন্দু সম্প্রদায়ের সতীদাহ, শিশু সন্তান হত্যাসহ বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরোধিতা করেন। এসব দূর করার জন্য ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ও খ্রিষ্টধর্মের গুরুত্ব উপস্থাপন করে। *Evangelist* নামে পরিচিত এসব শিক্ষাবিদ মিশনারীদের প্রধান কেন্দ্র লণ্ডনের *Glapham Street* এ হওয়ায় এই

গোষ্ঠীকে *Clapham Sect* ও বলা হয়।[৪১] *Evangelist* এর অন্যতম নেতা চার্লস গ্রান্টের লিখিত দুটি পুস্তিকায় (১৭৯২ খ্রি.) ভারতে খ্রিষ্টান পাদ্রীদের অবাধ প্রবেশাধিকার এবং ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে এদেশীয়দের হৃদয়ে 'আলো' ও 'জ্ঞান' বিকিরণের সুযোগ দেয়ার প্রস্তাব করেন।[৪২] এটি বাস্তবায়নের জন্য ১৭৯৩ খ্রি. উইলিয়াম উইলভার ফোর্স পার্লামেন্টে দাবী করলেও গৃহীত হয়নি। এতদ্সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে উইলিয়াম কেরি, জন ক্লাক ম্যার্শমান, উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারীগণ বাংলায় আগমণ করেন এবং শ্রীরামপুর মিশনের (১৮০০ খ্রি.) গোড়াপত্তন করেন।[৪৩] এই মিশন বাংলায় সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা দূরীকরণে সহায়তা করে। কেন্দ্রীয় নির্দেশনা না থাকলেও গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং কেরিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।[৪৪] অন্যদিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টও মিশনারীদের দাবীকে গ্রাহ্য করে এবং ১৮১৩ খ্রি. চার্টারে ভারতীয়দের শিক্ষাখাতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই চার্টারের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের শিক্ষাদানের দায়িত্ব কোম্পানিকে দেওয়া হয়। মিশনারীরা পাশ্চাত্য স্কুলের অনুকরণে স্কুল স্থাপনের অনুমতি পায়।[৪৫]

এই সময়ে খ্রিস্টান মিশনারীদের তৎপরতা নবোদ্যমে শুরু হয়। মিশনারীগণ ১৮১৮ খ্রি. পর্যন্ত কলকাতা ঢাকা, হাওড়া, ২৪ পরগণা, চুচূঁড়া, যশোরসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ১৮০টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১৩৩৪৭।[৪৬] ১৮১৮ খ্রি. ২৩ মে শ্রীরামপুর থেকে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচারদর্পন' প্রকাশিত হয়। ব্যাপটিস্ট মিশনারীগণ শ্রীরামপুরে একটি কলেজও ঐ বছরে প্রতিষ্ঠা করেন। দিনেমার সরকারের একটি সনদমূলে কলেজটি শিক্ষার্থীদের ডিগ্রী প্রদানের অধিকার অর্জন করে। এটি ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মিশনারী কলেজ। মিশনারীদের দ্বিতীয় কলেজটি শিবপুরে স্থাপিত 'বিশপস্ কলেজ' (১৮২০ খ্রি.)।[৪৭]

১.২.৩ বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আধুনিক শিক্ষার প্রারম্ভ কাল:

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের প্রারম্ভ কাল হতেই বাঙালি হিন্দু সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। এদেশীয় হিন্দুগণ কোম্পানির সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করায় ১৭৩৬ খ্রি. থেকে ১৭৪০ খ্রি. পর্যন্ত কোম্পানি কলকাতায় ৫২ জন স্থানীয় হিন্দু ব্যবসায়ীকে নিয়োগ দেয়।[৪৮] তাঁদের মধ্যে উমিচাঁদ, গোপীনাথ শেঠ, রামকৃষ্ণ শেঠ, শোভারাম বসাক, লক্ষ্মীকান্ত প্রমুখ ব্যবসায়ীগণ পলাশীযুদ্ধের পূর্বেই কোম্পানির দাদনি ও দালালী করেই বিখ্যাত হন। কলকাতার এসব উঠতি বণিকগণই ইংরেজদের সাথে ব্যবসার সূত্রে বনেদী ধনী লোক হওয়ার জন্য ইংরেজি ভাষা প্রথম শিক্ষা শুরু করেন। রামপ্রসাদ মিত্র, জয় নারায়ণ ঘোষ (১৭৫২-১৮২০), মহারাজ নবকৃষ্ণ (১৭৩৩-১৭৯৭) প্রমুখ কোম্পানির ব্যবসায়িক

প্রতিনিধিরাই প্রথম ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি।[৪৯] পলাশী যুদ্ধোত্তর সময়ে ইংরেজদেরকে তুষ্ট করে সুযোগ সুবিধা ও নানা প্রকার মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে হিন্দুগণ ইংরেজি শিক্ষা চর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে এক শ্রেণির হিন্দুর স্বার্থ অভিন্ন হওয়ায় ব্রিটিশরা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় হিন্দুদের বন্ধুত্ব লাভ করেছে। এইচ. ডডওয়েল এর ভাষায়:

> 'It was not surprising to find the English and Hindus United in the same political action, for their joint interest in the commerce of the country made the natural allies.'[৫০]

দেশীয় বণিকদের মধ্যে ইংরেজি চর্চা ও বাঙালী শিক্ষানুরাগীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু দেশীয়দের প্রতিষ্ঠিত অনেক বিদ্যালয়ই ক্ষণস্থায়ী হয়। এই সময়ে কলকাতার কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী উচ্চমানের ইংরেজি শিক্ষার জন্য ১৮১৭ খ্রি. ২০ জানুয়ারি 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২ খ্রি.), বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইডইস্ট এর প্রচেষ্টায় এবং বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখের উদ্যোগে কলেজটি স্থাপিত হয়। অবশ্য রাজা রামমোহন রায় রক্ষণশীলদের আপত্তির কারণে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মন্ডলী থেকে পদত্যাগ করেন।[৫১] সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের সন্তানদেরকেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এই কলেজ স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম আটত্রিশ বৎসর পর ১৮৫৫ খ্রি. মুসলিম বা অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্ররা অধ্যয়নের সুযোগ পায়।[৫২] ফলে হিন্দু সমাজে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের অধিক সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং বাংলায় আধুনিক শিক্ষিত এইসব হিন্দু জনগোষ্ঠী সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে।

১.২.৪ আধুনিক শিক্ষার প্রসার ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি:

১৮১৭ খ্রি. ৪ জুলাই *Calcutta School Book Society* প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলায় আধুনিক শিক্ষার নবদ্বার উন্মোচিত হয়। বাংলা ও ইংরেজি বই রচনার জন্য হিন্দু, মুসলিম, ইংরেজ সম্প্রদায়ের সদস্যকে এতে সম্পৃক্ত করা হয়।[৫৩] সরকার ১৮২১ খ্রি. এই সমিতিকে ৭০০০ টাকা এককালীন অনুদান এবং মাসিক ৫০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ভাষায় ঐ সময় পর্যন্ত স্কুল বুক সোসাইটি প্রধানত প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে ১২৬৪৪৬ কপি গ্রন্থ প্রকাশ করে।[৫৪] ১ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ খ্রি. *Calcutta School Society* আত্মপ্রকাশ করে। যার প্রধান উদ্দেশ্য কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বারোপ করা। অ্যাডামের মতে, এই প্রতিষ্ঠানটি ইউরোপীয়, ভারতীয় ও স্থানীয় জ্ঞানের সমন্বয়ের আদর্শে গড়ে উঠে। ১৮২১ খ্রি. পরিসংখ্যান অনুযায়ী স্কুল সোসাইটির মাধ্যমে ১১৫টি বিদ্যালয় পরিচালিত হয় এবং ছাত্র সংখ্যা ৩৮২৮।[৫৫] তাছাড়া সোসাইটির নিজস্ব উদ্যোগে ৫টি

বিদ্যালয় গড়ে উঠে। কিন্তু অর্থাভাবে ৩টি স্কুল মিশনারীকে সমর্পণ করা হয় এবং 'হিন্দুস্থানি' নামের একটি স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রতিষ্ঠানে বাংলা, ফার্সি, নাগরি (Nagree) পড়ানো হত এবং অধিকাংশ ছাত্রই মুসলিম। অপর বিদ্যালয়টি ১৮৩৩ খ্রি. পর্যন্ত পরিচালিত হয়। স্কুল বুক সোসাইটি আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আধুনিক শিক্ষার প্রসারে কাজ করেছে।

প্রতিষ্ঠানটি মূলত: ছাত্রদের হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের উপযোগী করে গড়তে সচেষ্ট। কিন্তু মুসলমানদের এই কলেজে পড়ার সুযোগ অথবা বিকল্প কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় আধুনিক শিক্ষার অধিকার থেকে এই সময়ে বঞ্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে মেকলে বলেন:

> "The Hindoo College admits no Mohamedan students. None of the directors are mahometans. The high compliment paid to this institution is therefore a compliment paid to the Hindoos at the expense of the musselman. And I see no way of remedying this in convenience. For there is no Mahometan institution which bears the smallest resemblance to the Hindoo College."[৫৬]

১৮১৩ খ্রি. কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরদের প্রবল বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে নেওয়া সিদ্ধান্তটি ১৮২৩ খ্রি. পর্যন্ত খুব একটা কার্যকর হয়নি। অবশ্য ২ অক্টোবর, ১৮১৫ খ্রি. প্রতিটি জেলায় হিন্দু মুসলমানের জন্য পৃথক পৃথক দুটি জেলা স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু অর্থাভাবের অজুহাতে কার্যকর হয়নি। ১৮২৩ সালে কোম্পানি সরকার জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রমকে সমন্বয়ের লক্ষ্যে *General Committee of Public Instruction* গঠন করেন। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজের তদারকি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে উপযুক্ততা ও মান অনুযায়ী সহায়তা প্রদানের জন্য জনশিক্ষা কমিটিকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

১.২.৫ কোম্পানির আধুনিক শিক্ষানীতিঃ

ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে পরবর্তীতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হচ্ছে ১৮৩৩ খ্রি. অ্যাক্ট' এই অ্যাক্টে বলা হয়:

> 'No native of India, nor any natural born subject of His majesty, should be disabled from holding any place or employment by reason of his religion, place of birth, discent or colour.'[৫৭]

উক্ত নীতি গ্রহণ করায় উচ্চ শিক্ষা দ্রুততর হয় এবং ভারতীয়দের জন্য কোম্পানির অধীনে চাকুরীর পথ প্রশস্ত হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই সময়ে জনশিক্ষা কমিটির অনুদান বৃদ্ধি করে দশ লক্ষ টাকা করে এবং বাংলা তথা ভারতবাসীর শিক্ষা বিস্তার প্রকল্পে ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করে।[৫৮] এই নির্দেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন বিতর্কের জন্ম দেয় এবং প্রাচ্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়। যা ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে *'Anglisist Orientalist Controversy'* বলে বিখ্যাত।[৫৯] এরূপ পরিস্থিতিতে ভারতবাসীর চূড়ান্ত শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক এবং সুপ্রিম কাউন্সিলের আইন উপদেষ্টা হিসেবে ১৮৩৪ খ্রি. ১০ জুন ভারতে আগমণকারী টমাস ব্যবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। প্রাচ্য শিক্ষাপন্থী জনশিক্ষা কমিটির সভাপতি শেক্সপিয়র পদত্যাগ করলে উইলিয়াম বেন্টিক, মেকলেকে কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করেন। পাশ্চাত্যবাদী মেকলে মনে করেন যে, ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটানো সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। ১৮৩৫ খ্রি. ২ ফেব্রুয়ারি তিনি ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে লর্ড বেন্টিককে অভিমত প্রদান করে একটি *Minute* প্রেরণ করেন।[৬০] মেকলের মতে, ভারতীয় ও আরবি সাহিত্যের সমস্ত গ্রন্থের মূল্য একটি ভাল ইউরোপীয় লাইব্রেরির একটি সেলফের বইয়ের মূল্যের সমান। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইংরেজির মাধ্যমে সকল জনগোষ্ঠীকে একযোগে শিক্ষিত করা সম্ভব নয়। এজন্য ভারতীয়দের মধ্যে এমন একটি শ্রেণি সৃষ্টি করার তিনি প্রস্তাব করেন:

> "Who may be interpreters between us and the millions whom we govern a class of persons Indian in colour and blood but English in taste, in opinions, in morals and intellect."

যারা হবে রক্ত, মাংসে ভারতীয় কিন্তু রুচি, চিন্তাধারা, পোষাক-পরিচ্ছেদ, নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ।[৬১] তিনি শিক্ষা উপর থেকে নিচের দিকে চুঁইয়ে পড়া এবং ক্রমান্বয়ে চারদিকে বিস্তারের *'Filteration Theory'* প্রস্তাব করেন।[৬২] তিনি ঘোষণা করেন, বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটবে না বরং প্রচলিত মিথ্যারই মৃত্যু বিলম্ব হবে। জনশিক্ষা কমিটির অপর এক সদস্য এ.রস (*A. Ross*) সাধারণভাবে মেকলের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। কিন্তু প্রাচ্যবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগেরও

দাবি জানান।[৬৩] প্রাচ্যবাদী নেতা এইচ.টি প্রিন্সেপ ও সুপ্রিম কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মরিসনও প্রাচ্য শিক্ষার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

গভর্নর জেনারেল বেন্টিংক (১৮২৮-১৮৩৫ খ্রি.) চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মেকলের প্রস্তাবকেই গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ খ্রি. ৭ মার্চ তিনি ঘোষণা করেন যে, শিক্ষা খাতের অর্থ এখন থেকে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যই ব্যয় করা হবে। বেন্টিংক এর সিদ্ধান্তের মূল ভাষাটি ছিল নিম্নরূপ:

> "...The great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India and that all the funds appropriated for the purpose of education would be nest employed on English education along."[৬৪]

এই সিদ্ধান্তে ভারতীয় জনসমর্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বিলুপ্ত হবে না উল্লেখ করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষকগণ তাদের মঞ্জুরি পাবে। কিন্তু কোন নতুন নিয়োগের জন্য সাহায্য দেওয়া হবে না। নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংখ্যা ও অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধা এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী বিবেচনা করতে হবে। গ্রন্থ মুদ্রণের সরকারি অর্থ শুধুমাত্র ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তারে জনগণের মধ্যে বন্টন করা হবে। এই শিক্ষা অবশ্যই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে হবে। ১৮৩৭ খ্রি. ফার্সির স্থলে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করা হয় এবং ১৮৪৪ খ্রি. সরকারি চাকুরির যোগ্যতা হিসেবেও ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা হয়।[৬৫] ১৭৭৪ খ্রি. কলকাতার সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিচার কার্যে প্রথম ইংরেজি চর্চা শুরু হয়েছে। কিন্তু বেন্টিংকের ঘোষণা ইংরেজিকে শিক্ষা ও রাষ্ট্রের কার্যে ব্যবহার আইনগতভাবে সর্ব প্রথম সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

১.৩ ব্রিটিশ আমলে বাংলায় নারী শিক্ষা:

বাঙালি সমাজের আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরেজ সমাজের সাথে তুলনা করে এদেশে নারীদের দুর্দশা সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতন হয়। নারীর এই অবস্থানের উন্নতির জন্য প্রথমে সসংকোচ একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। রাজা রামমোহন রায়ই সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি, যিনি বাঙালি নারীর পক্ষে সরব হন। তিনি জেরেমি বেন্থাম ও রবার্ট ওয়েনের রচনায় 'নারী মুক্তির' ধারণা পান।[৬৬] ১৮২০ খ্রি. এর দশকে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রমুখ স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। গৌরমোহন বিদ্যালংকার 'স্ত্রী-শিক্ষা-বিধায়ক' পুস্তিকা রচনা করেন।[৬৭] ১৮২০ খ্রি. এর শেষ দশকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত 'ইয়ং বেঙ্গল' নারীদের জন্য পুরুষদের সমান মর্যাদা দাবি করেন, রিচার্ড কার্লাইলের *Every Women's Book (1826)*

এবং উইলিয়াম টম্পসন, জেমস মিল, অ্যানা হুইলার ও রিচার্ড টেইলারের *Appeal of One Half the Human Face, Women Against the Pretensions of the Other Half, Men (1825)* নারী মুক্তি আন্দোলনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে।[৬৮] পরবর্তী আন্দোলনের উপর ব্যাপক ও গভীর প্রভাব সৃষ্টিকারী গ্রন্থদ্বয় ইয়ং বেঙ্গলের চিন্তাকেও সঙ্গত কারণে প্রভাবিত করেছে। বস্তুত, ১৮২০ খ্রি. এর দশকেই এই নতুন সচেতনতার উন্মেষ হয় যে, নারীদেরও শিক্ষা দিলে তবেই বঙ্গদেশ সভ্য হয়ে উঠবে।[৬৯] বিনয় ঘোষের মতে, চল্লিশ দশকের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার চেতনা ও আন্দোলন কিছুটা প্রসারিত হতে থাকে। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশ (১৮১৭-৪৯ খ্রি.) এবং তাঁদের উৎসাহে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রকৃত সূচনা এই সময় থেকে হয়।[৭০]

১.৩.১ বাংলায় আধুনিক নারী শিক্ষার সূচনা ও খ্রিস্টান মিশনারিঃ

বাংলায় প্রথম এদেশীয় বালিকাদের বিদ্যালয় স্থাপন করেন ইংরেজ মিশনারীর রবার্ট মে ১৮১৮ খ্রি. চুচুঁড়ায়।[৭১] এরপর নারী শিক্ষার বিশেষ উৎসাহ দেখায় ব্যাপটিষ্ট মিশনারী (১৮১৯ খ্রি.) ও চার্চ মিশনারী সোসাইটি (১৮২৩ খ্রি.)। উইলিয়াম কেরি ১৮১৯ খ্রি. শ্রীরামপুরে মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[৭২] ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৮২০ খ্রি. *'Female Juvenile Society'* প্রতিষ্ঠা করেন। এটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, *'The Female Juvenile Society for the Eastablishment and Support of Bengali Female school.'*[৭৩] এই সোসাইটির উদ্যোগে ১৮২৯ খ্রি. পর্যন্ত ২০টি জুভেনাইল স্কুল পরিচালনা করা হয়। ১৮৩২ খ্রি. সোসাইটিকে *'The Calcutta Baptist Female School Society'* নামে নতুন নামকরণ করা হয়। ১৮৩৪ খ্রি. পর্যন্ত এটি কার্যকর ছিল।[৭৪]

১৮২১ খ্রি. লন্ডনের *'British and Foreign School Society'* মিস এন. কুক কে ভারতে পাঠান, তিনি এক বছরে ভারতের চার্চ মিশনারী সোসাইটির সহায়তায় কলকাতা শহরে ৮টি নতুন স্কুল স্থাপন করেন। এগুলো হচ্ছে ঠনঠনিয়া স্কুল, মির্জাপুর স্কুল, প্রতিবেশী স্কুল, শোভাবাজার স্কুল, কৃষ্ণ বাজার স্কুল, শ্যামবাজার স্কুল, মল্লিকা বাজার স্কুল, কুমোরটুলি স্কুল।[৭৫] কলকাতার শহরে ও নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত স্কুলগুলি ছিল অবৈতনিক এবং মেয়েদের পোশাক ও পয়সা দিত। এছাড়াও পড়াশোনা ও খেলাধুলায় কৃর্তিত্ব অর্জনকারীদের পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা হত। পাঠ্যক্রমে পড়া, লেখা, বানান, ভূগোল, হাতের কাজ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮২৪ খ্রি. এর মধ্যে মিস এন. কুফের পরিচালনায় ২৪টি স্কুলের তথ্য পাওয়া যায়।[৭৬] তিনি ইতোমধ্যে মি. উইলসনকে বিবাহ করেন এবং নতুন সমিতির মাধ্যমে স্কুল সমূহ পরিচালনা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম *'Ladies Society for Native Female Education in Calcutta and its*

Vicinuity'। কলকাতার কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা ১৮২৪ খ্রি. বড় লাটের স্ত্রী লেডি আমহার্স্টের পৃষ্ঠপোষকতায় *'Ladies Society for Native Female Education'* নতুন সংস্থা গঠিত হয়। এই সমিতি মুসলিম প্রধান জান বাজার ও এন্টানি অঞ্চলে ৬টি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[৭৭] এইসব অঞ্চলের মুসলমানরাই বালিকা বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। রাজা বৈদ্যনাথ রায় এই সংস্থাকে ২০০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন। এই অনুদানে কলকাতায় 'সেন্ট্রাল স্কুল' নামক মেয়েদের একটি আধুনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৮] সেখানে স্কুল শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখানে পরবর্তীকালে স্কটিশ চার্চ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[৭৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসব নারী শিক্ষার স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ছিল নগগ্য। রাধাকান্ত দেবের ভাষায়, 'মিস কুকের স্কুলে কন্যাদের পাঠানোকে সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দুই অসম্মানজনক বলে বিবেচনা করেছিলেন।'[৮০] নেতৃত্বস্থানী হিন্দুদের সহানুভূতির অভাব এবং কিছু বিষয়ে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে তাই কেবল বাগদী, ব্যাধ, বৈরাগী, নিম্ন শ্রেণির হিন্দু ও যৌন কর্মীদের কন্যারাই পড়তে যায়।[৮১] ১৮৩০ খ্রি. শুরুতেই এসব বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। মিস কুকের বিয়ে হওয়ার যথাযথ তদারকির অভাব দ্বিতীয়ত: ভদ্রলোকেরা পর্দা ভেঙ্গে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর কথা ভাবতে পারেনি, তৃতীয়ত: মিশনারীদের স্কুলে ধর্মান্তরিত হওয়ার ভয় প্রভৃতি কারণে বিদ্যালয়সমূহ ব্যর্থ হয়েছে। গোলাম মুরশিদের ভাষায়, অংশত ধর্মান্তরের ভয়ে, অংশত পর্দা প্রথায় প্রতি পুরোপুরি আনুগত্যবশত স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রাথমিক প্রয়াস বঙ্গদেশে ব্যর্থ হয়।[৮২]

১.৩.২ আধুনিক নারী শিক্ষায় দেশীয় প্রচেষ্টা:

নারী শিক্ষা সম্পর্কে হিন্দু সমাজের সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে, যে নারী শিক্ষা গ্রহণ করবে, সে বিধবা হবে। তথাপি নব্য শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি নারী শিক্ষার প্রসারে আগ্রহী ছিলেন। হিন্দু কলেজ (১৮১৭ খ্রি.) প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। তৎকালীন সংবাদপত্রে উক্ত বিষয়ে সংবাদ ছিল নিম্নরূপ:

> "১৯ শে ডিসেম্বর (১৮১৬ খ্রি.) শুক্রবার দিবা দশ ঘন্টার সময় শহর কলিকাতার গৌরীবেড়ে বালিকা বিদ্যা পরীক্ষা ইয়াছিল, তাহাতে অনেক সাহেব ও বিবি লোক ছিলেন। এই পরীক্ষাতে হিন্দু মুসলমানদের বালিকা সর্বশূদ্ধা প্রায় দেড়শত পরীক্ষা দিয়েছে।"[৮৩]

স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক পুস্তিকায় স্ত্রী শিক্ষার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা বুঝানো এবং উচ্চ শ্রেণির ভদ্র সন্তানদের রীতিনীতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত প্রমাণের প্রচেষ্টা ছিল। প্যারী চাঁদ মিত্র এই প্রসঙ্গে বলেন:

> "Raja Radhakant offered the society, the manuscript of a phamphlet in Bengali the 'stri siksha vidhayaka' of the subject of female education the object of which was to show that the female education was customary among the high of Hindus, that the name of many Hindu female celebrate for their attainments are known, and that female education, if encouraged will be productive of most beneficial effects."[৮৪]

১৮৩০ খ্রি. এর দশকে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত হিন্দু স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজেদের বাড়িতে স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর স্ত্রী ও কন্যা, শিবচন্দ্র রায়ের কন্যা, রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী হরসুন্দরী, চন্ডীচরণ তর্কালংকারের কন্যা দ্রবময়ী এবং আশুতোষ দেবের কন্যা বাড়িতেই ভালো লেখাপড়া শিখেছিলেন। বাড়ির মহিলাদের জন্য রাধাকান্ত দেবও একটি নিজস্ব বিদ্যালয় চালুর কথা জানা যায়।[৮৫] স্ত্রী শিক্ষা বিদায়ক প্রবন্ধের তথ্য মতে, মুর্শিদাবাদের রানী ভবানী, ব্রাহ্মণ কন্যা হটী বিদ্যালংকার, ফরিদপুরের কোটালী পাড়া গ্রামের শ্যামসুন্দরী নামক ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করেন। শোভা বাজারের রাজবাড়ীর মেয়েরা শিক্ষিত ছিলেন।[৮৬]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন সভাসমিতি ও সংগঠনের মাধ্যমে কতিপয় বিদ্যোৎসাহীর সহযোগিতায় স্ত্রী শিক্ষা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৬৩-৬৭ খ্রি. এর মধ্যে বাংলায় উনিশটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী সময়েও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে আরও অনেক সংস্থা গড়ে উঠে।[৮৭] 'উত্তরপাড়া হিতকারী সভা' হলো স্ত্রী শিক্ষায় নিবেদিত এরূপ একটি সংস্থা। ১৮৬৩ খ্রি. হারিচরণ মুখোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং আরও কতিপয় বিদ্যোৎসাহীর প্রচেষ্টায় হুগলি, হাওড়া এবং চব্বিশ পরগনায় স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই সভা দ্রুত সফলতা অর্জন করে। ১৮৬৬-৬৭ খ্রি. সভাটির বিভাগীয় রিপোর্ট অনুসারে প্রায় সমগ্র বর্ধমান ডিভিশনের মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিল।[৮৮] ১৮৬৩ খ্রি. হতে এটি বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করে এবং ১৯১৫ সাল পর্যন্ত কোন ফি ছাড়াই পরীক্ষাটিতে অংশগ্রহণ করা যেত। অন্তঃপুরে পড়ালেখা করতে ইচ্ছুক মহিলাদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করে এবং ১৮৬৮-১৯৩৯ খ্রি. পর্যন্ত হিতকরী সভার উদ্যোগে গৃহীত পরীক্ষায় ৮০ জন ছাত্রী পাস করে।[৮৯] ১০ মার্চ, ১৮৮৩ খ্রি. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এইচ.জে. রেইনল্ডস বার্ষিক সমাবর্তনের বক্তৃতায় বলেন:

"The exertions of that admirable institution, the uttarpara sabha have largely contributed to the measure of success which has been attained."[৯০]

হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জন্য উত্তরপাড়া হিতকরী সভার শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী উন্মুক্ত ছিল। বাংলার এসব সভা সমিতির উদ্যোগ নারী শিক্ষার কার্যকরী উদ্যোগ ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়। এতদসত্ত্বেও, নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও 'ভদ্রলোক' শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা ও দায়িত্ব গ্রহণ আবশ্যক ছিল। ইয়ংবেঙ্গল, ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে শুধু ইংরেজি শিক্ষিতরাই নারী শিক্ষাকে সমর্থন করেনি বরং শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতদের মধ্যেও কয়েকজন নারী শিক্ষার স্বপক্ষে নানাভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালংকারের ন্যায় বাঙালি পন্ডিত গৌরিশংকর তর্কবাগীশ উদার সমাজ সংস্কারক ও নারী শিক্ষার প্রবক্তা। নারী শিক্ষা সম্পর্কে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় লিখেন (২৬ মে, ১৮৪৯):

"সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গভর্ণমেন্ট হৌসের প্রধান হালে লর্ড বেন্টিংক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দন্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আমাদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না, মানব কোথায় আছেন...। সহস্র সহস্র কি লক্ষ লক্ষ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন অথচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্য কহিব.....।"[৯১]

আবার ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যেও অনেকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত না হওয়ায় নারী শিক্ষার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে। ইংরেজি বিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকার সম্পাদক কাশী প্রসাদ ঘোষ তাদের অন্যতম।

১.৩.৩ বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক নারী শিক্ষা ও বেথুন স্কুলঃ

বাংলাদেশে নারী শিক্ষার যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলো ৭ মে, ১৮৪৯ খ্রি. 'বেথুন স্কুল' প্রতিষ্ঠা।[৯২] এটি কলিকাতায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। কলকাতার সিমুলিয়া সুকিয়া স্ট্রিটে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের ৫৬ নং বাড়ির বৈঠকখানায় জন এডওয়ার্ড ড্রিংকওয়াটার বেথুন[৯৩] বালিকা স্কুলটির সূত্রপাত করেন। রাজা দক্ষিণারঞ্জন রায় কর্তৃক প্রদত্ত ভূমির উপর ৬ নভেম্বর, ১৮৫০ খ্রি. বাংলার ডেপুটি গভর্ণর স্যার জন লিটনার বেথুন স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বেঙ্গল হরকরা ও ইন্ডিয়ান গেজেট পত্রিকায় ৮ নভেম্বর, ১৮৫০ খ্রি. স্কুলটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে।[৯৪] বেথুনের অনুরোধে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ডিসেম্বর ১৮৫০ খ্রি. স্কুলটির অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন। এই স্কুলটিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহায়তা করেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী, মদনমোহন তর্কালংকার, সম্ভুনাথ পন্ডিত, রামগোপাল প্রমুখ।[৯৫] দূর থেকে স্কুলে ছাত্রীদের নিয়ে আসার জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যাসাগর গাড়ির গায়ে মনুসংহিতার একটি শাস্ত্রীয় বচন খোদাই করে দেন; 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্মত:। এটির অর্থ হচ্ছে 'পুত্রের মতো কন্যাকেও যত্ন করে পালন ও শিক্ষা দিতে হবে।'[৯৬] বেথুনের এই বালিকা স্কুলের প্রথম ২১ জন ছাত্রীর মধ্যে দু'জন হলেন পন্ডিত মদনমোহনের দুই কন্যা ভূবণবালা ও কুন্দমালা।[৯৭] এই স্কুলে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে বাধা দূরীভূত হয়। তবুও বাল্য বিবাহ, অবরোধ প্রথার এবং অভিজাত ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অনেকে বিরোধিতার কারণে বেথুন স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল নগন্য। ঈশ্বর গুপ্ত শুরুতে উৎসাহ দেখালেও পরবর্তীতে বিরোধিতা করেন। তিনি 'দুর্ভিক্ষ' কবিতায় 'শিক্ষা লাভ করার ফলে মেয়েরা কমনীয়তা হারিয়ে ফেলেছেন' বলে দুঃখ প্রকাশ করেন।[৯৮] তৎকালীন রক্ষণশীল পুরুষ সমাজ ও ভদ্রলোকের বিরোধিতা সম্পর্কে বেথুন নিজেই লিখেন, রক্ষণশীল হিন্দুরা কন্যাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণের প্রশ্নে কেমন বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি আরও লেখেন যে, জনৈক রক্ষণশীল হিন্দু নেতার (তিনি নামোল্লেখ করেননি) মৃত্যুর পর বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৯৯] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তাঁর বন্ধুদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বেথুন স্কুলে ১৫ বছর পরে ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪। তাদের মধ্যে ২১ জন খুব সহজে পড়তে ও লেখা বুঝতে পারত এবং ১৬ জন গল্প পড়ে বুঝতে পারত।[১০০] সুতরাং এই সময়ের মধ্যেও স্কুলটির অগ্রগতি খুব বেশি হয়নি। এক সময়ে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' পত্রিকায় লিখা হয়:

> ‘বেথুন বালিকা স্কুল ১৯ বছর স্থাপিত হয়েছে। সরকার তার জন্য এ পর্যন্ত এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাত শত ছিয়াত্তর টাকা ব্যয় করেছেন। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এককালে ষাট হাজার টাকা দান করেছিলেন। তাছাড়া প্রতি তিন বছর অন্তর এই স্কুলের মেরামতের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। এত টাকায় মাত্র ৩০টি ৭/৮ বছর বয়স্ক বালিকার শিক্ষা হচ্ছে, এটা অর্থের অপচয় ছাড়া আর কি’?[১০১]

এতদ্‌সত্ত্বেও স্কুলটির অবদান ও গুরুত্ব অস্বীকার করা সমীচীন নয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলার ভদ্রলোকেরা প্রথমবারের মত প্রকাশ্যে কন্যাকে এই স্কুলে প্রেরণ করে পর্দা প্রথা অস্বীকার করেন বেথুন স্কুলের মাধ্যমেই বাংলাদেশের নারী শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে।

১৮৫৪ খ্রি. ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের নারী শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়।[১০২] লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-১৮৫৬ খ্রি.) এর ভারত ত্যাগের পর বাংলার সরকার বেথুন স্কুলের ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। তৎকালীন বাংলার গভর্ণর হ্যালিডে এদেশের নারী শিক্ষায় মনোযোগী হন এবং সিসিল বিডনকে এই বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি ১২ আগস্ট, ১৮৫৬ খ্রি. রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমা প্রসাদ রায় ও কালী প্রসন্ন ঘোষ প্রমুখকে নিয়ে স্কুল কমিটি গঠন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সম্পাদক ও সিসিল বিটন নিজে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সরকারের অনুমোদন লাভ করেন।[১০৩] পরবর্তীতে স্কুলটি আর্থিক সংকটে পড়লে গভর্ণর জেলারেল লর্ড কেনিং (১৮৫৬-৬২ খ্রি.) এর পত্নি লেডি কেনিং অর্থ সহায়তা দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করায় বিদ্যালয়টি নিজস্ব কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। বেথুন স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর প্রথম দশ বছর বিদ্যাসাগর এই বিদ্যালয় পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা ও সময় ব্যয় করেন।

বেথুন স্কুলের অনুপ্রেরণায় একই বৎসর জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তর পাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[১০৪] দুই তিন বৎসরের মধ্যে রাজশাহীতে কিশোরী চাঁদ মিত্র একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[১০৫] ১৮৫৭ খ্রি. প্রথম দিকে বাংলায় নারী শিক্ষা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সাথে গভর্ণর সরাসরি আলোচনা করেন। পরবর্তীতে বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে নারী শিক্ষার প্রসারে জনগণ ও সরকারের আর্থিক সহায়তায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৭ খ্রি. হতে ১৮৫৭ খ্রি. মে মাসের মধ্যেই হুগলিতে ২০টি, বর্ধমানে ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি ও নদীয়ার ১টি সহ মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ১৩০০ এবং মাসিক খরচ ৮৫৪.০০ টাকা। শীঘ্রই এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা

৫০ এ উন্নীত হয়।[১০৬] কিন্তু ১৮৫৭ খ্রি. ৭ মে ভারত সরকার পত্র চাহিদা অনুযায়ী এসব সাহায্য দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৮৫৭ খ্রি. জুন পর্যন্ত শিক্ষকদের বেতন বাবদ মোট ৩৪৩৩৯৯৫ গন্ডা পাওনা বকেয়া হয়। বিদ্যাসাগর ডি.পি. আই ও বাংলার গভর্ণরের সুপারিশসহ ভারত সরকারের নিকট অনুরোধ পত্র লিখে বিষয়টি অনুগ্রহের সাথে দেখার জন্য বলেন। ভারত সরকার কর্তৃক উক্ত বিষয়ে ২২ ডিসেম্বর ১৮৫৮ খ্রি. এর প্রদত্ত চিঠিটি নিম্নরূপ:

> "দেখা যাইতেছে পন্ডিত আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই এই কাজ করিয়াছেন এবং একাজ করিতে উচ্চতম কর্মচারীদের উৎসাহ ও সম্মতি তিনি পাইয়াছেন। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া এই বিদ্যালয় গুলোতে যে ৩৪৩৩৯৯৫ গন্ডা প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছে, সেই টাকার দায় হইতে অপরিষদ বড় লাট সাহেব তাঁহাকে মুক্ত করিতেছেন। সরকার এই টাকা দিবেন। ইহাই তাঁহার আদেশ।"[১০৭]

অবশ্য বিদ্যাসাগরের জীবনীকারকগণ অনেকে সমুদয় ব্যয়ভার বিদ্যাসাগরকে বহন করতে হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তাছাড়াও হুগলি, বর্ধমান, চব্বিশ পরগনার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য আর্থিক সাহায্যের অনুরোধ ভারত সরকার সিপাহী বিদ্রোহের অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করে। তবে ভবিষ্যৎ এ বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দেয়। বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের জন্য 'নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ভান্ডার' খোলেন। এই ভান্ডারে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ রায়সহ কিছু সম্ভ্রান্ত 'ভদ্রলোক', উচ্চতর ইংরেজ সরকারের কর্মচারী এবং কতিপয় ব্যক্তি নিয়মিত চাঁদা প্রদান করেন। বালিকা বিদ্যালয়ের এরূপ চাঁদা পরিশোধ করার সময় সিসিল বীটন লিখেন:

> "My dear Pandit
> ...I enclose a chaqhe for RS. 165/- on account of my subscription to your female school fund for April, May and June 1863.
>
> Your very truely
> C. Beadon."[108]

কিন্তু সরকারের অর্থ সাহায্য বন্ধ করায় এই বালিকা বিদ্যালয়সমূহ অল্প সময়ের ব্যবধানে বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৬২ খ্রি. বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুল সম্পর্কে সরকারকে প্রেরিত রিপোর্টের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ছাত্রীদের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা। পাঠদানের বিষয়সমূহ হচ্ছে পঠন ও লিখন, পাটিগণিত, জীবন চরিত, ভূগোল, বাংলা, ইতিহাস ও নানা বিষয়ে মৌখিক পাঠ ও সূচীকার্য। ছাত্রীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য একজন

প্রধান শিক্ষিকা, দুইজন শিক্ষিকা এবং দুইজন পন্ডিত ছিল।[১০৯] ১৮৬৯ খ্রি. বেথুন স্কুল ক্যাম্পাসে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে মহিলা শিক্ষিকা তৈরির প্রশিক্ষণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। অবশেষে ৩১ জানুয়ারি, ১৮৭২ খ্রি. পর ফিমেল নর্মাল স্কুল বন্ধ করার জন্য জর্জ ক্যাম্পাবেল নির্দেশ প্রদান করেন।[১১০] ১৮৭৮ খ্রি. এই স্কুল বেথুন কলেজে রূপান্তরিত হয়, যা প্রথম মহিলা কলেজ।[১১১] শ্রীমতি চন্দ্রমুখী বসু বেথুন কলেজ হতে সর্বপ্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন।[১১২] তিনি নারীর উচ্চ শিক্ষার অগ্রদূত হয়ে সমাজকে অনুপ্রাণিত করেন। বেথুন বিদ্যালয়ের কর্মকান্ড ও অনুপ্রেরণা বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার নূতন মাত্রা সংযোজন করেছে। বাংলায় নারী শিক্ষার এই জাগরণ কুসংস্কারমুক্ত, আধুনিক ও গতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। সুতরাং জন এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুনকে বাংলায় নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পথ প্রদর্শক বলা যায়।

১.৩.৪ নারী শিক্ষার বিকাশঃ

১৮৫০ খ্রি. ও ১৮৬০ খ্রি. এর দশকে বাংলায় নারী শিক্ষার সামান্যই বিকাশ হয়েছে। রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরোধিতা ও এক ঘরে করার ভয়ে অভিভাবকগণের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠানো সত্যিই দুরূহ ছিল। সমসাময়িক কালে নারী শিক্ষার স্বপক্ষের লোকেরাও মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোকে সমর্থন করেননি। তাছাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে মাহিলা শিক্ষিকার অভাবে পুরুষ শিক্ষক দ্বারা পাঠদান করা এবং বাল্য বিবাহরে অধিক প্রচলন নারী শিক্ষা বিকাশের সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করে দেয়। এমতাবস্থায় বাড়িতে স্বামী বা আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে অনেকেই পড়ালেখা শিখেই বিদগ্ধ নারী বলে পরিচিত হন। এই ধরণের শিক্ষা পদ্ধতি তখন 'জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী' বলে পরিচিত ছিল। প্রায় ধর্মীয় উৎসাহে কেশব চন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোর চন্দ্র গুপ্ত, উৎমশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, শশিপদ বন্দোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতা নারী শিক্ষার প্রচার করেন।[১১৩] সামাজিকভাবে রক্ষণশীল স্ববিরোধী এসব নেতারা নারীদের শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়া অর্থে 'প্রগতিশীল' বলা যায়। এই নেতাদের অনেকের স্ত্রী ও বহু ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের স্ত্রী বাড়িতে পড়ালেখা শিখেন এবং 'বামাবোধিনী সভা'র[১১৪] উদ্যোগে অন্ত:পুর শিক্ষা কার্যক্রমের পরীক্ষায় অংশ নিতেন। ১৮৬৩ খ্রি. থেকেই বামাবোধিনী সভা এই কার্যক্রমের আয়োজন করেছে।[১১৫] শিক্ষিত বাংলার নারীগণের মধ্যে ১৮৬৩ খ্রি. কৈলাস বাসিনী দেবী প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ পুস্তক 'হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা' প্রকাশ করেন। যা সম্ভবত ভারতীয় নারীদের মধ্যেও প্রথম সাহিত্যকর্ম। তৎকালীন সময়ে কুমুদিনী (আনুমানিক ১৮৪০-৬৫ খ্রি.), নিস্তারিনী দেবী (১৮৪০-৬০ খ্রি.), ব্রহ্মময়ী (১৮৪৫-৭৬ খ্রি.),

মনোরমা মজুমদার (১৮৪৮-১৯৩৬ খ্রি.), জ্ঞানদান নন্দিনী দেবী (১৮৫২-১৯৪১ খ্রি.), সৌদামিনী দেবী (মৃ. ১৮৭৪ খ্রি.), স্বর্ণলতা ঘোষ, হেমাঙ্গিনী দেবী প্রমুখ শিক্ষিত নারীগণ নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।[১১৬]

ব্রাহ্মদের অন্ত:পুর শিক্ষা কার্যক্রম, ১৮৫০ এর দশকে নারীমুক্তি ও স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থাদি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ সংস্কৃত পন্ডিতগণ এবং অক্ষয় কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, দ্বারকানাথ রায় ও প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের লিখিত রচনাবলী রক্ষণশীল হিন্দু মানসকে আলোড়িত করে।[১১৭] মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪ খ্রি.), বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৩ খ্রি.) এবং আবাল বান্ধব (১৮৬৯ খ্রি.) এর মতো সাময়িক পত্রিকা নারীদের অবস্থার উন্নতি ও স্বশিক্ষিত হতে সহায়তা করেছিল।[১১৮] কৈলাসবাসিনী দেবী, তাহেরন নেসা, সৌদামিনী দেবী, মধুমতী গাঙ্গলী, কৃষ্ণকামিনী, কামিনী সুন্দরী প্রমুখ নারী লেখক শিক্ষার সুফল ও প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করেন।[১১৯] এভাবে ধীরে ধীরে সমাজ সচেতন হয় এবং রক্ষণশীলতা কিছুটা হ্রাস পায়। ১৮৭০ এর দশকে শিক্ষিত শহরে ভদ্রলোক সম্প্রদায় ব্যাপক মাত্রায় নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। আধুনিক শিক্ষিত যুবকরা জীবন সঙ্গিনী হিসেবে শিক্ষিত স্ত্রীর চাহিদা সম্পর্কে সমকালীন একজন লেখক বলেন:

> "এক্ষণকার উত্তিষ্ঠমান অংশ প্রায় অধিকাংশই কলেজে পড়ো। তাহারা ইংরেজি ভাষায় কৃতবিদ্য হইতেছেন।....ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সভ্যতাও শিক্ষা করিতেছেন, ইংরেজি সভ্যতা, অসন বসন, চলন, কথন, লিখন ও ভজনাদিতেও প্রকাশ করিতেছেন।...এক্ষণকার যুবকরা শিক্ষিত স্ত্রী চাহেন; কেনই বা না চাহিবেন? যুবকদের লেখাপড়া শিখাইলে স্ত্রীদিগকে অবশ্যই লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। যুবকদিগকে মূর্খ করিয়া রাখ, তাহা হইলে স্ত্রী শিক্ষার অভাববোধ হইবে না।...আরও কিছুদিন পরে, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজে অশিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। কন্যা দাতাগণ কলেজের পড়ো চাহেন, কলেজের পড়োরা স্কুলের ছাত্রী-চাহেন।...শিক্ষিত পুরুষের সহিত অশিক্ষিত স্ত্রীর বিবাহ হইলে, সবদিকে সুখজনক হয় না। বিদ্যা সম্বন্ধে তাহাদের উভয়ের মধ্যে যে অন্তর, তাহাই কত সময়ে অমিলের কারণ হইয়া উঠে।"[১২০]

মূল্যবোধের এরূপ বিবর্তনের ফলে রক্ষণশীল হিন্দুরাও বাধ্য হয়ে কন্যাদের পড়ালেখায় মনোযোগী হন। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের লেখক দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকে চিত্রিত নায়িকারা থিয়েটার অনুরাগী ও শিক্ষিত ছিলো। রক্ষণশীল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসসমূহের নায়িকারাও শিক্ষিত, যা শিক্ষিত সমাজকে আলোড়িত করেছে এবং নিজেদের অজান্তেই স্ত্রী শিক্ষাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন।[১২১] বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্তের লেখায় এই পরিবর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, স্ত্রী শিক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে যারা আগে কানে আঙ্গুল দিতেন, তারা এখন

তাদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন।"[১২২] নিম্নের সারণিতে প্রকাশিত তথ্যে এটির বাস্তবতা প্রমাণ পাওয়া যায়।

সারণি-১: বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রী সংখ্যা

বছর	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
১৮৬৩	৯৫	২৪৮৬
১৮৭১	৩৪৪	৬৭১৭
১৮৮১	১০৪২	৪৪০৯৬
১৮৯০	২২৩৮	৭৮৮৬৫

সূত্র: *General Report on Public Instruction in Bengal for the years 1863-64, 1871-72, 1881-82 and 1890-91.*

উক্ত সারণির তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলায় আলোচ্য সময়ে নারী শিক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মাত্র ২৭ বৎসরের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ত্রিশ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্তঃপুর শিক্ষা কার্যক্রম ও স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষিত মহিলারা বিনা বেতনে অথবা সবেতনে শিক্ষকতার কাজে এগিয়ে আসায় নারী শিক্ষা গতিশীল হয়েছে। এছাড়াও ১৮৭১-৭৩ খ্রি. সরকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের 'ক্যাম্পবেল স্কিম' নারী শিক্ষায় বিশেষ সহায়তা করেছে। সরকারি অর্থ সাহায্যের আনুকূল্যে ১৮৭০ ও ১৮৮০ এর দশকে প্রায় দুই হাজার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসকল বিবিধ কারণে ১৯০১ খ্রি. মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে উচ্চ শিক্ষা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। নিম্নের সারণিতে এটি পরিলক্ষিত হয়।

সারণি-২: উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীদের শিক্ষার হার, ১৯০১

বর্ণ	শিক্ষার হার%	ইংরেজি শিক্ষিতের হার%
ব্রাহ্মণ	৫.৬	০.১
কায়স্থ	৮.০	০.৪
বৈদ্য	২৫.৯	০.৮
ব্রাহ্ম[১২৩]	৫৫.৬	৩০.৯

সূত্র: *Census of India 1901, Vol. VIA Pt.II. Calcutta: Bengal Secreteriat press, 1902, P.60-61, 100-104, 106-111.*

বাঙালি খ্রিস্টানদের মধ্যেও ব্রাহ্মদের ন্যায় নারী শিক্ষার হার বেশি কিন্তু লোকগণনার প্রতিবেদনে দেশীয় খ্রিস্টান নারীর সংখ্যা পৃথকভাবে উল্লেখ না থাকায় শিক্ষার হার নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে ১৮৮৩-১৯১০ খ্রি. পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ স্নাতক নারীদের তালিকায় বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২৪]

১৮৭৩ খ্রি. মনোমোহন ঘোষ, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ বাঙালী বন্ধুর সহযোগিতায় অ্যানেট অ্যাক্রয়েড হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হচ্ছে বালিকাদের একমাত্র উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী কাদম্বিনী বসু সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে এন্ট্রেস অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।[১২৫] এই বিদ্যালয়ে প্রথম ছাত্রী নিবাস শুরু হয়। অবশ্য আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য ১৮৭৮ খ্রি. বিদ্যালয়টি বেথুন স্কুলে সংযুক্ত হয়ে বেথুন স্কুল নামেই পরিচিতি লাভ করে।[১২৬] পরবর্তী দুই দশক বেথুন স্কুল ও কলেজ শাখা বাংলাদেশে নারীদের উচ্চ শিক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়। সমসাময়িক ইংল্যান্ডে মেয়েদের সাধারণ শিক্ষার প্রচলন থাকলেও উচ্চ শিক্ষার অধিকার ছিলনা। এই অধিকারের জন্য ১৮৬৩ খ্রি. এমিলি ডেভিসের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির দাবি, আবেদনপত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটরদের নিকট তদবির করেন। অবশেষে ১৮৭৮ খ্রি. লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২০ খ্রি. এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৩ খ্রি. অনুমোদন দেয়।[১২৭] অপরদিকে ১৮৭৮ খ্রি. ২৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এবং ২৭ এপ্রিল সিনেট মহিলাদের এফ.এ. বি.এ এবং এম.এ পরীক্ষার নীতিমালা অনুমোদন করে। ১৮৭৯ খ্রি. সিন্ডিকেট চন্দ্রমুখীকে এফ.এ পরীক্ষার অনুমতি দেয় এবং ১৮৮৩ খ্রি. চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী উভয়েই বিএ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন।[১২৮] ইংল্যান্ডের পুরুষেরা নারীর উচ্চ শিক্ষায় বিরোধিতার অন্যতম কারণ হলো পুরুষদের চাকুরীর সুযোগ কমে যাবে।[১২৯] অন্যদিকে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা এবং নারীরা পুরুষের অবাধ্য হবেন এরূপ ধারণা

বর্শবর্তী হয়ে বাঙালি পুরুষরা নারী শিক্ষার বিরোধিতা করতেন। অবশ্য বাংলার উদারপন্থীরা সমাজে প্রগতির দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান।

১.৩.৫ নারী শিক্ষায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা:

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে শাসনের প্রারম্ভকালে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ না করলেও ২১ জুলাই, ১৮১৩ খ্রি. ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে গ্রহণ করে। ভারতে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা ও রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি প্রবর্তন করায় কোম্পানির শিক্ষার ভার গ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। ভারত তথা বাংলায় নারী শিক্ষাকেও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হতে সরকার পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। ১৯ জুলাই, ১৮৫৪ খ্রি. শিক্ষা বিষয়ক 'উডস ডেসপ্যাচ'-এ ভারতে "উচ্চ, মধ্য, নিম্ন, ব্যবহারিক, সাধারণ সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ও নির্দেশ এবং সরকারি শিক্ষা বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাব ছিল।"[১৩০] এই ডেসপ্যাচ এ নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে বলা হয়:

> "The importance of female education in India cannot be over rated; and we have observed with pleasure the evidence which is now afforded of an increased desire on the part of many of the natives of India to give a good education to their daughters. By this means of for greater proportional impulse is imparted to the educational and moral tone of the people than by the education of men. We have already observed that schools for females are included among those to which grants in aid may be given; and we cannot to refrain from expressing our cordial sympathy with the efforts which we being made in this direction...." ।[১৩১]

এই ডেসপ্যাচ অনুযায়ী ভারত তথা বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসারে সরকার প্রথম বারের মত কেন্দ্রিয় নীতি গ্রহণ করেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৫৬ খ্রি. বেথুন স্কুলকে সরকারি করা হয়। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রি. সিপাহী বিদ্রোহ নারী শিক্ষার প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিসাধন করেছিল। বিশেষত মুসলিম নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উপনিবেশিক শাসকরা সতর্কতা গ্রহণ করায় অগ্রগতি সামান্যই হয়েছে। ১৮৭০ খ্রি. বাংলার গভর্ণর নারী শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়সমূহে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। এতে গ্রামে 'স্ব-শাসিত' প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রচেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয়ের কিছুটা সম্প্রসারণ ঘটে। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ খ্রি. উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে গঠিত 'ভারতীয় শিক্ষা কমিশন' নারী শিক্ষার পশ্চাৎপদতার চারটি কারণ চিহ্নিত করেছে। যথা: ১. সমাজের চোখে মেয়েদের শিক্ষায় অর্থকরী মূল্যবোধের অভাব। ২. বাল্যবিবাহ ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে অবরোধ বা পর্দা প্রথার প্রচলন। ৩. স্কুলে শিক্ষিকার অভাব ও ৪. পুরুষ কর্মচারী কর্তৃক স্কুল পরিচালনা, পরিদর্শন ও পাঠ্যপুস্তক রচনায় মেয়েদের চাহিদার প্রতি অবহেলা।

এসব সমস্যাবলী সমাধানকল্পে কমিশন ২৭টি সুপারিশ করেন। নারী শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ করেন:

> "...It will have been seen that female education is still in an extremely backward condition, and that it will need to be fostered in every legitimate way.. Hence we think it expedient to recommand that public funds of all kinds local, municipal and provincial should be chargeable in an equitable proportion for the support of girls school as well as for boys school."[১৩২]

প্রকৃতপক্ষে হান্টার কমিশনের সুপারিশ সরকারের সকল মহলে স্থায়ীভাবে গৃহীত হয়নি। ১৮৮১-৮২ খ্রি. বাংলায় সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশীয় (হিন্দু-মুসলমান) ছাত্রী সংখ্যা অনেক কম। তবে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা একেবারেই নগন্য। নিম্নের সারণিতে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রের হার পৃথকভাবে দেখানো হল।

সারণি-৩: বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রসংখ্যা, ১৮৮১-৮২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্রী	মুসলিম ছাত্রী	হিন্দু ছাত্রী	মুসলিম হার	হিন্দু হার
ইংরেজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪	--	৭৭	--	৪১.৮৪
মধ্য ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৪	১৭৭	১.১	৫২.০৫
মধ্যম দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়	৫২৭	৬	৩৬৩	১.১	৬৮.৮৮
প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৭৪৫২	১৫৭০	১৪৫৮০	৮.৯	৮৩.৫৪
নর্মাল বালিকা বিদ্যালয়	৪১	--	--	--	--

সূত্র: *Report of the India Education commission, 1882, Calcutta, 1883, Appendix, PP. XIII, VIV, LIV.*

উপরোক্ত সারণিতে উনিশ শতকে নারী শিক্ষার দুর্দশার চিত্র পরিলক্ষিত হয়। তবে নারীরা শিক্ষায় অংশগ্রহণ শুরু করেছে বলা যায়। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো নর্মাল স্কুলে ৩১ জনই খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের এবং অবশিষ্ট ১০ জন অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বেথুন স্কুলে মুসলিম ছাত্রীদের প্রবেশাধিকার না থাকায়

সম্প্রদায়টি নারী শিক্ষা কার্যক্রমে কিছুটা বাধাগ্রস্থ হয়। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়টি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবেও অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে।

১৯০১ খ্রি. সিমলা সম্মেলনে নারী শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশের ভিত্তিতে জেনারেল শিক্ষার অনুকরণে নারী শিক্ষার উদ্যোগ নেয় এবং নারী শিক্ষিকাদের শিক্ষণের পদক্ষেপও নেয়।[১৩৩] শুরুতে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে জেনানা শিক্ষা শুরু করলেও এদেশীয় জনগণের মধ্যে আতংক ও সরকারি পর্যায়ে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা আলেকজান্ডার পেডলার খ্রিষ্টান মহিলার পরিবর্তে এদেশীয় হিন্দু ও মুসলিম মহিলাদের সাহায্যে জেনানা মিশনের সুপারিশ করেন। প্রস্তাবে বলা হয়, এসব মহিলা শিক্ষিকা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে অন্তঃপুরের মহিলাদের কাছে যাবে অথবা যেকোন একটি স্থানে কয়েকজনকে একত্রিত করে বিনামূল্যে শিক্ষা দেবে। এর বিনিময়ে সরকার তাদেরকে মাসিক ৩০ টাকা বেতন প্রদান করবে।[১৩৪] জেনানা শিক্ষা পরীক্ষামূলকভাবে কলকাতা, পাবনা, বর্ধমান, কটক এবং ঢাকায় চালুর সুপারিশ করা হয়। স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালীদের বাড়িতে ছাত্রীদের একত্রিত করে জেনানা শিক্ষা চালু করার জন্য হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় হতে আনুপাতিক হারে কমিটি গঠন এবং স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানের কথা বলা হয়। গ্রান্ট-ইন-এইডের নিয়মানুযায়ী সরকার ১০টি মিশনকে অনুদান দেয় এবং একজন মহিলা শিক্ষা পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। কেন্দ্রিয়ভাবে জমায়েত করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ৮ জন, বাড়ি বাড়ি ভ্রমণ করে শিক্ষার জন্য ৫ জন বিভাগীয় ও ৬৩ জন ভ্রমণরত শিক্ষিকা নিযুক্ত হয় এবং ১৪৩০ জন ছাত্রী শিক্ষা লাভ করে।[১৩৫] ১৯০৩ সালে জেনানা শিক্ষা বিষয়ক কমিটি হুগলি, বর্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজশাহী, ঢাকা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত জেলায় এই শিক্ষা চালুর সুপারিশ করেন।[১৩৬] ১৯০৮ খ্রি. মুসলমানদের মধ্যে জেনানা শিক্ষা জনপ্রিয় করার জন্য একজন মুসলিম ভদ্রলোককে নিয়োগ করা হয়। এই বছর পূর্ববঙ্গ ও আসামে নারী শিক্ষার নীতি প্রণয়নের জন্য পৃথক কমিটি করা হয়।[১৩৭] ঢাকা, বরিশাল ও নোয়াখালীতে শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে বলে কমিটি মত প্রকাশ করেন।

১.৩.৬ মুসলিম সম্প্রদায়ের নারী শিক্ষায় অগ্রগতিঃ

বাংলায় মুসলিম বালিকাদের আধুনিক শিক্ষা ১৮১৯ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টান ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের 'ফিমেইল জুভেনাইল সোসাইটি' কর্তৃক পরিচালিত স্কুল সমূহে মাধ্যমে শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে যোগেশ চন্দ্র বাগল বলেন:

> "১৯ ডিসেম্বর ১৮২৩ খ্রি. কলিকাতার গৌরি বাড়িতে সোসাইটির স্কুলের ছাত্রীদের একটি সাধারণ পরীক্ষায় ১৪০ জনেরও বেশি ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং সেখানে হিন্দু বালিকাদের সাথে মুসলিম মেয়েরাও যোগদান করেছিল।"[১৩৮]

১৮২৪ খ্রি. লেডিস সোসাইটির মুসলিম অধ্যুষিত এন্টলি ও জানবাজার অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয়সমূহ মুসলমানরাই উৎসাহ নিয়ে প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন।[১৩৯] প্রিসিলা চ্যাপম্যান তাঁর বিখ্যাত *'Hindu Female Education'* গ্রন্থে বলেন, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।[১৪০] বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ' গ্রন্থে লিখেন, ১৮২২ খ্রি. মিস কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সময় শ্যামবাজারের একজন মুসলিম মহিলা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তাকে সাহায্য করেন। মুসলিম মহিলাটি এই সময়ে নিজের পাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বেগম রোকেয়ার একশা বৎসর পূর্বে তিনি বাড়ী-বাড়ী ছাত্রী সংগ্রহ করেন। তিনি প্রায় ১৮ জন ছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫।[১৪১] তাছাড়া মিস কুকের ১৮৪৪ খ্রি. মির্জাপুরে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়েও মুসলিম ছাত্রী অধ্যয়ন করত।[১৪২] কিন্তু এসব স্কুল বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৯৬ খ্রি. মে মাসের (নং-৩৭৬) বামাবোধিনী পত্রিকায় শাহজাদপুরের লতিফুন্নেছার নাম পাওয়া যায়। যিনি ১৮৯৬ খ্রি. *Campbell Medical School* হতে ৫৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন।[১৪৩] অ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্টে (১৮৩৮ খ্রি.) দেখা যায়, বর্ধমানের মিশনারী স্কুল সমূহে অধ্যয়নরত ১৭৫ জন ছাত্রীর মধ্যে শুধুমাত্র ১ জন মুসলিম ছাত্রী। অপরদিকে ১৩৮ জন হিন্দু ও ৩৬ জন খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রী রয়েছে।[১৪৪]

বাংলায় মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার পথিকৃৎ নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩ খ্রি.) মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি ১৮৬৩ খ্রি. প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম পুরুষদের শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হন। কিন্তু মুসলিম নারী শিক্ষায় তাঁর প্রচেষ্টার নজির পাওয়া দুষ্কর। তবে সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮ খ্রি.) নারী শিক্ষার প্রতি কিছুটা প্রগতিশীল ছিলেন। তিনি ১৮৯১ খ্রি. কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে বলেন, মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলা উচিত। এতে সমাজের

ভারসাম্য হতে পারে এবং নারী পুরুষের সমান উন্নতিতে শিক্ষার স্বার্থক সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[১৪৫] বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মুহাম্মদ ইউসুফ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মহিলা প্রতিনিধিত্বের দাবী প্রথম উত্থাপন করেন। তবে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ না করায় নারী শিক্ষা পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খ্রি. পূর্ব বাংলার শিক্ষিত যুবকদের প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' নারী শিক্ষাকে গতিশীল করেছে।[১৪৬] এই সম্মিলনী ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে খ্রিস্টান মিশনারীদের জেনানা মিশন বা অন্তঃপুর শিক্ষা অথবা 'হিতকরী সভা' এর আদলে ঢাকা সম্মিলনী মুসলিম নারীদের অন্তঃপুর শিক্ষার প্রবর্তন করেন। তাঁদের শিক্ষা পদ্ধতি প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে অবশ্য ষষ্ঠ শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়। সম্মিলনী কর্তৃক পাঠ্যসূচী ও পুস্তক অনুযায়ী ছাত্রীরা বাড়িতে পড়ালেখা করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিত। পরীক্ষকগণ স্থানীয় অভিভাবকদের সহায়তায় তাদের বাড়িতে গিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। সম্মিলনী কলকাতা, ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, সিলেট, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মেয়েদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে।[১৪৭] ১৮৮৩ খ্রি. সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় ৩৪ জন মুসলিম ছাত্রী সফলতা লাভ করেন। সকল কৃতকার্য শিক্ষার্থীকে সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।[১৪৮] নওসের আলী খান ইউসুফজাই 'বঙ্গীয় মুসলমান' গ্রন্থে ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সম্মিলনীর নারী শিক্ষা প্রয়াসের সফলতার উল্লেখ করেন। কিন্তু সম্মিলনীর এই ব্যবস্থা ছিল নিতান্ত সাময়িক ও সীমিত এবং ১৯০৫ খ্রি. পর্যন্ত এটির কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ হাসান দানী বলেন, ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ঢাকায় 'প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি' গঠিত হলে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী অবলুপ্ত হয়।[১৪৯] ১৮৭৬ খ্রি. হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের কলকাতায় শ্রীহট্টের অধিবাসীরা 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' গঠন করে নারী শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এটি কালক্রমে সমগ্র সিলেট অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং সিলেট শহরে কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছাড়াও অন্তঃপুরের মহিলাও অংশগ্রহণ করতেন। এসব বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত ছিল। ১৮৮৩ খ্রি. শ্রীহট্ট সম্মিলনীর আয়োজিত পরীক্ষায় ১০ জন মুসলিম ছাত্রী পাশ করেছে।[১৫০] ১৮৮৯ খ্রি. এই সম্মিলনীর তত্ত্বাবধানে ৬১১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫২৮ জন উত্তীর্ণ হয়। তাদের মধ্যে ৭৪ জন মুসলিম ছাত্রী। পরবর্তীতে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৯ খ্রি. সম্মিলনীর সদস্য ও হাইকোর্টের আইনজীবী মৌলবি সিরাজুল ইসলাম মুসলিম নারীদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য ১০ টাকা মূল্যের পুরস্কার ঘোষণা করেন।[১৫১] তাছাড়াও স্ত্রীশিক্ষার উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে ১৯০৫ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত 'নেয়াখালী সম্মিলনী'। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কতিপয় ছাত্রের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত সমিতিটি মহিলাদের শিক্ষার প্রসার এবং প্রতিভাময়ী লেখিকা পুরস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করে। স্ত্রী শিক্ষায়

উৎসাহ দিতে এই সম্মিলনী ১৯১২ খ্রি. ৬৫ টাকার পুরস্কার বিতরণ করে।[১৫২] ১২৭৮ বঙ্গাব্দে গঠিত 'ত্রিপুরা অন্ত:পুর স্ত্রী শিক্ষা সভা' এর আয়োজিত পরীক্ষায় মুসলিম মহিলারা যোগদান করে। ১২৯০ বঙ্গাব্দে এই সভার পরীক্ষার ১১২ জন পরীক্ষার্থী ছিল, তৎমধ্যে ৯৮ জন উত্তীর্ণ হয়। উত্তীর্ণদের মধ্যে ৮ জন মুসলিম ছাত্রীর নাম পাওয়া যায়।[১৫৩] এ সকল কার্যাবলী বাংলার মুসলিম নারী সমাজকে আধুনিক শিক্ষার দিকে পর্যায়ক্রমে ধাবিত করেছে। বিশ শতকের শুরুতে বাংলার মুসলমানদের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নারী শিক্ষার প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছে। মুসলমান, নবনূর, শিখা, মোহাম্মদী, আল এসলাম, সাধনা, বুবুল এবং সওগাত সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ইতিবাচক লেখনি মুসলিম মানসে পরিবর্তন ঘটায়। স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে নবনূর মন্তব্য করে, 'উচ্চ শিক্ষায় অর্থাৎ উচ্চ সুশিক্ষায় উচ্চ জ্ঞানদানে স্ত্রী লোকের সুফল বই কুফল কখনো দর্শেনা।[১৫৪] স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও মুসলমান সমাজের অসচেতনতা সম্পর্কে 'সওগাত' পত্রিকার একজন লেখিকা বলেন:

> "স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই বিংশ শতাব্দীতেও আমাদের দুর্ভাগা সমাজ সজাগ হতে পারছেনা। এই শিক্ষা যে মেয়েদেরকে তথা সমাজকে কথখানি উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, তা তারা ভেবে দেখছেন না।"[১৫৫]

বাঙালি মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার আলোয় সামাজিক উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে অন্য একজন লেখিকা বলেন:

> "নারী জাতিকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হইলে তাহারা শুধু উপযুক্ত গৃহিনী বা উপযুক্ত মাতা হইয়া উঠে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বামীর উপযুক্ত পরামর্শ দাত্রী ও সত্যকার সহধর্মিনী হইয়া উঠে। আজ সত্যই মুসলিম মাতা-ভাগিনীদের শিক্ষা চাই, মুক্তি চাই। শিক্ষাভাবে, স্বাস্থ্যভাবে বাঙালি মুসলিম নারীগণ আজ অন্তঃসারশূন্য। মধ্যবিত্ত সমাজের সহিত যাহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন যে, ঘরে ঘরে আছে কেবল দায়িত্ব, কিন্তু প্রীতি নাই, কর্ম্ম আছে, অবসর নাই। এই সমস্তের অন্তরালে কি মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারে।"[১৫৬]

অপরদিকে, স্ত্রী শিক্ষার সমর্থন করেও নারী জাতির অবাধ স্বাধীনতার বিরোধিতা করে মৌলবি আব্দুল জব্বার বলেন:

"অতএব পর্দ্দানশীল জানানা স্কুল, কলেজ স্থাপন করিতে হইবে। জানানা শিক্ষয়ত্রী দ্বারা ঐসকল স্কুল কলেজের শিক্ষা-দীক্ষার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। তাহাদের কলেজে পড়িয়া উপাধি লাভ করিবার তো কোন আবশ্যকতা অনুভব করিয়া উঠিতে পারি না। মোটের উপর শিক্ষিতা হইলেই তো চলে। পূর্বকালের রমণীগণ এম.এ, বি.এ. পাশ না করিলেও তো আদর্শ প্রদর্শন জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন। আমাদের বর্তমান রমণী সমাজকে পবিত্র নারী মর্যাদা বজায় রাখিয়া সেই আদর্শ বুকে ধরিয়া সেই পথের পথিক হইতে হইবে। নতুবা তাহারা উঠিতে গিয়া পড়িয়া যাইবেন, জগতে গিয়া মজিয়া মরিবেন। যেই তিমিরে, সেই তিমিরেই ঘুমিয়া পড়িবেন।"[১৫৭]

বাঙালি মুসলমান সমাজের স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯৭০ খ্রি.), সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৭১-১৯৩১ খ্রি.), শেখ ফজলুল করিম (১৮৮৮-১৯৩৬ খ্রি.), বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২ খ্রি.) ও ডা. লুৎফর রহমান (১৮৯৭-১৯৩৬ খ্রি.) প্রমুখ সাহিত্যে আলোচনা করে। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'[১৫৮] এর লেখকগণও স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ও অবরোধ প্রথা উচ্ছেদের দাবি জানায়। সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবনের উন্নতির স্বার্থে আবুল ফজল অবরোধ প্রথার বিলোপ কামনা করেছেন। তিনি তাঁর 'তরুণ আন্দোলনের গতি' শিরোনামের প্রবন্ধে এই সম্পর্কে বলেন:

"আমাদের সমাজের অর্দ্ধভাগ আজ প্রাচীরের ভিতর আবদ্ধ। তাঁহাদের জীবন চতুর্দিক হইতে রুদ্ধ।...আলো, বাতাস লাগিলে মেয়েদের চরিত্র অমনিহুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এরূপ ভাবিবার কি আছে? গোড়ায় বিপদ একেবারে নাই বলিতেছি না। কিন্তু সেই বিপদকে এড়াইয়ে চলিতে পৌরুষও নাই, জাতীয় জীবনের উন্নতিও নাই। আলো বাতাসের ধাক্কা না খাইয়া যে চরিত্র বড় হইবে, তাহা ক্ষণভঙ্গুর। চতুর্দিক হইতে প্রাচীর ঘেরা তথাকথিত সতীত্বের কোন মূল্য আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না।"[১৫৯]

বাঙালি মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকলেও অন্ত:পুরের মুসলমান নারীরা নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যে বিদ্যা শিক্ষার চেষ্টা করত, এমনকি ইংরেজি ভাষার প্রতিও আগ্রহ ছিল তার প্রমাণ ১৩০৯ বঙ্গাব্দের সাপ্তাহিক 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার বিবরণীতে রয়েছে।[১৬০] মুসলমান নারী সমাজ শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক সংস্কার ও অবরোধ প্রথার কারণে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও তারা শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি।[১৬১]

সিপাহী বিদ্রোহত্তোর ইংরেজ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ ও অত্যাচারে দুর্দশাগ্রস্থ মুসলিম সমাজ। এসময়ে কুমিল্লার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর (১৮৩৪-১৯০৩ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ তৎকালীন মুসলিম সমাজের আলোকবর্তিতা। তাঁর জমিদারী মৌজায় তিন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তিনি বাংলার জনগণের শিক্ষায় ব্রতি হয়েছিলেন। প্রথমত: তাঁর বাসস্থান পশ্চিম গাঁয়ে একটি অবৈতনিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন, যা পরবর্তীতে উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামিয়া কলেজ এবং গাজী আলিয়া মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয়ত: ফয়জুন্নেসা তাঁর মৌজায় চারটি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে 'নবাব ফয়জুন্নেসা' ও 'বদরুন্নেসা' উচ্চ বিদ্যালয় ১৯০৯ খ্রি. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তৃতীয়ত: তিনি কুমিল্লা শহরের নানুয়া দিঘীর তীরে এবং কান্দিরপাড়ে দুটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৭৩ খ্রি. কান্দিরপাড়ের বালিকা বিদ্যালয়টি 'ফয়জুন্নেসা মধ্যম স্বদেশীয় বালিকা বিদ্যালয়'-এ উন্নীত হয় এবং এতদ্ অঞ্চলে নারী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮৮০-৮১ খ্রি. সরকারি শিক্ষা প্রতিবেদনে বিদ্যালয়টিকে *'The best girls school'* (ইডেন স্কুল ব্যতীত) প্রশংসিত হয়।[১৬২] এটি ১৯৩১ খ্রি. ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।[১৬৩] বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত হিন্দু ও ব্রাহ্ম ছাত্রীরাই 'ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ে' পড়াশোনা করত।[১৬৪] কলকাতার বেথুন স্কুলে মুসলিম বালিকাদের অধ্যয়নের সুযোগ ছিল না। এজন্য ১৯ জানুয়ারি ১৮৯৭ খ্রি. কলকাতার নেতৃত্বস্থানীয় মুসলমানদের উদ্যোগে 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম শামসি জাহান ফেরদৌস মহল গৃহ নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করেন। ঢাকার নবাব আহসানুল্লাহ্ও ১০০০ টাকা দান করেন।[১৬৫] এটি ব্রিটিশামলে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম বালিকা বিদ্যালয়, যেখানে ছাত্রী সংখ্যা ২৫। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা ও নারী শিক্ষার সমর্থক সাহিত্যিক নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩ খ্রি.) ১৮৯২ খ্রি. পাবনার বৈলতল গ্রামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এটি পরবর্তীতে বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।[১৬৬] ১৯০৯ খ্রি. বাঙালি মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জননী খুজিস্তা আখতার বানু একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়টি 'সোহরাওয়ার্দীয়া বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত।[১৬৭]

'বাংলার মুসলমান নারী মুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২ খ্রি.) এর আবির্ভাব ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি প্রথমে ১ অক্টোবর, ১৯০৯ খ্রি. ভগলপুরে ৫ জন ছাত্রী নিয়ে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' শুরু করেন।[১৬৮] কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে ব্যক্তিগত অসুবিধায় তিনি ৩ ডিসেম্বর ১৯১০ সালে কলিকাতা চলে আসেন। এখানে তিনি ব্যারিস্টার

আব্দুর রসুল (১৮৭০-১৯১৭ খ্রি.) সহ কয়েকজন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় ১৬ মার্চ, ১৯১১ খ্রি. দ্বিতীয়বার বিদ্যালয় পরিচালনা শুরু করেন। কলকাতার ১৩নং ওয়ালিউল্লাহ্ লেনের বাড়ীতে দু'খানা বেঞ্চের আটজন ছাত্রী নিয়ে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টির নাম 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'।[১৬৯] তৎকালীন সময়ে মুসলিম নারী শিক্ষার প্রকৃত চিত্র কলকাতায় অবস্থিত স্কুল সমূহের পরিসংখ্যানের প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায়। এই সময়ের প্রাপ্ত তথ্য মতে, "ঐ বছর (১৯১১ খ্রি.) পর্যন্ত কলকাতায় মেয়েদের জন্য বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল, এবং ক্রাইস্ট চার্চ স্কুল সহ সাতটি উচ্চ বিদ্যালয় ও ছয়টি এম.ই. স্কুল, পাঁচটি ভার্নাকুলার স্কুল, ৪১টি উচ্চ প্রাথমিক এবং ৪১টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিলো। মুসলমান মেয়েদের জন্য নিম্ন প্রাথমিক উর্দু স্কুল ছিলো ১৪টি, ২৫টি কোরান স্কুল অর্থাৎ মক্তব। কিন্তু একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ছিলো না অথবা বাংলা ভাষী মুসলমান বালিকাদের জন্যেও একটি স্কুল ছিলো না।"[১৭০]

সুতরাং এই বালিকা বিদ্যালয়টি মুসলমান নারীদের বাংলা ভাষায় শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তিনি নানা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ছাত্রী সংগ্রহ করেন এবং ভারতের নানা প্রান্তের শিক্ষিকা নিয়োগ করে বিদ্যালয়টি সচল রাখেন। কিন্তু অর্থের অভাব, যানবাহন সমস্যা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার অভাবে মান উন্নত করা দুঃসাধ্যে পরিণত হয়। সরকারি শিক্ষা প্রতিবেদনে (১৯১২-১৯১৩ খ্রি.) এই সম্পর্কে মন্তব্য হলো :

> "An interesting school has recently been started in Calcutta by a Muhammadan lady. It has a large number of pupils and it gives every promise of success, but a great difficulty is that it is at present impossible to find will qualified Muhammadan female teachers in Bengal."[১৭১]

এপ্রিল, ১৯১২ খ্রি. থেকে বিদ্যালয়টি সরকারি অনুদান লাভ করে কিন্তু এটা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।[১৭২] এমতাবস্থায় বেগম রোকেয়ার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক সাধনায় বাংলার মুসলিম নারী শিক্ষার আলয়টির উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ১১ জুন, ১৯৩২ খ্রি. এই স্কুলটি সম্পর্কে 'দি মুসলমান' পত্রিকার মন্তব্য:

> "A first rate school teaching up to matriculation standard. Excellent results 75% passes in the Matriculation top list in the government scholarship exams. Staff-graduates, trained and well-experienced teachers only."[১৭৩]

এভাবে ধীরে ধীরে বাংলার মুসলমান নারী শিক্ষা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে।

১.৩.৭ বিশ শতকে নারী শিক্ষার অগ্রগতিঃ

হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ শতকে বাংলায় নারী শিক্ষার অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে হিন্দু মহিলাদের আধুনিক শিক্ষার প্রবণতা দেখা যায়। অপরদিকে মুসলিম মহিলাদের বিশ শতকেই পশ্চাৎপদতা মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। ১৯০১ খ্রি. আদমশুমারীতে জেনানা শিক্ষা (অন্তঃপুর) ব্যবস্থায় ৪০০ জন মুসলিম শিক্ষিত নারীর তথ্য রয়েছে।[১৭৪] জেনানা শিক্ষা পদ্ধতি তৎকালীন সময়ে মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৯১৬ খ্রি. সরকারের অধীনে শুধু রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৯৮ জন মুসলিম শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করেছে। অপরদিকে হিন্দু শিক্ষার্থী জেনানা শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের পাশাপাশি বালিকা বিদ্যালয়েও গমন করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিচ্ছে। শিক্ষা পরিদর্শক মিস বোস এ প্রসঙ্গে বলেন:

> "The system of education by means of house to house visitation and in central gathering is a great been to purdan women, both Hindu and Muhammadan and is very highly appriciated by people of both communities."[১৭৫]

বিশ শতকের প্রথম দশকের শিক্ষা পরিস্থিতি নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হল।

সারণি-৪: বাংলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নারী অংশগ্রহণের পরিস্থিতি ১৯০১-১৯০৭

বছর	মোট ছাত্রী	মুসলিম	হিন্দু	দেশীয় খ্রিষ্টান	মুসলিম হার	হিন্দু হার	খ্রিষ্টান হার
১৯০১-০২	৩৮০৯৫	১২১৪	৩২১৪০	৩৯৮৬	৩.১৮	৮৪.৩৬	১০.৪৬
১৯০৬-০৭	৭৫৭৬৭	৫৯৩৯	৬৩৯৯৩	৫২২৯	৭.৮৩	৮৪.৪৬	৬.৯০

সূত্রঃ *Supplement to the Progress of Education in Bengal 1902-03 to 1906-07. (Third Quiquenniral Review) Calcutta, 1908, P.17.*

আলোচ্য সময়ে নারী শিক্ষায় হিন্দু সমাজ এগিয়ে এবং মুসলিম সমাজের অংশগ্রহণ অতি সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান সমাজের চেয়েও কম। তবে আশার বিষয় হচ্ছে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনগোষ্ঠীর নারীরা ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

ঢাকায় ইডেন গার্লস স্কুল (১৮৭৮ খ্রি.) ও কলেজ (১৯২৬ খ্রি.)[১৭৬], চট্টগ্রামে ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীর মধ্য বালিকা বিদ্যালয় (১৮৭৮ খ্রি.) ও পাঠানুটলি মোসলেম বালিকা বিদ্যালয় (১৯১৮ খ্রি.)[১৭৭] এবং ময়মনসিংহ আলেকজান্ডার স্কুল[১৭৮] প্রতিষ্ঠা পূর্ব বাংলায় নারী শিক্ষার নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। ১৮৯৭ খ্রি. কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম সহশিক্ষা প্রবর্তন নারী শিক্ষার নবদ্বার উন্মোচন করেছে। অবশ্য ১৮৪৪ খ্রি. হতে প্রেসিডেন্সি কলেজে নিয়মিত সহশিক্ষা চালু হয়।[১৭৯] তাছাড়া লারটো হাউস কলেজ (১৯১২ খ্রি.), ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৮৩ খ্রি. প্রতিষ্ঠা যা ১৯১৩ খ্রি. বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায়), লেডি ব্রাবন কলেজ (১৯৩৯ খ্রি.), সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ (১৯৩২ খ্রি.) উইমেন্স কলেজ (১৯৩৭ খ্রি.) এবং মুরলীধর গার্লস কলেজ (১৯৪০ খ্রি.) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা বাংলার নারী সমাজের উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়।[১৮০]

বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১ খ্রি.) হবার পর বিভিন্নমুখী সমস্যা ও ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে জেনানা শিক্ষা পদ্ধতি (*Atus system*) ধীরে ধীরে বন্ধ করা হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশুনাকে উৎসাহিত করা হয়। ১৯৩৩ খ্রি. বাংলার সরকার জেনানা শিক্ষা পদ্ধতি বিলুপ্ত করেন।[১৮১] বিশ শতকে নারী শিক্ষায় সরকার বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ নিয়ে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই সকল পদ্ধতি অবলম্বনে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের ধরণ ও প্রকৃতি নিম্নরূপ:

১. **মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়:** বিশ শতকের সূচনায় এরূপ পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেন। প্রাথমিক ভাবে হিন্দু বালিকারাই এই পরিকল্পনায় লাভবান হলেও ১৯১৭ খ্রি. হতে মুসলমান নারীদের জন্যও এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২. **আরবান প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়:** এই পদ্ধতিটি বঙ্গভঙ্গের পর প্রধানত পূর্ব বাংলার মহকুমা সদরে শুরু করা হয়। শহরাঞ্চলে মুসলিম বালিকারাও এরূপ বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়।

৩. **পঞ্চায়েতী ইউনিয়ন বালিকা বিদ্যালয়:** এই ধরণের বিদ্যালয় বঙ্গভঙ্গকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষা পরিচালক এইচ. শার্প গ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গ রদ হলে ঢাকা, ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর কিছু পঞ্চায়েতী বিদ্যালয়কে জেলা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

৪. **পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের বালিকা বিদ্যালয়ঃ** এই ধরণের বিদ্যালয়সমূহ পশ্চিম বাংলার পশ্চাৎপদ অঞ্চলে স্থাপন করা হয়। এরূপ প্রতিটি বালিকা বিদ্যালয়কে সরকার মাসিক তের টাকা সাহায্য দিতেন।

৫. **ঢাকা শহর ভিত্তিক বালিকা বিদ্যালয়ঃ** ঢাকা পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত এরূপ বিদ্যালয় সমূহ সরকারের অনুদানে পরিচালিত হয়।

৬. **কলকাতা শহর ভিত্তিক বালিকা বিদ্যালয়ঃ** কলকাতা পৌরসভা ও সরকারের শিক্ষা বিভাগের অর্থানুকূল্যে এই জাতীয় বিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭. **নির্বাচিত প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ঃ** বঙ্গভঙ্গ রদের সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু নির্বাচিত প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় বিশেষ অনুদান প্রাপ্ত হয়।

৮. **ধাত্রী বিদ্যার শিক্ষা পরিকল্পনাঃ ১৯১৭** খ্রি. সরকার ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক জেলার সাধারণ বালিকা স্কুলে এরূপ শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই জন্য সরকার বিশেষ বৃত্তির সুবিধাও প্রদান করেন।

৯. **বিশেষ স্কুল (পেশাগত):** আলোচ্য সময়ে বাংলায় অনেক শিল্প ও প্রযুক্তি বিদ্যার বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই সকল শিক্ষালয়ে সূচিকর্ম, পোশাক তৈরি, বয়ন শিল্প, কারুকার্য প্রভৃতি হাতে কলমে শেখানো হত। এসব ইভেন্টের মধ্যে সূচিকর্ম অত্যন্ত জনপ্রিয়। শিক্ষা পরিদর্শিকার অনুরোধে ১৯২৭-২৮ খ্রি. সূচিকর্ম বালিকাদের জন্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আওতাভুক্ত করা হয় এবং এরূপ বিদ্যালয়সমূহে বিশেষ শিক্ষয়ত্রী নিয়োগ দেওয়া হত। 'লেডি কারমাইকেল ডিপ্লোমা পরীক্ষা' নামে পরিচিত ডিপ্লোমা পরীক্ষাও ছিল। তবে অধিকাংশ বিদ্যালয় খ্রিষ্টান মিশনারীগণ পরিচালনা করতেন।[১৮২]

ব্রিটিশ সরকারের এসব বহুমুখী পদক্ষেপ বাংলার নারী শিক্ষাকে জনপ্রিয় করতে সহায়তা করে এবং হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নারী শিক্ষা প্রসারে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ১৯১৪ খ্রি. সরকার শুধুমাত্র মুসলিম নারীদের জন্যই ৩০৩১টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। তৎমধ্যে প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম ডিভিশনে যথাক্রমে ৩২০টি, ১৩৮টি, ১২৩৩টি, ৭০১টি ও ৩৬৯টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[১৮৩] জনশিক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১৮-১৯ খ্রি. পূর্ববঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ১৫১৯৮০ ও ১৬১১৫২। ১৯১৯-২০ খ্রি. হিন্দু ছাত্রী সংখ্যা ১৫২১৬৪ এবং মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা ১৭৭৪৫৮।[১৮৪]

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নারী শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী বিপ্লবী লীলা নাগ রায় (১৯০০-১৯৭০ খ্রি.) কর্তৃক 'দীপালী সংঘ' ১৩২৩ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ খ্রি. প্রায় দুই হাজার নারীর উপস্থিতিতে ঢাকায় দীপালী সংঘের উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রাঙ্গনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।[১৮৫] কবি শুধুমাত্র নারীদের দ্বারা আয়োজিত ও নারীদের উপস্থিতিতে সংবর্ধনা সভায় এসে তাদের প্রশংসা করেন এবং এই সংঘের কর্মকান্ডকে সমর্থন করেন। এই দীপালী সংঘের উদ্যোগে ১৯২৮ খ্রি. এর মধ্যে নারী শিক্ষা মন্দিরসহ ১২টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিল্প শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন।[১৮৬] তৎমধ্যে ১৯২৪ খ্রি. ঢাকার নবাব আহসানুল্লাহ্‌র কন্যা আকতার বানুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত 'কামরুন্নেসা স্কুল'ও রয়েছে। এই স্কুলটি ১৯৩৪-৩৫ খ্রি. কামরুন্নেসা কলেজে রূপান্তরিত হয়।[১৮৭] কামরুন্নেসা কলেজে মুসলিম ছাত্রী ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছাত্রীরা অধ্যয়ন করত। তাছাড়া নারী শিক্ষা মন্দির বর্তমানে ঢাকায় শেরে বাংলা বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

এদেশীয় রাজনীতিবিদগণও আইনসভায় নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। ১৯১৩-১৪ খ্রি. বাজেট আলোচনায় নবাব আলী চৌধুরী, মাজহারুল আনোয়ার চৌধুরী প্রমুখ নারী শিক্ষার প্রসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রতিটি মহকুমায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানান। ১৯১৭-১৮ খ্রি. ড. এ সোহরাওয়ার্দী বাজেট আলোচনায় স্ত্রী শিক্ষা বাস্তবতার নিরিখে পদক্ষেপ গ্রহণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল স্থাপন, জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপালিটিকে নারী শিক্ষার অধিক অর্থ বরাদ্দের দাবী করেন। ৯ আগস্ট, ১৯২৮ খ্রি. বাংলার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী নবাব মোশারফ হোসেন *'The Bengal (Rural) Primary Education Bill 1928'* পাস করায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে দৃঢ় পদক্ষেপ সূচিত হয়। ১৩ আগস্ট, ১৯৩০ খ্রি. শিক্ষামন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন কর্তৃক উত্থাপিত *'The Bengal (Rural) Primary Education Bill 1930'* ৩০ আগস্ট পাশ হয়। যা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাছাড়া *'Bengal Primary (Amendment) Bill 1932'* মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করায় নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়।[১৮৮] ১৯২৭ খ্রি. মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় বাংলার হিন্দু ও মুসলিম মেয়েদের স্বাক্ষরতার হার সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট করেন, যা নিম্নরূপ:

সারণি-৫: বাংলার হিন্দু ও মুসলিম নারীর স্বাক্ষরতার হার, ১৯২৭ খ্রি.

ডিভিশন	হিন্দু নারী	মুসলিম নারী
ঢাকা	২.৫	১.৫
প্রেসিডেন্সি	৩৫.৫	৩.২
বর্ধমান	১১.৬	৭.২
চট্টগ্রাম	২০.১	২.২
রাজশাহী	৯.৪	১.৭

সূত্র: আনোয়ার হোসেন: স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী (১৮৩১-১৯৭১), কলকাতা, ২০১৪, পৃ.৯৬।

জাতীয় পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রভাবে বিশ শতকে বাংলার নারী শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। যা নিম্নের সারণিতে তুলে ধরা হল:

সারণি-৬: বাংলার নারী সমাজে শিক্ষার প্রসার, ১৯১২-১৯৪১

বছর	শিক্ষাস্তর	মোট ছাত্রী	মুসলিম ছাত্রী	হিন্দু ছাত্রী	মুসলিম হার	হিন্দু হার
১৯১২	উচ্চ শিক্ষা (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়)	৪০	১	৩১	২.৫	৭৭.৫
১৯২১	উচ্চ শিক্ষা (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়)	২১৬	৩	১৪৬	১.৩৮	৬৭.৫৯
১৯৩০-৩১	উচ্চ শিক্ষা (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়)	৩৭৫	৩	৩৬৬	০.৮	৯৭.৬
১৯৪১	উচ্চ শিক্ষা (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়)	৭৬৫	১৬০	৩৬২	৫.৭৮	৮৫.৩৬
১৯১২	মাধ্যমিক শিক্ষা (মধ্যম ও উচ্চ বিদ্যালয়)	৫৯৬৬	১৩৩	৪১৮১	২.২২	৭০.০৯
১৯২১	মাধ্যমিক শিক্ষা (মধ্যম ও উচ্চ বিদ্যালয়)	১৩২৩১	৫২১	৬৭৫৪	৩.৯৩	৫১.০৪
১৯৩০-৩১	মাধ্যমিক শিক্ষা (মধ্যম ও উচ্চ বিদ্যালয়)	৮৭৭১	২৩৩	৫১১৬	২.৬৫	৫৮.৩২
১৯৪১	মাধ্যমিক শিক্ষা (মধ্যম ও উচ্চ বিদ্যালয়)	২৩৮২২	১৮৯৯	১৯৮০১	৭.৯৭	৮৩.১২
১৯১২	প্রাথমিক	২০৭২৬১	৭৬৩৫৩	১২৪৯১৭	৩৬.৮৩	৬০.২৭

১৯২১	প্রাথমিক	৩২৯৭৫৪	১৭৮৩৭১	১৪৫১৮৮	৫৪.০৯	৪৪.০২
১৯৩০-৩১	প্রাথমিক	৫১১০৭৫	২৮০৯০৩	২১৯২১৯	৫৪.৯৬	৪২.৮৯
১৯৪১	প্রাথমিক	৭৭৯১৯২	৪২৫১০৩	৩৩৯৬০৫	৫৪.৫৫	৪৩.৪৮

সূত্র: *আবদুল্লাহ্ আল মামুন: ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার (১৮৭১-১৯৪১), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ.৫৮০।*

সুতরাং বিশ শতকে নারী শিক্ষার প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে বাংলার নারী শিক্ষার বাস্তব চিত্র অনুধাবন করা যায়। বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে নারী শিক্ষায় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যাপক সাড়া প্রদান সমাজ সচেতনতারই ফল। বিশেষত বাল্য বিবাহ বন্ধ করার 'সারদা অ্যাক্ট' (১৯৩০ খ্রি.) প্রবর্তিত হলে নারীর উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ও সামাজিক পরিবর্তনে নবধারার সৃষ্টি হয়। শিক্ষার অগ্রগতির ফলশ্রুতিতে নারীরা ভোটাধিকার আন্দোলন (১৯২৩ খ্রি.) এবং ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেছে। এসব শিক্ষিত নারী গোষ্ঠী বাংলার সমাজের কুসংস্কার ও অন্ধকারকে দূরীভূত করে আলোকিত সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

তথ্যসূত্র ও টিকা:

১. A.F Salahuddin Ahmed and Bazlul Mobin Chowdhury (ed.), *Bangladesh National Culture and Heritage, An Introductory Reader,* Dhaka, 2004, P. 123-124.

২. M.A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* Vol.II. (1576-1757), Karachi, 1967, pp. 225-262.

৩. Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times,* Dacca, 1963, P.238.

৪. M.A. Rahim, *Op. cit.* P.286.

৫. অধ্যাপক শ্যামা প্রসাদ চট্টরাজ, *ভারতের শিক্ষার ইতিহাস* (প্রাচীন, মধ্য ও প্রাক স্বাধীনতা পর্যন্ত), কলকাতা, ২০১৬, পৃষ্ঠা-১০১।

৬. *Rev. James Long Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal and Behar,* Submitted to the Government in 1835, 1836 and 1838, with a brief view of its present conditions, Calcutta: Home Secretariat Press, 1868, P.18-19. স্যার ফিলিপ জোসেপ হার্টর্গ, অ্যাডামের এই মন্তব্যকে অতিরঞ্জিত মনে করেন, P.J. Hartog, *Some Aspects of Indian Education: Past and Present,* London, 1939, P.70-80. অবশ্য ১৮৮২ খ্রি. ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার লে. গভর্ণর জর্জ ক্যাম্পবেলের পরিকল্পনায় ৫০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মুসলমানদের পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় বা মক্তবসমূহ সরকারের আওতামুক্ত ছিল। সুতরাং অ্যাডামের মন্তব্য অমূলক নয় এবং এই একলক্ষ বিদ্যালয়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ছিল।

৭. M.A. Rahim, *Op. cit.* P.245.

৮. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *দৌলত উজীর বাহরাম, লায়লী মজঁনু*, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃ.১৯।

৯. Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal* (Down to A.D. 1538), Dacca. Asiatic Society of Pakistan, 1957, pp.39-83.

১০. সুপর্ণা গুপ্ত (সম্পাদিত), *ইতিহাসে নারী: শিক্ষা*, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.৩৭।

১১. *তদেব*।

১২. উদ্ধৃত, W.W. Hunter, *The Indian Mussalmans,* Reprinted Lahore, 1964, P.152.

১৩. অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ চট্টরাজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৩৫।

১৪. কৃষ্ণদাশ কবিরাজ, *চৈতন্য চরিতামৃত*, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃ.১২৫।

১৫. S.M. Jaffar, *Education in Muslim India, Being An Inquirey into the state of Education During the Muslim Period of Indian History (1000-1800 A.D),* Reprinted Delhi, 1973, p.33.

১৬. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৯০১, পৃ.৭৩-৭৫।

১৭. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়*, দ্বিতীয় খন্ড, কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৪, পৃ.১৩৮৮।

১৮. T.C. Dasgupta (ed.), *Aspects of Bangalee Society,* Calcutta, 1939, p.192.

১৯. অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ চট্টরাজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫৩।

২০. Rev. James Long Adam's Reports, P.212.

২১. Kalikinkar Datta, *Alivardi and His Times,* Calcutta, 1939. P.237, সুকুমার সেন, *বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৪৮, পৃ.১১৩।

২২. Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature,* Calcutta University, 1911, P.14, C. Stewart: *History of Bengali Language and Literature From the First Mohammedan Invasion Untill the Virtual Conquest of Bengal in the English in 1757,* London, 1847, P.408. আহছান উল্লাহ: বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১-৩।

২৩. M.A. Rahim, *Op. cit.* P. Vol.I, P.211-239.

২৪. দীনেশ চন্দ্র সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩-৭৪।

২৫. J.N Sarkar, *India Through the Ages,* Calcutta, 1979, P.52.

২৬. R.C. Dutta, *Economic History of India Under Early British Rule,* London, 1906, P.1(Preface), 39.49.

২৭. S.K. De, *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century,* Calcutta, 1919, P.24.

২৮. উদ্ধৃত, W.W. Hunter, *Op. cit,* P.153-154.

২৯. A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal, 1757-1856,* Second Edition, Dacca, 1977, P.40.

৩০. কাজী আব্দুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, কলিকাতা, ১৩৬৩, পৃ.১১৬।

৩১. K.K. Aziz (ed.), *Ameer Ali: His life and Work,* Lahore, 1968, P.47.

৩২. *Ibid,* P.40-71, Abhay Charan Das, *The Indian Rayot, Land Tax, Permanent Settlement and the Famine,* Howran, 1881, P.32-44.

৩৩. W.W. Hunter, *op. cit,* P.158-159.

৩৪. অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ চট্টরাজ, *পূর্বোক্ত*, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৫৯-১৬০।

৩৫. *তদেব*।

৩৬. *তদেব*, পৃ.১৬১।

৩৭.ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ*, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.৩৮। কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য মুসলিম সাধনা*, প্রথম খন্ড, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১, পৃ.৮।

৩৮. *তদেব*, পৃ.৯।

৩৯. মো: আবদুল্লাহ্ আল মাসুম, *বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি (১৮৮৫-১৯২১)*, বাংলা একাডেমিক, ঢাকা, ২০০৭, পৃ.৫-৬।

৪০. J.C. Marshman, *Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, Vol.II, London, 1859, P.16.

৪১. Dr. Percival Spear, *India, Pakistan and the West,* London, 1952, P.158.

৪২. যোগেশ চন্দ্র বাগল, *ডিরোজিও*, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ.১৫। মৌলানা নূর মোহাম্মদ আযমী, *ইংরেজি শিক্ষার গোড়ার কথা*, মোহাম্মদী, ২২শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮,পৃ.৪৫৮।

৪৩.Mohammad Mohar Ali, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities (1833-1857)*, Chittagong, 1965, P.2. সুনীল কুমার চ্যাটার্জী: *বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেবি ও তার পরিজন*, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ.১১।

৪৪.মৌলানা নূল মোহাম্মদ আযমী, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৪৫৮।

৪৫.C.L. Thorpe, *Education and the Development of Muslim Nationalism in Pre-Partition India, Journal of Pakistan Historical Society*, Vol. XIII, Part-I, 1965, P.12.

৪৬.সুনীল কুমার চ্যাটার্জী, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২০।

৪৭.অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ চট্টরাজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৬৫-১৬৬।

৪৮.A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal 1957-1856,* Second Edition, Dacca, Bangla Academy, 1977, P.70-71.

৪৯.কাজী আব্দুল মান্নান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২১।

৫০.H. Dodwell, *Dupleix and Clive*, London, 1920, M.N. Roy: India in Trensition, Calcutta, 1941, P.17.

৫১. যোগেশ চন্দ্র বাগল, *বাংলার উচ্চ শিক্ষা*, কলকাতা, ১৩৬০, পৃ.৫।

৫২.S.K.Dey, *History of Bengal Literature in the Nineteenth Century,* Calcutta, 1919, P.480. মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম: *ব্রিটিশ আমলে বাংলা মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.৩১। মুসলমান সদস্যরা হলেন-দরবেশ আলী, মৌলবি কাজেম আলী, মৌলবি বিলায়েত আলী ও মৌলবি নুরুন্নবী প্রমুখ। বিনয় ভূষণ রায়: *কলিকাতা স্কুল সোসাইটি*, এক্ষণ, ১৭শ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, ১৯৩১, পৃ.২।

৫৩.*Reports of the Calcutta School Society, 1819-1833*, Calcutta, 1834. মো. আবদুল্লাহ্ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩১।

৫৪.*Report on Public Instruction in Bengal 1924-25*, Calcutta, P.5-6.

৫৫.*Ibid*, P.5-6.

৫৬.A.F. Salanuddin, *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835*, Second Edition, Calcutta, 1976, P.191.

৫৭.S.N. Mukherji, History of Education in India (Modern Period), 1967, P.52.

৫৮.Syed Mahmood, *A History of English Education in India (1781-1893)*, Aligarh, 1895, P.48-50.

৫৯.D.P. Sinha, *The Educational Policy of the East India Company in Bengal to 1854*, Calcutta, 1964, P.121-209.

৬০.T.B. macauley, *Minutes on Indian Education*, Dated 2nd February, 1835, Calcutta, 1835, P.1-7.

৬১.H. Sharp, *Selection from Education Records, Part I, 1781-1839*, Calcutta, 1920. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, *(১৮০০-১৯০০)*, ঢাকা, ২০০০, পৃ.১৬৬।

৬২.John Clive Macaulay, *The Shaping of the Historian*, New York, 1973, P. 365-366.অনাথ নাথ বসু, *আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, গ্রন্থালয়, ১৩৫১, পৃ.১৭।

৬৩.A.R. Mallick, *Op.cit*. P.233.

৬৪.*Report of the General committee of Public Instruction of the presidency of Fort Willian in Bengal, 1835-36*, P. 60-61.

৬৫.*General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency. 1844-45*, Calcutta, 1845, Appendix, P. Clix-clx.

৬৬.গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৬, পৃ.২৬।

৬৭.B.B Kling, *Partner in Empire: Dwarkanath Tagore and the Age of Enterprise*, Berkeley: University of California Press, 1976, P.183.প্রসন্ন কুমার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্যঃ রাজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, দুই খন্ড, চতুর্থ সংস্করণ; কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৭১-৭৭, প্রথম খন্ড, পৃ.৩৬৭-৬৮, গোলাম মুরশিদ; *পূর্বোক্ত*, পৃ.২৭।

৬৮.C.Rover, *Love, Morals and the Feminists*, London, Routledge & K. Paul, 1970. P.21-23,27.

৬৯.রাজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৯৯।

৭০.বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, ঢাকা, প্রথম বুক ক্লাব প্রকাশ, ২০০০, পৃ.২৩০।

৭১.গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৩।

৭২.মো. আবদুল্লাহ্ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫২৮।

৭৩.অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ চট্টরাজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৬৬।

৭৪.*তদেব*।

৭৫.আনোয়ার হোসেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১*, কলকাতা, জুন ২০১৪, পৃ.৭০।

৭৬.অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ চট্টরাজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৬৭।

৭৭.*তদেব*।

৭৮.*তদেব*।

৭৯.*তদেব*।

৮০.J.C. Bagal, *Women's Education in Eastern India*, Calcutta, 1956, P.103.

৮১.রাজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, ২য় খন্ড, পৃ.৯১-৯২।

৮২.গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৫।

৮৩.আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর*, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ.২৯৩-২৯৪।

৮৪.Pyary Chand Mitra, *Biography of David Hare*, Calcutta, P.55.কল্যাণী কার্লেকর, *ভারতের শিক্ষা*, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃ.৫৬-৫৭।

৮৫.গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৫।

৮৬. মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, *বাংলাদেশের নারী শিক্ষায় জন এলিয়ট ড্রিংক ওয়াটারের ভূমিকা*, ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, একবিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃ.২৭।

৮৭.H.A Stark, *Vernacular Education in Bengal from 1813-1912*, Calcutta, 1916, P.139.

৮৮.*মাসিক দেশ*, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৫, সংখ্যা ২, পৃ.২৯।

৮৯.*তদেব*। পৃ. ৩০-৩৪।

৯০.Dipak Kumar Aich, *Emergence of Modern Bengal Elite*, Calcutta, Minerva Publications, 1995, P.12.

৯১.বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২৩১।

৯২.প্রথমাবস্থায় স্কুলটির একাধিক নাম ছিল, ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল, নেটিভ ফিমেল স্কুল, হিন্দু ফিমেল স্কুল এবং সর্বশেষ এটি বেথুন স্কুল নামে পরিচিতি পায়। ১৮৫১ খ্রি. বেথুনের মৃত্যুর পর এটির নাম হয় 'বেথুন স্কুল'। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর ভারত সরকার এ বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব ও ব্যয়ভার গ্রহণ করেন।

৯৩.জন এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১ খ্রি.) ১৮৪৮ খ্রি. বড়লাটের পরিষদের আইন সদস্য হয়ে ভারতে আসেন। তিনি একজন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র। তিনি কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি নিযুক্ত হন।

৯৪.মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২৭-২৮।

৯৫.*তদেব*।

৯৬.বিনয় ঘোষ: *পূর্বোক্ত*, পৃ.২৩০-২৩১।

৯৭.*তদেব*। গোলাম মুরশিদ বেথুন স্কুলের শুরুতে ১১ জন ছাত্রীর কথা উল্লেখ করেন। গোলাম মুরশিদ: *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৭।

৯৮. তিনি 'দুর্ভিক্ষ' কবিতায় লিখেন:

"আগে মেয়েগুলো ছিলো ভালো,
ব্রত-ধর্ম কর্তোসবে।
একা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছাঁড়গুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন 'এবি' শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।...
সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে,
পিড়িঁ পেতে আর কিখাবে।...
এরা আপন হাতে হাকিয়ে বগি গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।..
বুঝি 'হুট' বলে 'বুট' পায়ে দিয়ে, চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে।

মুহাম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ*, ঢাকা, ১৩৬৯, পৃ.১৭৭।

৯৯.J.A. Richey (ed.), *Selections from Educational Records*, Vol.2, Calcutta: Bengal Secratariat Press, 1922, P.52-53.

১০০. *General Report on Publoic Instruction in Lower Province of Bengal Presidency, 1863-64*, Calcutta: Gov. of Bengal, 1865, P.59.

১০১. ঋষি দাশ, *বিদ্যাসাগর*, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ.৭৪। মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮।

১০২. *তদেব*, পৃ.৩০।

১০৩. রাধা রমন মিত্র, *কলিকাতায় বিদ্যাসাগর*, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ.১৪।

১০৪. J.A. Richey (ed.), *Op. Cit*. P.48-49, N. Mukharji: *A Bengal Zamindar: Jaykrisna Mukherji of Uttarpara and His Times,* Calcutta: Firma, 1974, P.154. অবশ্য N-Mukharji এর মতে, বেথুনের আগে জয়কৃষ্ণ তাঁর বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১০৫. মন্মথ নাথ ঘোষ, *কর্মবীর কিশোরী চাঁদ মিত্র*, কলকাতা, আদি, ব্রাহ্ম সমাজ, ১৯২৭, পৃ.৭৩-৭৪।

১০৬. মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩১।

১০৭. Letter, Govt. of India, Dec. 22nd, 1858. মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩২।

১০৮. চন্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়, *বিদ্যাসাগর*, কলিকাতা, ১৩৭৬, পৃ.১৭২। শম্ভূচন্দ্র বিদ্যারত্নঃ *বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রম নিরাশ*, কলিকাতা, ১২৯৮, পৃ.১২৮।

১০৯. মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৩।

১১০. *তদেব*, পৃ.৩৫।

১১১. অধ্যাপক শ্যামা প্রসাদ চট্টরাজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৬৮।

১১২. মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৬।

১১৩. গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৫।

১১৪. উমেশ দত্তের নেতৃত্বে কেশবচন্দ্র সেনের কতিপয় শিষ্য মিলে 'বামাবোধিনী সভা' স্থাপন করেন। এঁরাই ১৮৬৩ খ্রি. আগস্ট মাসে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং পত্রিকার সম্পাদক ও প্রধান লেখক উমেশচন্দ্র দত্ত। পত্রিকাটি ৬০ বছর চালু ছিল এবং বাঙালি নারীদের অগ্রগতিতে এটির অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। এই পত্রিকার মাধ্যমেই জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কামিনী রায়, মানকুমারী বসু এবং রাধারানী লাহিড়ী সহ প্রায় ১৬ জন মহিলা লেখিকা এই পত্রিকায় লিখেন। বিধবা বিবাহ, বহু-বিবাহ, বাল্য বিবাহ, কৌলিণ্য প্রথা, অবরোধ প্রথা, স্ত্রী-শিক্ষা, পানাসক্তি সহ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন দিকের প্রতি নারীর দৃষ্টিভঙ্গি এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

১১৫. গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩৫।

১১৬. *তদেব*, পৃ.৪০-৪১।

১১৭. *তদেব*, পৃ.৪২।

১১৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানকুমারী বসু*, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬২, পৃ.৭।

১১৯. গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৪৩।

১২০. '*স্ত্রী শিক্ষা*', জ্ঞানাংকুর, আশ্বিন, ১২৮২, পৃ.৫২৪।

১২১. গোলাম মুরশিদ, *হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাট্য রচনা*, কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০১৪, পৃ.২৮৬-৮৭।

১২২. '*বামাবোধিনীর দশম জন্মোৎসব*', বামাবোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র, ১২৮০, পৃ.১৩২।

১২৩. ব্রাহ্ম কোন বর্ণ নয়, কিন্তু যারা ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন, তাঁরা প্রায়ই সবাই ছিলেন উচ্চ বর্ণের হিন্দু।

১২৪. Calcutta University Calender, 1911.

১২৫. জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, '*বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রী-শিক্ষায় পত্তন*', ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৫০, পৃ.৪৯৪।

১২৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়*, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬২, পৃ.১২-১৩।

১২৭. R. Strachy, *The Cause*, New York: Kennikat Press, 1969, P.132-84, 246-60.

১২৮. *Hundred Years of the University of Calcutta*, Calcutta: University of Calcutta, 1957, P.121-122.

১২৯. R. Strachy, *Op. Cit*. P.263.

১৩০. অমলেন্দু দে, *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, কলিকাতা, রত্না প্রকাশন, ১৯৭৪, পৃ.১৯৮।

১৩১. *Despatch from the Court of Director of the East India Company to the Governor General of India in Councilon the Subject of the Education of the People of India*. (No.49, dated 19th July, 1854), Reprint, EB & A.S.P.O, 1907, P.13.

১৩২. B.D. Bhatt, *Educational Documents in India (1831-1965),* New Delhi, 1969, P.18.

১৩৩. আনোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৬।

১৩৪. *তদেব*।

১৩৫. বিনয়ভূষণ রায়, *অন্ত:পূরে স্ত্রী শিক্ষা*, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ.৯৪-৯৬।

১৩৬. *Proceedings of the Female Education Commission*, Eastern Begnal and Assam, 1909.

১৩৭. *তদেব*, পৃ.৭৭-৭৮।

১৩৮. যোগেশচ্দ্র বাগল, *বাংলার স্ত্রী শিক্ষা*, কলিকাতা, ১৩৫৭, পৃ.৭। J.A. Richey, *Op.cit*. P.34-35, মো. আবদুল্লাহ্ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫২৯।

১৩৯. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ.২১৩।

১৪০. Sonia Nishat Amin, *The Early Muslim Bhadramahila: The Growth fo Learning and Creativity, 1876 to 1939*, Bharati Ray (ed.), *From the seams of History, Essays on Indian Women,* New Delhi, 2001, P.113.

১৪১. বিনয় ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২১৩।

১৪২. যোগেশচন্দ্র বাগল, *বাংলার স্ত্রী শিক্ষা, ১৮০০-১৮৫৬*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৭, পৃ.৫। আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭২।

১৪৩. Sonia Nishat Amin, *Op.cit.* P.113.

১৪৪. J.C Bagal, *Op.Cit.* P.36-51, Rcv. J. Long Adam's Reports, P.33-34.

১৪৫. মো. আবদুল্লাহ্ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫৩৩।

১৪৬. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীতে মৌলবি হিম্মত আলী সভাপতি ও মৌলবি আব্দুল মজিদ সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়। কার্যনির্বাহী সদস্যগণ হলেন-হেমায়েত উদ্দীন, জোহাদর রহীম, মকবুল আহাম্মদ, আজাদ আলী, মদচ্ছের হোসেন, সৈয়দ হযরত আলী, মুহম্মদ ফাজেল, মৌলবি নওয়াজেস ও মৌলবি মুহম্মদ ছাদেক। এছাড়াও আবদুল করিম (পরে স্কুল পরিদর্শক), আব্দুল আজিজ (পরে খান বাহাদুর), আব্দুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন যুবক ঐ সম্মিলনীর কর্মী ছিলেন। ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্য বিবরণ, ১৮৮৩, ঢাকা, ১৮৮৪, পৃ.১-৪৪। মো. আবদুল্লাহ্ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫৩৫।

১৪৭. মুনতাসির মামুন, *ঊনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সভাসমিতি*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ.১০১।

১৪৮. ১৮৮৩ খ্রি. সম্মিলনী পরীক্ষার তত্ত্বাবধায়ক ও পরীক্ষক হিসেবে আব্দুল করিম (কলকাতা), এমদাদ আলী (কলকাতা), নওয়াজেস আলী (ময়মনসিংহ), ফয়জউদ্দীন (বরিশাল) প্রমুখ সহ আরো কয়েকজন দায়িত্ব পালন করেন।

১৪৯. Ahmed Hassan Dani, *Dacca-A Record of the Changing Fortunes,* Dacca: Mrs S.S. Dani, 1956, P.121-128 মো. আবদুল্লাহ্ আল মাসুম, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৩৬।

১৫০. বিনয়ভূষণ রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৬৩-৬৪।

১৫১. সিরাজুল ইসলাম ব্যতীত আব্দুল করিম ও মৌলবি আহমদ উল্লাহ্ শ্রীহট্ট সম্মিলনীর সভ্য ছিলেন। সুন্দরী মোহন দাস, *শ্রীহট্ট সম্মিলনীর জন্মকথা*, শ্রীহট্ট, ১৩৩৬, মায়া ভট্টাচার্য: *শতাব্দী পূর্বে মুসলিম অন্ত:পুর বাসিনীদের বিদ্যাচর্চা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ষষ্ঠ বিংশ বর্ষ, ১৩৮৮, পৃ.৬৫-৬৭।

১৫২. পুরস্কার বিজেতা মুসলিম ছাত্রী হলেন, মাহমুদা খানম, তাহেরা খাতুন, সালেহা খাতুন, আমিনা খাতুন, তোহারা খাতুন প্রমুখ। দ্বাদশ বার্ষিকী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, নোয়াখালী সম্মিলনী, ১৩২৩। প্রথম সংখ্যা, পৃ.৭১-৭৫। আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭৫।

১৫৩. শামসুন্নাহার, ফাতেমা খাতুন, বিলকিস বানু এবং গোলাপজান বানু চতুর্থ শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, আলতা বানু পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষায় এবং সহর বানু, ইয়ার বানু, রাহাতারা নেসা বানু ষষ্ঠ শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিনয়ভূষণ রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮৭।

১৫৪. মৌলবি ইমদাদুল হক, *'আমাদের শিক্ষা' নবনূর*, আষাঢ়, ১৩১০। লায়লা জামান: *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯, পৃ.১৩।

১৫৫. বদরুন্নিসা খাতুন, *'স্ত্রী শিক্ষা' সওগাত*, ভাদ্র, ১৩৩৬। লায়লা জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩১।

১৫৬. ফিরোজ বেগম, *আমাদের স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সওগাত*, ভাদ্র, ১৩৩৬, লায়লা জামান: *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩১-৩২।

১৫৭. মৌলবি শেখ আবদুল জব্বার, *স্ত্রী শিক্ষা ও পর্দা, ইসলাম চিত্র ও সমাজ চিত্র*, ময়মনসিংহ, ১৩২০, পৃ.৭৫। গোলাম মুস্তফা, *বাঙালির শিক্ষাভাবনা: ১৯০৫-১৯২১*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, ১০ম খন্ড জুন, ১৯৯৪, পৃ.৮২।

১৫৮. ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বাঙালির বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনের প্রতীক। ঢাকা কেন্দ্রিক এই সংগঠনের দুই পুরোধা আবুল হুসেন ও কাজী আবদুল ওদুদ। কাজী নজরুল ও এটিকে সমর্থন করেন।'শিখা' পত্রিকা এটির 'মুখপাত্র'।

১৫৯. খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ, সমাজচিন্তা ও সাহিত্য কর্ম*, ঢাকা, কথা প্রকাশ, ২০১৫, পৃ.১৮০।

১৬০. *তদেব*, পৃ.১৮১।

১৬১. অধ্যাপক শামসুন নাহার মাহমুদ, *মুসলিম বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা*, মাসিক মোহাম্মদী, ১৪শ বর্ষ-১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৭,প.৫৫-৫৬। খোন্দকার সিরাজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৮১।

১৬২. *General Reports on Public Instruction in Bengal, 1880-81*, Calcutta, 1881, P.85. মো. আব্দুল্লাহ্ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫৩৪।

১৬৩. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার বিদ্যুৎসভা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৭ম সংখ্যা, ১৯৭৮, পৃ.১২৪-১২৫।

১৬৪. বেগম রওশন আরা, *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.৩৯।

১৬৫. *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ৩৪ বর্ষ, ৩৭৬, সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭, পৃ.২৯৭। মো. আবদুল্লাহ্ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫৩৭।

১৬৬. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ.৪৩২-৩৩। মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চট্টগ্রাম, ১৩৮৯, পৃ.২০৪।

১৬৭. আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮৩।

১৬৮. মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*। ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.৫৩৮। মো. আবদুল্লাহ্ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫৪০।

১৬৯. *তদেব*, পৃ.৫৪১।

১৭০. গোলাম মুরশিদ, *রাস সুন্দরী থেকে রোকেয়া/ নারী প্রগতির একশো বছর*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩, পৃ.১৩৭।

১৭১. *Report on Public Instruction in Bengal*, 1912-13, Calcutta, 1914, P.21. মো. আবদুল্লাহ্ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫৪১।

১৭২. এই সময়ে সরকার সাখাওয়াত স্কুলে ৭১ টাকা মাসিক অনুদান দিতেন কিন্তু মাসিক খরচ ছিল ৬০০ টাকা। পরবর্তী অনেক আবেদনের পর ১৯১৪ খ্রি. ৪৪৮ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেছে। তারপরও অতিরিক্ত ১৫২ টাকা সংগ্রহ করাই ছিল কষ্ঠসাধ্য। মুহম্মদ শামসুল আলম, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯, পৃ.১১৫।

১৭৩. *The Mussalman*, Vol. IX, March 23, 1917, No.17, P.5.আনোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৯।

১৭৪. *Census of India*, 1901, Volume VIA, Lower Provinces of Bengal, Part II, The Imperial Tables, Calcutta 1902, P.61. মো. আবদুল্লাহ্ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫৩৮।

১৭৫. *Progress of Education in Bengal 1912-13 to 1916-17*, P.110-111. মো. আবদুল্লাহ্ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫৬০।

১৭৬. আনোয়ার হোসেন: *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭৯।

১৭৭. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত): *হাজার বছরের চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫, পৃ.১৮৮।

১৭৮. Sonia Nishat Amin, *Op. Cit*. P.130.

১৭৯. সুপর্ণা গুপ্ত (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ.৬২-৬৬।

১৮০. *তদেব*, পৃ.৬৭-৭৫।

১৮১. মো. আবদুল্লাহ্ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫৬১।

১৮২. *তদেব*, পৃ.৫৬১-৫৬২।

১৮৩. *Report of the Committee appointed by the Bengal Government to Consider the questions Connected with the Muhammedan Education, Calcutta, 1914-15,* File No.11-C/66, Progs, No.92-93, November, 1914. আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭৯৪-৯৫।

১৮৪. *Report on the Public Instruction in Bengal, 1918-19*, P.iii, 18, 28. আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৯৬।

১৮৫. শাহিদা খাতুন ও মাহবুব আজাদ (সম্পাদিত), *রবীন্দ্র অভিভাষণ পূর্ববঙ্গ ও অন্যত্র*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১২, পৃ.৯৭।

১৮৬. আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭৫।

১৮৭. মো. আবদুল্লাহ্ আল মাসুম, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫৬৬।

১৮৮. আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৯২-৯৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে শিক্ষার প্রকৃতি ও ধরণ

সাধারণত 'ব্যক্তি' বা 'মানুষ' যা কিছু শেখে তাই 'শিক্ষা' নামে অভিহিত। মানুষের জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন ধারায় 'শিক্ষা' মানুষের মূল্যবোধ সম্পৃক্ত প্রপঞ্চে রূপলাভ করেছে। সেক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃত 'শিখন' অংশটি 'শিক্ষা' হিসেবে মনে করা হয়। 'Education' প্রত্যয়টি শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থে ল্যাটিন শব্দ 'Educare' থেকে এসেছে, যার ভাবার্থ হচ্ছে 'to lead out' বা 'to draw out', অর্থাৎ শিক্ষা বলতে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তির 'বিকাশ সাধন' বা তার অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ বুঝায়। অনেকের মতে, ইংরেজি Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Educare' থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার ভাবার্থ হলো 'to bring up' অথবা 'to train' 'to mould', অর্থাৎ শিক্ষা বলতে শিক্ষার্থীকে 'লালন করা' অথবা 'প্রশিক্ষণ দেওয়া' অথবা 'কোন কিছুর আদলে তৈরি করা'।[১] আবার ল্যাটিন শব্দ 'Educo'-কে অনেকেই ইংরেজি 'Education' শব্দের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। এখানে 'E' অর্থ 'out' এবং 'duco' অর্থ 'to lead' হিসেবে গণ্য করা হয়। সুতরাং কোন কিছু 'পরিচালিত করা' বা 'বের করা' বা 'প্রতিভাত করা'-কে 'শিক্ষা' বলা হয়েছে।[২] অতএব মানুষের সহজাত বুদ্ধি বা সম্ভাবনাকে বিকশিত ও পরিচালিত করাই হচ্ছে শিক্ষা। ব্যক্তির বিশেষত শিশুর শারীরিক, মানসিক, অধ্যাত্মিক বিকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জীবনের দিকে পরিচালিত করাই শিক্ষার কাজ। প্রত্যেক আধুনিক রাষ্ট্রই শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত শিক্ষার কাঠামো, বৈশিষ্ট্য ও মানের উপর রাষ্ট্রের উন্নতি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রসমূহের ন্যায় বাংলাদেশও শিক্ষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃত জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১৫,১৬,১৭,১৯,২৮ ও ৪১-এ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষা বিষয়ক ধারাসমূহের উল্লেখ রয়েছে। এজন্য বাংলাদেশ সরকার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন এবং জনগণকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য গ্রহণ করেছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও কাঠামোকে সমৃদ্ধ করে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতার ঊষালগ্ন হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাহিদা পূরণ, দক্ষ ও কর্মমুখী মানব সম্পদ সৃষ্টি, উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অধিকতর সম্পৃক্তকরণ ও নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার আর্থিক সহায়তায় শিক্ষার সামাজিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, ভৌত কাঠামোর সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করছে। অন্যদিকে শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মান বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করছে স্বাধীন বাংলাদেশে ড. কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে গঠিত প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন[৩] (১৯৭২ খ্রি.) এর রিপোর্টে সংবিধানের আলোকে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত গঠিত বিভিন্ন জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালার ভিত্তিতে সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শ, দর্শন ও প্রয়োজনানুসারে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালনা করছেন। নিম্নে বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ধরণ ও প্রকৃতি সংক্ষিপ্তাকারে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.১ বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো:

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত: দেশীয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত কার্যক্রম। দেশীয় বলতে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা। যা সুলতানী আমল ও মুঘল আমলে অনুসৃত হয়ে ব্রিটিশদের প্রতিকূল পরিবেশেও স্বতন্ত্র ধারা বজায় রেখেছে। ইউরোপিয় মিশনারি ও ব্রিটিশ সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাই পাশ্চাত্য শিক্ষা। সদ্য স্বাধীন হওয়া পাকিস্তানে (১৯৪৭ খ্রি.) পূর্ব পাকিস্তান সরকার (বর্তমান বাংলাদেশ) কর্তৃক গঠিত আকরাম খাঁ শিক্ষা কমিটি (১৯৫২ খ্রি.) ও আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিটি (১৯৫৭ খ্রি.) এবং পাকিস্তান শরীফ কমিশন (১৯৫৮ খ্রি.) এর সুপারিশ মালার ভিত্তিতে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক মাদ্রাসা শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, নারী শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশেও শিক্ষার এই কাঠামোটি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। মাধ্যমিক ও অন্যান্য শিক্ষাস্তরসমূহ সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হচ্ছে।[৪]

বর্তমান বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষার ছয়টি স্তর রয়েছে, যা নিম্নরূপ:[৫]

(ক) তিন বছর মেয়াদী প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা।

(খ) পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী)।

(গ) তিন বছর মেয়াদী নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী)।

(ঘ) দুই বছর মেয়াদী মাধ্যমিক শিক্ষা (নবম থেকে দশম শ্রেণী)।

(ঙ) দুই বছর মেয়াদী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী)।

(চ) তিন থেকে পাঁচ বছর মেয়াদী উচ্চ শিক্ষা (প্রথম বর্ষ স্নাতক থেকে স্নাতকোত্তর)।

এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার অব ফিলোসফি (এম.ফিল) এবং ডক্টর অব ফিলোসফি (পি.এইচ.ডি.) ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

২.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা:

শিশুরা সাধারণত ৩ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৮৮ খ্রি.) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার চারটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন। এসব উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছে:

১. শিশুর শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক পরিপুষ্টি সাধন করা।

২. ভবিষ্যতে তাকে সুসমন্বিত ও সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবন যাপনে সহায়তা করা।

৩. খেলাধুলা ও আনন্দদায়ক পরিবেশের মাধ্যমে শিশুর প্রয়োজনীয় অভ্যাস সৃষ্টি করা।

৪. পরবর্তী জীবনে শিশুর আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি স্থাপন করা।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (২০০০ খ্রি.) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার চালুর সুপারিশ করেছে।[৬]

২.৩ প্রাথমিক শিক্ষা:

বাংলাদেশে ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বমোট সংখ্যা ১৩৪১৪৭, এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ১৭৩৩৮১০০ জন শিশু লেখাপড়া করে। শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ৬৮৫৪০০। ১৯৭৩ খ্রি. প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা হয়। ড. কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪ খ্রি. প্রকাশিত) এ প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়:

> "আমাদের দেশে গণমানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও তার ফল হিসেবে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতি যেসব পথে আসতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি সুষ্ঠু গতিশীল প্রাথমিক শিক্ষা। এই প্রাথমিক শিক্ষাই পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার জন্য আবশ্যিক ভিত্তি রচনা করবে। এই ভিত্তিমূলকে দূর্বল রেখে শিক্ষার উচ্চতর স্তরকে শক্তিশালী করে গড়া সম্ভব নয়।"[৭]

২.৩.১ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকরণঃ

বাংলাদেশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (Ministry of Primary and Mass Education) নামে পৃথক মন্ত্রণালয়ে যাবতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে ১১ ধরণের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
২. রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
৩. আনরেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
৪. কমিউনিটি বিদ্যালয়।
৫. উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়।
৬. উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়।
৭. এবতেদায়ি মাদ্রাস।
৮. পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়।
৯. স্যাটেলাইট বিদ্যালয়।
১০. কিন্ডারগার্টেন স্কুল।
১১. এনজিও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়।[৮]

এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রম অনুসৃত হয়। শুধুমাত্র স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠদান করা হয়। দুর্গম এলাকায় ছোট ছোট শিশুদের বাসস্থানের কাছাকাছি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যালয়ে যাতায়াত সহজ করা হয়। পরবর্তীতে নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হবে বলে ধারণা করা হয়। যা মাদার স্কুল হিসেবে বিবেচিত হয়।

২.৩.২ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীঃ

সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনে সমগ্র দেশে বিভিন্ন প্রকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। সরকারি, বেসরকারি, বিদেশী অর্থ সহায়তা এবং এনজিও উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এসকল বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন মাত্রার সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষার অগ্রগতি নিম্নোক্ত সারণি হতে ধারণা পাওয়া যায়।

সারণি-১[৯]: বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃদ্ধির ধারা

সন	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা
১৯৫০	২৬,৩৫২
১৯৫৫	২৬,২২০
১৯৬০	২৬,৬৮৪
১৯৬৫	২৮,০৮৩
১৯৭০	২৮,৭৩১
১৯৭৫	৪০,৩১৩
১৯৮০	৪৩,৯৩৬
১৯৮৭	৪৪,২০৫
১৯৯৬	৮০,৮১৮
১৯৯৭	৭৭,৬৮৫
১৯৯৮	৭৯,৮০৩
১৯৯৯	৭৮,৮৪০
২০০০	৭৬,৮০৯
২০০১	৭৮,১২৬

সূত্র: জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন ২০০৩ (প্রকাশিত, মার্চ, ২০০৪), পৃ.২৮।

স্বাধীনতা পূর্বকালে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃদ্ধির ধারা অত্যন্ত মন্তর। ১৯৫০ খ্রি. হতে ১৯৭০ খ্রি. পর্যন্ত বিশ বছরে মোট বিদ্যালয় বেড়েছে মাত্র ২৩৭৯টি। অপরদিকে স্বাধীনতাত্তোর প্রথম চার বছরে বিদ্যালয় সংখ্যা বেড়েছে ১১৫৮২ টি। স্বাধীনতার ত্রিশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০০১ খ্রি. বিদ্যালয় সংখ্যা হয়েছে ১৯৭০ খ্রি. এর ২.৭২ গুণ। যার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯৩৯৫টি। প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত থাকায় বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

সারণি-২[১০]: প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী বৃদ্ধি ধারা:

শিক্ষার্থী সংখ্যা				% হার	
সাল	মোট	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
১৯৫০	২৪৪৯৪৩৬	১৯৬৪৪১৪	৪৮৫০২২	৮০.২০	১৯.৮০
১৯৬০	৩৪৩৩৩০৭	২৪৭৮৮২৮	৯৫৪৪৭৯	৭২.২০	২৭.৮০
১৯৭০	৫০৭৩২৬৪	৩৪৫৩০৫৩	১৬২০২১১	৬৮.০৬	৩১.৯৪
১৯৭৫	৮৫৮৮৯৫২	৫৮২২৩৩৬	৩০৬৬৬১৬	৬৭.৭৯	৩২.২১
১৯৮০	৮২১৯৩১৩	৫১৮২০৩১	৩০৩৭২৮০	৬৩.০৫	৩৬.৯৫
১৯৯১	১২৬৩৫৪১৯	৬৯১০০৯২	৫৭২৫৩২৭	৫৪.০৭	৪৫.৩
১৯৯৪	১৫১৮০৬৮০	৮০৪৮১১৭	৭১৩২৫৬৩	৫৩.০	৪৭.০
১৯৯৮	১৮৩৬০৬৪২	৯৫৭৬৯৪২	৮৭৮৩৭০০	৫২.২	৪৭.৮
২০০০	১৭৬৬৭৯৮৫	৯০৪২৬৯৮	৮৬৩৫২৮৭	৫১.১	৪৮.৯
২০০১	১৭৬৫৯২২০	৮৯৮১৭৯৫	৮৬৬৯৪২৫	৫১.০	৪৯.০

সূত্র: Ellen Sattar: Universal Primary Education in Bangladesh, UPL, Dhaka, 1982, P.36, Primary Education Statistics in Bangladesh, 2001, DPE, 2002.

বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে শিক্ষার্থী সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫০ খ্রি. থেকে ১৯৭০ খ্রি. পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৬,২৩৮২৮ বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তী ত্রিশ বছরে অর্থাৎ ২০০১ খ্রি. হয়েছে ১,২৫,৮৫৯৫৬ জন। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় বালক বালিকাদের অবস্থানও যথেষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ।

২.৩.৩ প্রাথমিক শিক্ষাকে আকর্ষণীয়করণঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিকহারে শিশুকে নিয়ে আসা এবং তাদের বিদ্যালয় ত্যাগ রোধ করার জন্য সরকার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রথমত: স্যাটেলাইট স্কুল, কমিউনিটি স্কুল স্থাপন করে অপেক্ষাকৃত দূর্গম ও পশ্চাৎপদ এলাকায় শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের নাগালে নিয়ে এসেছে। দ্বিতীয়ত: 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী' দরিদ্র পরিবারের শিশুকে বিদ্যালয়ে গমণ, লেখাপড়ায় উৎসাহ ও পুষ্টি প্রদানে ভূমিকা রাখছে। তৃতীয়ত: জেনারেল এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় দরিদ্র শিশু বিশেষত মেয়েদের বিদ্যালয় সামগ্রী, স্কুল ইউনিফর্ম, খেলাধুলার সরঞ্জামাদি প্রদান ও প্রত্যেক মাসে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ কর্মসূচী প্রাথমিক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করেছে। চতুর্থত: স্কুলে গমণের বাহিরে থাকা বা স্কুল পরিত্যাগকারী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করার জন্য ১৭টি বেসরকারি সংস্থাকে স্বাক্ষরতা কর্মসূচীতে সরকার যুক্ত করেছে। পঞ্চমত: সরকার কর্তৃক জাতীয় প্রচার মাধ্যম তথা রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব প্রভৃতির প্রচারণা অভিভাবক তথা জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিশুদের স্কুলে যাওয়ার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.৩.৪ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকঃ

বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ৩৭৫৯৬৪ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত আছে। তাছাড়া এনজিও বিদ্যালয়সমূহে ২৯৮৫৪ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা কাজ করছেন। নিম্নের সারণিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকার সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

সারণি-৩[১১]: বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষকের চিত্র

সাল	কর্মরত শিক্ষক			
	মোট শিক্ষক	পুরুষ	মহিলা	মহিলা (%)
১৯৯১	১৬০০৯৮	১২৬৩৪১	৩৩৭৫৭	২১.১
১৯৯২	১৫৬৪৮০	১২২৭০০	৩৩৭৮০	২১.৬
১৯৯৩	১৫৭৬৩৩	১২০১০৪	৩৭৫২৯	২৩.৮
১৯৯৪	১৫৯১৪৯	১১৯৩২৬	৩৯৮২৪	২৫.০
১৯৯৫	১৫৮৬৫৮	১১৫৯৫০	৪২৭০৮	২৬.৯
১৯৯৬	১৬১৪৫৮	১১৬২৫০	৪৫২০৮	২৮.০
১৯৯৭	১৫৮০৫৭	১১৩৬৫৫	৪৪৪০২	২৮.১
১৯৯৮	১৫৩২৪৭	১০৫৩৯২	৪৭৮৫৫	৩১.২
১৯৯৯	১৫৮৩১৭	১০৫০৭২	৫৩২৪৫	৩৩.৬
২০০০	১৫৮২১৬	১০৪৫৮৮	৫৩৬২৮	৩৩.৯
২০০১	১৬২০৯০	১০১০৮২	৬১০০৮	৩৭.৬

সূত্র: Primary Education Statistics in Bangladesh, 2001, DPE, 2002.

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে প্রাথমিক শিক্ষকও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষকের বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক নয়। তবে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা ক্রামন্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষক রয়েছে তাদের অধিকাংশই মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাস। তবে কিছু কিছু শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছেন যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস বা উচ্চ শিক্ষিত। অধিকাংশ শিক্ষক/শিক্ষিকাই পিটিআই থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।[১২]

২.৩.৫ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন:

স্বাধীন বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত হয়। ১৯৭৩ খ্রি. প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়। ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানি শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকাল (১৯৮০-৮৫ খ্রি.) থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে এটি বাস্তবায়নের জন্য

প্রশাসনিক পূর্ণগঠন আবশ্যক হয়ে পড়ে। এজন্য ১৯৮১ খ্রি. জনশিক্ষা দপ্তর হতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পৃথক পরিদপ্তর গঠন করা হয়। ১৯৮২ খ্রি. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ আদেশ বলে থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। এসময়ে উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার স্তরভিত্তিক কাঠামো নিম্নরূপ:[১৩]

(ক) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী স্তর।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সর্বোচ্চ নির্বাহী স্তর।

(গ) বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস-সর্বোচ্চ তত্ত্বাবধায়নিক স্তর।

(ঘ) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার অফিস-তত্ত্বাবধায়নিক স্তর।

(ঙ) উপজেলা শিক্ষা অফিস-প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধায়নিক স্তর।

(চ) প্রাথমিক বিদ্যালয়-কার্যকরণ স্তর।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৯০-১৯৯৫ খ্রি.) পরবর্তী ২০০০ খ্রি. মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ছিল বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। ফলশ্রুতিতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়। সর্বোপরি বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রধান শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি[১৪] ও শিক্ষক অভিভাবক সমিতির[১৫] মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

২.৪ মাধ্যমিক শিক্ষা:

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ মাধ্যমিক শিক্ষা সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যবর্তী স্তরটি হলো মাধ্যমিক শিক্ষা। এ সম্পর্কে ড. কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের মন্তব্য কচ্ছে, "শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী ও ডিগ্রি শিক্ষার পূর্ববর্তী শিক্ষাক্রম মাধ্যমিক শিক্ষা নামে চিহ্নিত। মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষা কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর, শিক্ষার্থীদের বয়:সীমা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা কৈশোর ও কৈশোরোত্তরকালের শিক্ষা।"[১৬] পরবর্তীতে অন্যান্য শিক্ষা কমিশনও একই ধারণা পোষণ করেছে। মাধ্যমিক স্তরের বয়:সন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি বহু বৈচিত্রময়। এসব শিক্ষার্থীর বিকাশের সুযোগ প্রদানের নিমিত্তে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় করা হয়েছে। ড. কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে (১৯৭৪ খ্রি.) মাধ্যমিক শিক্ষার ৪টি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন, যা নিম্নরূপ:[১৭]

প্রথমত: প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা।

দ্বিতীয়ত: সুসমন্বিত ও কল্যাণধর্মী জীবনযাপনের জন্য সচেতন, কর্তব্যবোধের উদ্বুদ্ধ, সৎ ও প্রগতিশীল জীবন দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা।

তৃতীয়ত: দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়াসে প্রয়োজনীয় কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মকুশল জনশক্তি সরবরাহ করা।

চতুর্থত: মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিও (২০০০ খ্রি.) মাধ্যমিক শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এ কমিটিও নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো নির্ধারণ করে। সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা-এই তিন ধারাভিত্তিক মাধ্যমিক শিক্ষা চালুর সুপারিশ করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ২০০০-এর মাধ্যমিক শিক্ষার নির্ধারিত পাঁচটি লক্ষ্য হচ্ছে:[১৮]

(ক) শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা।

(খ) কর্ম জগতে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি রূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।

(গ) উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা।

(ঘ) শিক্ষার্থীর প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা।

(ঙ) শিক্ষার্থীর মৌলিক বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান দান।

২.৪.১ মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো

তিন স্তর বিশিষ্ট বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর যাবতীয় ব্যয়ভার সরকার বহন করে। অন্যদিকে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতনভাতার ১০০% সরকার প্রদান করলেও সামগ্রিক দায়িত্ব 'স্কুল ম্যানেজিং কমিটি' (School Managing Committee) পালন করে। সরকারি নির্দেশ ও নীতিমালা অনুসরণ করে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করলেও স্থানীয় ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তিন স্তরের মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো নিম্নরূপ:

(ক) নিম্ন মাধ্যমিকঃ

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরটি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদী কার্যক্রম। মাধ্যমিক শিক্ষার এই প্রাথমিক স্তরটিতে একমুখী শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ২৩৮৫ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে এবং বেসরকারিভাবে এসব বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। যার ছাত্র সংখ্যা ৪৩৮৯০৩।

(খ) মাধ্যমিকঃ

দুই বছর মেয়াদী মাধ্যমিক স্তরটি নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই স্তরে বহুমুখী শিক্ষাক্রম (মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা) চালু রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৫৫৮৭টি। এসব বিদ্যালয়ে ৮৮৫৭৬১৯ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে।

(গ) উচ্চ মাধ্যমিকঃ

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত দুই বছর মেয়াদী উচ্চ মাধ্যমিক স্তর চালু রয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ১১৬টি সরকারি কলেজ ও ২৪৮৭টি বেসরকারি কলেজ রয়েছে। এসব কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে।

নিম্নোক্ত সারণিতে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠান, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

সারণি-৪[১৯]: মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (২০০২)

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ব্যবস্থাপনা	প্রতিষ্ঠান		শিক্ষক		ভর্তি	
		মোট	মহিলা	পুরুষ ও মহিলা	মহিলা	ছেলে ও মেয়ে	মেয়ে
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	পাবলিক	--	--	--	--	--	--
	প্রাইভেট	৩২৪৫	৮৫৬	২১৩১১	৩৪৩০	৭৩২২৯৮	৪৩৯৪৩৭
	মোট	৩২৪৫	৮৫৬	২১৩১১	৩৪৩০	৭৩২২৯৮	৪৩৯৪৩৭
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	পাবলিক	৩১৭	১৪৭	৬৯১৩	২৪১০	২২১২১৫	১০১৪৪৭
	প্রাইভেট	১২৬০৪	২০১৮	১৫৫০৫৩	২৪৫৩৬	৬৯৩৩৪৯৭	৩৬৫২২১৩
	মোট	১২৯২৬	২১৬৫	১৬১৯৬৬	২৬৭৬৬	৭১৫৪৭১২	৩৭৫৬৬৬০
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপমোট	পাবলিক	৩১৭	১৪৭	৬৯১৩	২৪১০	২২১২১৫	১০১৪৪৭
	প্রাইভেট	১৫৮৪৯	২৮৭৪	১৭৬৩৬৪	২৭৭৮৬	৭৬৬৫৭৯৫	৪০৯৪৬৫০
	মোট	১৬১৬৬	৩০২১	১৮৩২৭৭	৩০১৯৬	৭৮৮৭০১০	৪১৯৬০৯৭
উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ	পাবলিক	১১	৭	১৯১	৭২	৩৩২৬	২২৪১
	প্রাইভেট	১৪৭৪	৩০৯	২৭৬৫৪	৫৪৮৩	৩২৭৩৬০	১৬৫২৯৩
	মোট	১৪৮৫	৩১৬	২৭৮৪৫	৫৫৫৫	৩৩০৬৮৬	১৬৭৫৩৪

সূত্র: ব্যানবেইস, নভেম্বর, ২০০৩ (প্রকাশিত মার্চ, ২০০৪)

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা মূলত বেসরকারি উদ্যোগেই বিকশিত হয়েছে। যা ব্রিটিশামল ও পাকিস্তানামলে গড়ে উঠতে থাকে। মাধ্যমিক ছাত্রীর সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে শিক্ষায় ছাত্রের হারকেও অতিক্রম করেছে। তবে পাঠদানে পুরুষ শিক্ষকের সংখ্যাই বেশি।

২.৪.২ মাধ্যমিক শিক্ষার বিকাশ ধারা

মাধ্যমিক শিক্ষাকে শিক্ষার মেরুদন্ড বলা হয়। এ সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন ২০০৩-এ বলা হয়:

> "শিক্ষা ব্যবস্থাকে মানবদেহের সাথে তুলনা করলে প্রাথমিক শিক্ষাকে পদযুগল, মাধ্যমিক শিক্ষাকে মেরুদন্ড, উচ্চ শিক্ষাকে মস্তিষ্ক বলা যেতে পারে। আর সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও উচ্চারিত বাগধারাটি হচ্ছে শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড, প্রকৃতপক্ষে মেরুদন্ডটি হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর। অর্থনীতির গবেষকরা বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার না হলে উন্নয়নের যাত্রাই শুরু হয় না অর্থাৎ তা প্রাথমিক ধাপেই প্রবেশ করেনা। আর উন্নয়ন টেকসই বা স্থিতিশীল করার জন্য প্রয়োজন মাধ্যমিক শিক্ষার। অর্থাৎ একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নের জন্য মধ্যম শ্রেণীর জনশক্তিকে গড়ে তোলার কাজ করে মাধ্যমিক শিক্ষা।'[২০]

মাধ্যমিক শিক্ষার বিকাশই জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতাত্তোর সময়কাল হতে এ বিষয়ে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও বেসরকারি শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের প্রচেষ্টায় বিগত শতাব্দীর আশির দশক হতে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন লক্ষণীয়। মাধ্যমিক শিক্ষার বিকাশ ধারার তথ্য উপাত্ত নিম্নোক্ত সারণিতে দেয়া হল:

সারণি-৫[২১]: মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি ধারা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ		প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			বৃদ্ধির শতকরা হার	
		১৯৮৩	১৯৯৩	১৯৯৯	১৯৮৩-৯৩	১৯৯৩-১৯৯৯
					১০ বছরে বৃদ্ধি	৬ বছরে বৃদ্ধি
স্কুল	নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল	২০৭৩	১৯০৫	৩০২৪	-৮	৫৯
	মাধ্যমিক স্কুল	৬৭৮০ (১৭৫)	৯১৯০ (৩১৭)	১২২৬৯ (৩১৭)	৩৬	৩৪
	মোট (স্কুল)	৮৮৫৩ (১৭৫)	১১০৯৫ (৩১৭)	১৫২৯৩ (৩১৭)	২৫	৩৮
	উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল	২৫২ (৩)	৩৮৪ (১১)	১০৩০ (৮)	৫২	১৬৮

সূত্র: জাতীয় শিক্ষা জরিপ (পোস্ট প্রাইমারি) রিপোর্ট, ব্যানবেইস, ২০০২। (বন্ধনীর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা)

উপরোক্ত সারণির তথ্য মতে ১৯৮৩-১৯৯৩, এই দশকে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৫% বেড়েছে। কিন্তু পরবর্তী ছয় বছরে বেড়েছে ৩৮%। উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান আলোচ্য এক দশকে বেড়েছে ৫২% এবং পরবর্তী ছয় বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬৮%। আবার ২০০২ খ্রি. নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথাক্রমে ১৬১৬৬ ও ১৪৮৫। অর্থাৎ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও শিক্ষার চাহিদানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বাড়ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বৃদ্ধিধারা নিম্নের সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি-৬[২৩]: মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বৃদ্ধি ধারা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ		মোট ছাত্রী	শিক্ষার্থীর সংখ্যা			বৃদ্ধির শতকরা হার	
			১৯৮৩	১৯৯৩	১৯৯৯	১৯৮৩-১৯৯৩ (১০ বছরে বৃদ্ধি)	১৯৯৩-১৯৯৯ (৬ বছরে বৃদ্ধি)
স্কুল	নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল	মোট	১৭১৫৭২	৩৪১৯৭৭	৬৯৮৫০৪	২৬	১০৪
		ছাত্রী	১০৮০৩১	১৮৩৪৯৮	৩৯৬৭৭৫	৭০	১১৬
	মাধ্যমিক স্কুল	মোট	২১২৯৪৭৮	৩৮০৯৫১৫	৬৬৮১২১২	৭৯	৭৫
		ছাত্রী	৬৫৩৬৮৬	১৬৮০০২৮	৩৫৪২১৫০	১৫৭	১১১
	মোট (স্কুল)	মোট	২২৯৫৩৪	৪১৫১৪৯২	৭৩৭৯৭১৬	৮১	৭৮
		ছাত্রী	৭৬১৭১৭	১৮৬৩৫২৬	৩৯৯৮৯২৫	১৪৫	১১১
	মাধ্যমিক স্কুল	মোট	৬৯০৩২	১২০৬৯৪	২৭৬৯৫২	৭৫	১২৯
		ছাত্রী	১৪০৬৪	৪৫৯৬৪	১২৮৮৯৪	২২৭	১৮০

সূত্র: জাতীয় শিক্ষা জরিপ (পোস্ট প্রাইমারি) রিপোর্ট, ব্যানবেইস, ২০০০।

প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির সাথে সাথে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর বৃদ্ধিও ঘটেছে। ১০ বছরে (১৯৮৩-১৯৯৩ খ্রি.) নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বৃদ্ধি ৮১% এবং পরবর্তী ছয় বছরে শিক্ষার্থী বৃদ্ধি ৭৮%। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিকে এ সংখ্যা বৃদ্ধি যথাক্রমে ৭৫% এবং ১২৯%। পরবর্তীকালেও মাধ্যমিকে শিক্ষার্থী

বৃদ্ধি ধারা অব্যাহত রয়েছে। এজন্য বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার ধারা বিকাশমান এবং সমৃদ্ধ হয়েছে।

২.৪.৩ মাধ্যমিক স্তরে পাঠদানকারী শিক্ষক

মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী বৃদ্ধির সাথে সাথে পাঠদানকারী শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে ও বার্ষিক বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষক নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ একটি চলমান প্রক্রিয়া যা শিক্ষার উন্নয়নের প্রধান অবলম্বন। নিম্নে শিক্ষক বৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি-৭[২৪]: মাধ্যমিক শিক্ষক বৃদ্ধি ধারা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ		মোট মহিলা	শিক্ষক-শিক্ষিকা			বৃদ্ধির হার %	
			১৯৮৩	১৯৯৩	১৯৯৯	১৯৮৩-১৯৯৩ (১০ বছরে বৃদ্ধি)	১৯৯৩-১৯৯৯ (৬ বছরে বৃদ্ধি)
স্কুল	নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল	মোট	১১৬০৮	১২৪৩৫	১৯৮৮৫	৭	৬০
		মহিলা	৭৬৩	১৩২৩	৩২৬১	৭৩	১৫
	মাধ্যমিক স্কুল	মোট	৭৫৭১০	১১৪২৫৯	১৫৫৭১২	৫১	৩৬
		মহিলা	৭৬৫৪	১৫১৭৪	২৩৪৭১	৯৮	৫৫
	উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল	মোট	২৯০০	৫৭৮০	১৯৭৮৩	৯৯	২৪২
		মহিলা	২৮০	১০৬৩	৩৬৬৫	২৭৮	২৪৫

সূত্র: জাতীয় শিক্ষা জরিপ (পোস্ট প্রাইমারি) রিপোর্ট, ব্যানবেইস, ২০০০।

আলোচ্য সময়ের প্রথম দশক (১৯৮৩-১৯৯৩ খ্রি.) নিম্নমাধ্যমিকে শিক্ষক বেড়েছে ৭% যা পরবর্তী ছয় বছরে (১৯৯৩-১৯৯৯ খ্রি.) তা বেড়েছে ৬০%। নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে প্রথম দশকে শিক্ষক বৃদ্ধি ৫১% হলেও পরবর্তী ছয় বছরে তা বেড়েছে ৩৬%। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক বৃদ্ধির এই হার যথাক্রমে ৯৯% ও ১৪২%।

পরবর্তী সময়েও শিক্ষক বৃদ্ধির প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকে উচ্চ হারে শিক্ষক বৃদ্ধি বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নয়নকেই নির্দেশ করে।

২.৪.৪ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা

ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশের বিদ্যালয় শিক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ১৮৫৪ খ্রি. উডস ডেসপাচের সুপারিশের ভিত্তিতে জনশিক্ষা পরিচালক বা ডি.পি.আই অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে ১৯৮০ খ্রি. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটি পুর্ণর্গঠিত হয়। ১৯৮১ খ্রি. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সৃষ্টিকালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৫] এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং প্রধান হলেন মহাপরিচালক এই দপ্তরের চারটি শাখা হচ্ছে কলেজ ও প্রশাসন, মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন তাছাড়া শারীরিক শিক্ষা শাখা নামের অন্য একটি শাখা উপরিচালক দ্বারা পরিচালিত হয়। আঞ্চলিক পরিদপ্তরের উপরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক/ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হয়।

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কার্যাবলীর মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষা প্রদানও শিক্ষার মান উন্নয়ন। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনা'। শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটি পালন করে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB)। এটির প্রধান কাজ প্রথম শ্রেণী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা। একই সাথে শিক্ষাক্রমানুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ, অনুমোদন ও বিতরণের দায়িত্বও জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পালন করে। বাংলাদেশ স্কুল টেকস্টবুক বোর্ড (BSTB) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র (NCDC) এর সমন্বয়ে ১৯৮৩ খ্রি. ২ অক্টোবর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠিত হয়।[২৬] 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড' এর মাধ্যমে এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। স্যাডলার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯২১ খ্রি. ঢাকা শহরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৭ খ্রি. এটির নাম হয় 'ইস্ট বেঙ্গল পাকিস্তান সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড'। ১৯৬২ খ্রি. এই বোর্ডের নামকরণ করা হয় 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। ১৯৬২ খ্রি. রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোরে নতুন শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৫ খ্রি. চট্টগ্রামে, ১৯৯৯ খ্রি. বরিশাল ও সিলেট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থাপনা গতিশীল করা হয়েছে।[২৭]

২.৪.৫ মাধ্যমিক শিক্ষার দূর্বলতা

আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বা সক্ষমতা লাভ করেনি। শিক্ষা ব্যবস্থায় কতিপয় সমস্যাবলী শিক্ষার অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করছে। শিক্ষার উন্নয়নে প্রধান সমস্যাবলীর মধ্যে জাতীয় নীতি নির্ধারণে অপরিনামদর্শী পরিকল্পনায় শিক্ষার অপচয়, পূর্ণাঙ্গ জাতীয় নীতির অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সুশাসনের অভাব, সনাতন পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, ভৌত অবকাঠামো সমস্যা, আধুনিক পাঠ পরিচালনায় দক্ষ জনবলের অভাব, সর্বাধুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও নৈতিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা, শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক প্রভাব, ম্যানেজিং কমিটির অদক্ষতা, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রবণতা বিষয়াবলীও মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রভাবিত করছে। এসব সমস্যাবলীর সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার মেরুদন্ডটির শক্ত অবস্থান সৃষ্টি করলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। আগামী দশকে একটি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং মর্যাদাবান রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহত হবে।

২.৫ উচ্চ শিক্ষাঃ

ব্রিটিশ শাসনামলে লর্ড কার্জন (১৮৯৮-১৯১১ খ্রি.) শিক্ষা সংস্কারের নিমিত্তে ১৯০২ খ্রি. ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করেন।[২৮] এই কমিশন ভারতে উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন, গবেষণা, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, ছাত্র কল্যাণ, শিক্ষাক্রম, পরীক্ষা পদ্ধতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করেন। ১৯১২ খ্রি. ২৭ মে ব্যারিস্টার আর. নাথানিয়েলকে প্রধান করে গঠিত কমিশনের সুপারিশের আলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৯] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ১৯১৭ (ড. এম.ই. স্যাডলার কমিশন) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সংস্কার এবং উন্নয়নের জন্য কতিপয় সুপারিশ রিপোর্টে পেশ করেন।[৩০] পাকিস্তান আমলে শিক্ষা সচিব এস.এম. শরীফকে প্রধান করে ১৯৫৮ খ্রি. ৩০ ডিসেম্বর গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ খ্রি. ডিসেম্বরে প্রতিবেদন জমা দেয়।[৩১] এই কমিশন উচ্চ শিক্ষায় ব্রিটিশামলের ব্যবস্থাপনাকেই অনুসরণ করেছে।

সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ের সকল শিক্ষাকে উচ্চ শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই শিক্ষা উচ্চতর মানব সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজকে উন্নয়ন ও পরিচালনা করে। বাংলাদেশেও

উচ্চ শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার যোগ্য নৈতৃত্ব তৈরির লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। ড. কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন এ সম্পর্কে বলেন:

> "আধুনকি সমাজের অগ্রগতি উচ্চ শিক্ষার প্রকৃতি ও মানের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কারণ উচ্চ শিক্ষার ভূমিকা হচ্ছে, (ক) বিভিন্ন উচ্চতর কাজের জন্য সুনিপুণ, জ্ঞানদক্ষ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি তৈরি করা, (খ) এমন শিক্ষিত গোষ্ঠী সৃষ্টি করা, যাদের কর্মানুরাগ, জ্ঞানস্পৃহা, চিন্তার স্বাধীনতা, ন্যায়বোধ ও মানবিক মূল্যবোধ সম্যক বিকশিত হয়েছে, (গ) গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের নবদিগন্ত উন্মোচন করা এবং (ঘ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ ও সমাধানের পন্থা নির্দেশ করা।"[৩২]

পরবর্তীতে গঠন করা জাতীয় শিক্ষা কমিশন সমূহও উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ কালে আরো ব্যাপক পরিধির উল্লেখ করেছেন। বিশেষত জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৮৮) এর সুপারিশে প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪) ব্যাখ্যামূলক উপস্থাপন করেছে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি প্রতিবেদন (২০০০) উচ্চ শিক্ষার তিনটি বিশেত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন, যা নিম্নরূপ:

১. নিরলস জ্ঞানচর্চা ও নিত্যনতুন বহুমুখী গবেষণার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের দিগন্তের ক্রমসম্প্রসারণ।
২. জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের যোগ্য নাগরিক সৃষ্টি।
৩. দেশের অদক্ষ ও স্থবির জনসংখ্যাকে এই যুগের রাষ্ট্র ও সমাজের উপযোগী কর্মচঞ্চল জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা।[৩৩]

২.৫.১ উচ্চ শিক্ষা কাঠামো:

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষায় সাধারণ শিক্ষা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, পশুসম্পদ বিজ্ঞান প্রভৃতি ধারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ শিক্ষার ধারায় স্নাতক (সম্মান ও পাস), স্নাতকোত্তর, এম.ফিল, পি.এইচ.ডি প্রভৃতি কার্যক্রম রয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পি.এইচ.ডিসহ উচ্চতর শিক্ষাক্রম রয়েছে। এসকল শিক্ষাক্রম মূলত দুই ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয়, যথা: বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়-এ দু'ভাবে বিভক্ত। অন্যদিকে কলেজের মধ্যেও সরকারি কলেজ ও বেসরকারি কলেজ রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪২টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১০৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের একাডেমিক ও আর্থিক অনুমোদন পরিচালনায় মূখ্য ভূমিকা পালন করে। আবার বর্তমানে ১৮৯টি সরকারি কলেজ ও ৯৩২টি বেসরকারি কলেজ রয়েছে, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত হয়।

২.৫.২ উচ্চ শিক্ষা বিকাশের ধারাঃ

নাথান কমিশনের (১৯১২ খ্রি.) সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯২১ খ্রি. তৎকালীন পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানামলে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৩ খ্রি.), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬১ খ্রি.), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬২ খ্রি.), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৬ খ্রি.) ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭০ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতাত্তোরকালে এদেশে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য উচ্চ শিক্ষা দ্রুত জনগণের নিকট পৌঁছানোর নিমিত্তে অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯২ খ্রি. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হওয়ার পর দেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উচ্চ শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নিম্নোক্ত সারণিতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

সারণি-৮[৩৪]: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইনস্টিটিউট, অনুষদ ও বিভাগ:

ক্র.নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ইনস্টিটিউট	অনুষদ	বিভাগ
১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৯	১০	৫১
২.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৫	৮	৪৬
৩.	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১	৬	৪৩
৪.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	৩	৫	১৬
৫.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	৩	৮	৩৩
৬.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৩	৪	২৪
৭.	ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়	১	৫	২০
৮.	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	-	৭	২০
৯.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	-	৫	১৬

১০.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	-	-	-
১১.	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	-	-	-
১২.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	-	৪	৩৪
১৩.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১	১	১৬
১৪.	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	-	৪	২৩
১৫.	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	-	২	৪
১৬.	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	-	৭	১৭
১৭.	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	-	২	১৬
১৮.	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১	২	৪
১৯.	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	-	৩	৮
২০.	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	-	৩	১০
২১.	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	-	৩	৮
	মোট	৩২	৯৬	৪২০

সূত্র: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বার্ষিক প্রতিবেদন (২০০৫)।

এখানে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশে বিশ শতকে ২১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২টি ইনস্টিটিউট, ৯৬টি অনুষদ এবং ৪২০টি বিভাগ রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য এরূপ সুযোগ সুবিধা অপ্রতুলই বলা যায়। এজন্য পরবর্তীতে সরকার নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে এবং উচ্চ শিক্ষায় তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করছে। মূলত উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন একটি চলমান প্রক্রিয়া। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি-৯[৩৫]: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী:

ক্র.নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	শিক্ষার্থী	বিদেশী শিক্ষার্থী	ছাত্রী সংখ্যা	শিক্ষক মোট	শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত
১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৭০৭৯	৩৮	৮২১৪	১৪৯২	১:১৮
২.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৬৮২৬	০১	৬৭৭৯	৯২২	১:২৯
৩.	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৯৬৭	২৫	৮৪৭	৫১৮	১:৮
৪.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	৭৮৯১	২৫	১২২২	৫০৭	১:১৬
৫.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৮৪৪	০৫	৩৭৭৮	৬৪৩	১:২৩
৬.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৭৩৬৭	০৭	২৩৬৫	৪১১	১:১৮
৭.	ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়	৮৪৪২	-	১৫৯০	২৮৮	১:৩০
৮.	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫৮৭৬	০৫	১০৭৪	৩৩৭	১:১৭
৯.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	৩০৪১	৩৮	৬৩১	২৫৪	১:১২
১০.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	-	-	-	-	-
১১.	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	-	-	-	-	-
১২.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	৭০৪	২৫	২১৬	২৭৬	১:৩
১৩.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩০৩	-	৭৩	৫১	১:৬
১৪.	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৬৯৫	-	১৫৭	৫৮	১:১২

১৫.	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৫৭	-	৩৯	-	১:১৭
১৬.	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫৭৮	-	১০৮	৪৬	১:১২
১৭.	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৭০	০১	৩১৬	৯২	১:১৫
১৮.	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৮০২	-	১৪২	৮৮	১:২০
১৯.	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১০৬৯	০৬	১১৫	৯৮	১:১১
২০.	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৬৯	০৯	২০৮	১৩৪	১:১৪
২১.	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৬	-	৭৯	১০৮	১:১৩
	মোট	১১৫৩৪৬	১৮৫	২৭৮৭৪	৬৪৬২	১:১৮

সূত্র: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বার্ষিক প্রতিবেদন (২০০৫)।

* জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় (Teaching University) নয়। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের তথ্য পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হল।

২.৫.২.ক. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সরকারি ও বেসরকারি কলেজসহ প্রায় দেড় হাজারের অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। এসব প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

সারণি-১০[৩৬]: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ:

ক্র.নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট
১.	সাধারণ কলেজ	১২৩২
২.	আইন কলেজ	৬৭
৩.	শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (সরকারি ও বেসরকারি)	৬৮
৪.	বি.পি.এড. কলেজ	১৯
৫.	বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণ কলেজ	০২
৬.	কম্পিউটার সায়েন্স ও বিবিএ (অনার্স) কলেজ	৬৪
৭.	অর্ডন্যান্স সেন্টার স্কুল (ওসি এন্ড এস) রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুর	০১
৮.	সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ	০১
৯.	বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি	০১
১০.	বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি	০১
১১.	বাংলাদেশ এয়ারফোর্স একাডেমি	০১
১২.	মেরিন একাডেমি	০১
১৩.	মেরিন ফিসারিজ একাডেমি	০১
১৪.	আর্ট কলেজ	০৬
১৫.	গার্হস্থ অর্থনীতি কলেজ	০১
১৬.	সংগীত কলেজ	০২
১৭.	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট	০১
১৮.	গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কলেজ (ডিপ্লোমা)	১০
১৯.	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০১
২০.	প্রেস ইনস্টিটিউট	০১
২১.	গার্মেন্টস এন্ড ম্যানুফেকচারিং কলেজ	০১
	মোট	১:১৮

সূত্র: জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন, ২০০৩।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৫,৬১,৮৬৬ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩,৬৮,১৫১ জন ছাত্র এবং ১,৯৩,৭১৫ জন ছাত্রী।[৩৭]

২.৫.২.খ. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণ এবং টিউটরিয়াল পদ্ধতিতে এস.এস.সি, এইচ.এস.সি, সি ইন-এড, বি.এড, এম.এড, এমবিএ, কৃষি ডিপ্লোমা, নার্সিং ডিপ্লোমা, বেন্ট ইত্যাদি পেশাগত সার্টিফিকেট ও ডিগ্রি প্রদান করে। কতিপয় অনুষদ/স্কুল, আঞ্চলিক কার্যালয়, রিসোর্স সেন্টারসমূহের তত্ত্বাবধানে সমগ্র বাংলাদেশে এসব শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ের টিউটরিয়াল কেন্দ্রে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা করে। এটির বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচীতে ৪,৩৭,৪৮৯ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। যার মধ্যে ২,৫৪,৯৬৮ জন ছাত্র এবং ১,৮২,৫২২ জন ছাত্রী রয়েছে।[৩৮]

২.৫.৩ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার একটি বধিষ্ণু ধারা হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। আগস্ট, ১৯৯২ খ্রি. প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারির মধ্যদিয়ে বেসরকারিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। ১৯৯২ খ্রি. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ১০৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তত্ত্বাবধানে উচ্চ শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নিচের সারণিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি-১১[৩৯]: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালসমূহে ইনস্টিটিউট, অনুষদ, বিভাগ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী:

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়	ইনস্টিটিউট	অনুষদ	বিভাগ	শিক্ষার্থী (বিদেশী শিক্ষার্থী বন্ধনীর মধ্যে)	শিক্ষক		নিয়মিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত
						নিয়মিত	খন্ড কালীন	
১.	নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি	২	৩	৮	৪৫১৫ (৪২)	৯৯	১০৯	১:৪৬
২.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম	৩	৫	১০	২২১৯ (৩৮৭)	২৯১	৭২	১:৮
৩.	ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ	২	৪	১৬	২৭০৩ (৭)	১৫১	৩০	১:১৮
৪.	দারুল এহসান ইউনিভার্সিটি	৩	৩	৫	১৮৭১ (১)	১৩৫	৬৬	১:১৪
৫.	ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি	৯	৫	৯	৪৪৯	১৫৮	১১৩	১:৩
৬.	আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	২	৫	৯	১২৮৭	১৬৪	১০৪	১:৮
৭.	আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১	৪	৭	২০৭৬	২৪৫	১১৭	১:৮
৮.	আমেরিকান ইন্টার. ইউ. বাংলাদেশ	-	৩	১১	৩০৮০ (২)	১২৭	১২	১:২৪
৯.	এশিয়ান ইউ. অব বাংলাদেশ	১	৫	১১	৬০০৪(২)	৩১৪	২১০	১:১৯
১০.	ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি	১	৩	৭	৪৩৯১	১৬২	৪৩	১:২৭
১১.	দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক	-	৪	৬	১৩১২	১৪৮	৭৯	১:৯
১২.	গণ বিশ্ববিদ্যালয়	১	৩	১০	৬২৯(১৩)	৯৭	৯	১:৬
১৩.	দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	-	৩	১৩	৯২১	১০৭	৬৭	১:৯
১৪.	ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	৩	৪	৯	১৩৪৬(১)	১১৯	৮৬	১:১১
১৫.	ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি	২	২	৬	১২২২	৭০	৩৫	১:১৭
১৬.	মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	-	৩	৬	৬৩০	৩৬	২২	১:১৮
১৭.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি	-	৪	৬	৪১৩(১)	৩৬	২২	১:১১
১৮.	লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট	-	৩	৩	৩৫০	১৯	৭	১:১৮
১৯.	বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ	-	২	২	১৪৮	১২	৭	১:১২
২০.	সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	-	৩	৯	২৭৮	২৪	১০	১:১২
২১.	ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ	-	৪	২১	১৮৫০	১৭৪	৪৮	১:১১
২২.	প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম	-	৩	৪	১৩৫৫	৮৯	৪৩	১:১৫
২৩.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	৩	৮	২৮৫৭	১৬৬	১১৬	১:১৭
২৪.	স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	-	১০	৮	৩৭৩৩(৪)	১৫৪	২৬	১:২৪
২৫.	ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	১	২	৮	৭৬৭	৭০	২২	১:১১

২৬.	স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	-	৩	১১	৩৯৭(৩)	১১১	৫৯	১:৪
২৭.	ইবাইস ইউনিভার্সিটি	-	৩	৬	১৫৬০	২৪	৫১	১:৬৫
২৮.	সিটি ইউনিভার্সিটি	-	২	২	৩১৬	২২	৪	১:১৪
২৯.	প্রাইম ইউনিভার্সিটি	-	৪	৭	৭২৭	৪৭	-	১:১৫
৩০.	নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	-	৬	৬	১৮২৫	১২০	৬০	১:১৫
৩১.	সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	২	২	৫	২৫১	১১	১৭	১:২৩
৩২.	গ্রীণ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	-	২	২	৩৯৫	১৯	২১	১:২১
৩৩.	ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি	১	৩	৫	৫৪০	৪৪	৪	১:১২
৩৪.	শান্ত মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি	২	৩	৫	১৬৯১ (১)	৩৯	১৫	১:৪৩
৩৫.	দি মিলিনিয়াম ইউনিভার্সিটি	-	৫	১১	২০	৯	৪	১:১২
৩৬.	ইস্টার্ণ ইউনিভার্সিটি	-	৪	৮	১১২১	৩৬	৩৭	১:৩১
৩৭.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি	-	৪	৪	১৫৭	২৭	১২	১:৬
৩৮.	মেট্রোপলিটান ইউনিভার্সিটি সিলেট	১	২	২	২০৯	২০	৮	১:১০
৩৯.	উত্তরা ইউনিভার্সিটি	-	৫	৯	৯০১(২)	৬৪	৫	১:১৪
৪০.	ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	-	২	৩	৪০৮	২২	১৪	১:১৯
৪১.	ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	-	৩	৬	১৯৪	১৭	১৭	১:১১
৪২.	ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া	-	৯	৯	১০৪(২)	২৯	৩	১:৪
৪৩.	প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি	-	৪	৬	১০২	৪২	২৯	১:১২
৪৪.	ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্স	-	৩	৬	৮১(২)	২৬	৬	১:৩
৪৫.	প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি	-	৪	৫	২৯৪	৩২	২০	১:৯
৪৬.	রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা	-	৩	৪	১২৪	১৮	৫	১:৭
৪৭.	ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ	-	৪	৪	৫৭	১২	-	১:৫
৪৮.	অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি	-	৪	৯	২০৩	১৮	৯	১:১১
৪৯.	বাংলাদেশ ইসলামি ইউনিভার্সিটি	-	-	-	-	-	-	-
৫০.	আশা ইউনিভার্সিটি	-	-	-	-	-	-	-
৫১.	ইস্ট ডেলটা ইউনিভার্সিটি	-	-	-	-	-	-	-
	মোট	৩৭	১৮৬	৩৭০	৪৯৫৭৯ (৪৭০)	৪১৫৮	১৮৮৯	১.১২

সূত্র: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৫।

২.৫.৪ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কম হলেও বাৎসরিক ধারণ ক্ষমতা বেশি এবং শিক্ষার্থীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।

সারণি-১২[৪০]: সরকারি ও বেসরকারি (টিচিং) বিশ্ববিদ্যালয়ে বাৎসরিক ধারণ ক্ষমতা (২০০৪ সাল):

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণ	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা	শতকরা হার
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	০৯	১৭২৬৩	৫৯.৫৫
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	৫১	১১৭২৭	৪০.৪৫
মোট	৬০	২৮৯৯০	১০০

সূত্র: এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশান সার্ভে (পোস্ট প্রাইমারি) ২০০৩, ব্যানবেইস, ২০০৪।

প্রতিবছর বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষাধিক শিক্ষার্থী কৃতকার্য হয়। সুতরাং শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ খুবই নগন্য। তাছাড়া কারিগরি ও মাদ্রাসা হতেও কিছু শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করে। এভাবে সামগ্রিক বিবেচনায় ১৫% এর অধিক শিক্ষার্থী টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়না। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষার আকাংখা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ পূর্ণ করে।

সারণি-১৩[৪১]: সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী তুলনা:

	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়	মোট
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	২১	৫২	৭৩
শিক্ষার্থী সংখ্যা	১০৪৭৩৬	৪৪২২৪	১৪৮৯৬০
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি গড় শিক্ষার্থী সংখ্যা	৫৫১২	৮৫০	২০৯৮
ছাত্রী সংখ্যা	২৫৮১২	১০৬৫৫	৩৬৪৬৭
ছাত্রীর শতকরা হার	২৫	২৪	২৪.৫
শিক্ষক সংখ্যা	৬১০১	৪৫৪৩	১০৬৪৪
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি গড় শিক্ষক সংখ্যা	৯২৭	৬৩১	১৫৫৮
মহিলা শিক্ষকের শতকরা হার	১৫.১৯	১৪	১৫

সূত্র: এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশান সার্ভে (পোস্ট প্রাইমারি) ২০০৩, ব্যানবেইস, ২০০৪।

২.৫.৫ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন:

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশে একক সংবিধিবদ্ধ (Statutory) একটি প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও সংশ্লিষ্ট উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের জন্য ১৯৭৩ খ্রি. President's order No. 10 of 1973 দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরীকে কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান এবং প্রফেসর এম ইন্নাস আলী ও প্রফেসর মুহাম্মদ এনামুল হক প্রথম পূর্ণকালীন সদস্য ছিলেন।[৪২] স্বাধীনতাত্তোর কালে Robin Committee on Higher Education in England এবং Kothari commission on Education in India-এর আদলে এবং অনুসৃত নীতির আলোকে তৎকালীন সরকার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের স্বায়ত্তশাসন ও উচ্চ শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন লক্ষ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেছে। উক্ত আদেশের ৪(১) নম্বর অনুচ্ছেদ ও ১৯৯৮ সালের সংশোধনী অনুযায়ী চেয়ারম্যান ০১ জন, পূর্ণকালীন সদস্য ৫ জন, খন্ডকালীন সদস্য ০৯ জন নিয়ে গঠিত। ১৯৮৩ খ্রি. গেজেটের মাধ্যমে মঞ্জুরি কমিশনকে আরো শক্তিশালী করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অনুষদ, বিভাগ চালু, শিক্ষক নিয়োগ, অর্থ ও হিসাব প্রভৃতি কার্যাবলীর জন্য কমিশনের অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৯৮ খ্রি. President's order No. 10 of 1973 সংশোধন করে The University Grant Comission

of Bangladesh (Amendment) Act, 1998 জারি করে এটিকে সমন্বিত করা হয়েছে।৪৩ বর্তমানে মঞ্জুরি কমিশন প্রশাসন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, অর্থ ও হিসাব, গবেষণা ও প্রকাশনা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ট্রেনিং ও ইনস্ট্রুমেন্টেশন প্রভৃতি বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

২.৬ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাঃ

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কারিগরি শিক্ষা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। ব্রিটিশামলে কারিগরি শিক্ষার প্রসার হয়নি। ১৯৫০ খ্রি. ঢাকায় গড়ে উঠা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে সংগঠন, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য ১৯৬০ খ্রি. এই অধিদপ্তরটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৪] শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একজন মহাপরিচালক এটির নির্বাহী প্রধান এছাড়া পরিচালক (প্রশাসন), পরিচালক (পরিকল্পনা), পরিচালক (ভোকেশনাল), পরিচালক (প্রকল্প), পরিচালক (পরিদর্শন) প্রভৃতির সমন্বয়ে অধিদপ্তরটি পরিচালিত হয়। বর্তমানে ৩৫টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ইত্যাদি শিক্ষার উন্নয়ন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও তত্ত্বাবধান এই অধিদপ্তরের প্রধান কার্যক্রম। আধুনিক উন্নত ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে এই শিক্ষা খুবই কার্যকর।

২.৭ মাদ্রাসা শিক্ষাঃ

ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহে মোল্লা নিযামুদ্দীন সিহালবী (১৬৭৯-১৭৪৮ খ্রি.) প্রবর্তিত পাচ্যসূচী বা দরসে নিযামী দ্বারা অনুসৃত হয়। এই পাঠ্যসূচীতে নাহু সরফ (বাক্য ও শব্দ প্রকরণ), তাফসির (কোরআনের ব্যাখ্যা), হাদিস, ফিকাহ, উসুলে ফিকাহ্ (ইসলামি ব্যবহার শাস্ত্রের নীতিমালা), মানতেক (তর্কশাস্ত্র), হিকমত (প্রাকৃতিক দর্শন), বালগাত (অলংকার শাস্ত্র) প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৮২৬ খ্রি. মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা চালু হয়। ১৮৮4 খ্রি. সরকারি মাদ্রাসায় বাংলা ও গণিত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়।[৪৫] এ সময় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা, আরবি, উর্দু, ফার্সি ও ইংরেজি এ পাঁচটি ভাষা শিখতে হয়। ১৯০৮ খ্রি. মাদ্রাসা শিক্ষায় পাশ্চাত্য ভাষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সংযুক্তি ঘটিয়ে আবু নসর ওয়াহিদের উদ্যোগে 'নিউ স্কিম মাদ্রাসা' চালু হয়।[৪৬] পরবর্তীতে এই পাঠ্যসূচি সংস্কার করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সমপর্যায় করা হয়। কলিকাতা মাদ্রাসানুযায়ী অন্যান্য মাদ্রাসা 'ওল্ড স্কিম মাদ্রাসা' হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৯৫৯ খ্রি. আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশনের সুপারিশানুযায়ী 'নিউ স্কিম মাদ্রাসাসমূহ' হাই স্কুলে রূপান্তরিত হয়। নিউ স্কিম মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার জন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালুর সুপারিশ করা হয়।[৪৭] স্বাধীন বাংলাদেশে ড. খুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন মাদ্রাসা

শিক্ষার সামঞ্জস্য ও সংস্কারের সুপারিশ করেন। ১৯৭৮ সালে বর্তমান সরকারি অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসার (আলিয়া মাদ্রাসা) পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়।[৪৮] অন্যদিকে ১৯০১ খ্রি. চট্টগ্রামে 'মইনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা' স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। কালক্রমে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা (ক) আলিয়া মাদ্রাসা ও (খ) কওমী মাদ্রাসা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে। যা নিম্নে পর্যালোচনা করা হল।

২.৭.১ আলিয়া মাদ্রাসাঃ

বাংলাদেশের আলিয়া মাদ্রাসাসমূহই সরকারি অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্থ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সরকার দ্বারা স্বীকৃত ইবতেদায়ি দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল প্রভৃতি স্তরের মাদ্রাসা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ১৯৭৮ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্তশাসিত মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা সমূহের মঞ্জুরি প্রদান, নবায়ন, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ,পরিদর্শন ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। অবশ্য বর্তমানে কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ায় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কাজের পরিধি কমেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৯২৯৪টি মাদ্রাসা রয়েছে যার মধে ০৩টি সরকারি মাদ্রাসা। নিচের সারণিতে মাদ্রাসা শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি-১৪[৪৯]: মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও শিক্ষার্থী:

স্তর	মাদ্রাসার ধরণ	শিক্ষা কার্যকাল (বছর)	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	ছাত্রীর সংখ্যা	শতকরা হার
১.	ইবতেদায়ি মাদ্রাসা (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমান)	০৫	১৮,২৬৮	১৩,৬৩,৫৭২	-	-
২.	দাখিল মাদ্রাসা (মাধ্যমিকের সমান)	০৫	৯,২০৬	১১,১৯,৫৮৮	৬,৩৫,২০৩	৫৬.৭৪
৩.	আলিম মাদ্রাসা (উচ্চ মাধ্যমিক সমান)	০২	১,১৮০	৩,১০,০৫৯	১,৪৫,৮৩১	৪৮.০৩
৪.	ফাযিল মাদ্রাসা (স্নাতক এর সমান)	০২	১,১৮০	৩,২৮,৬৫৬	১,১৬,৬৩৮	৩৫.৪৮
৫.	কামিল মাদ্রাসা (মাস্টার্স এর সমান)	০২	১৮০	৮৭,৬৩৮	১৪,২৬২	১৬.২৭

সূত্র: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ এবং জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ২০০৩।

উপরোক্ত সারণির তথ্যানুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। উচ্চতর স্তরে ছাত্রীর সংখ্যা পর্যায়ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। স্বাধীনতার পর মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মাদ্রাসা শিক্ষা সরকারের অর্থানুকূল্যে একটি ক্রমবর্ধমান ধারা যা নিম্নের সারণিতে দেখানো হল।

সারণি-১৫[৫০]: মাদ্রাসা বৃদ্ধির ধারা

প্রতিষ্ঠানের ধরণ		প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			শতকরা বৃদ্ধি হার	
		১৯৮৩	১৯৯৩	১৯৯৯	১৯৮৩-১৯৯৩	১৯৯৩-১৯৯৯
মাদ্রাসা	দাখিল মাদ্রসা	১৬৪৫	৩৮২৫	৪৮৬৫	১৩২	২৭
	আলিম মাদ্রসা	৫০৮	৮০৭	১০৯০	৫৯	৩৫
	ফাজিল মাদ্রসা	৫৯১	৮৩১	১০০০	৪১	২০
	কামিল মাদ্রসা	৬১(২)	১০০(৩)	১৪১(৩)	৬৪	৪১
	মোট (মাদ্রসা)	২৮০৫(০২)	৫৫৬৩(৩)	৭০৯৬(৩)	৯৮	৪৮

সূত্রঃ বেনবেইস (BANBEIS): ১৯৯৯

১৯৮০ এর দশকে মাদ্রাসার সংখ্যা দ্রুতগতিতে বড়েছে। ১৯৯০ এর দশকেও বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে। মাদ্রাসা বৃদ্ধিতে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের সাধারণ ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষাও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান উন্নত না হওয়ায় কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতায় এ সকল ছাত্র-ছাত্রী পিছিয়ে পড়ছে।

২.৭.২ কওমী মাদ্রাসাঃ

বাংলাদেশে দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শ, উদ্দেশ্য, নিসাব ও শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসরণ স্থাপিত প্রথম কওমী মাদ্রসা মইনুল উলুম হাটহাজারী মাদ্রসা (প্রতিষ্ঠা ১৯৯০ খ্রি.)। পরবর্তীতে ১৯৬৪ খ্রি. পর্যন্ত ৪৪৩টি কওমী মাদ্রসা স্থাপিত হয়। তৎমধ্যে প্রায় ৫১টি দাওরা হাদীস মাদ্রাসা। বর্তমানে ছোট বড় কওমী মাদ্রসার সংখ্যা চার হাজারের অধিক এবং মক্তবের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০। মক্তব-মাদ্রসার ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১০,০০০০০ এবং শিক্ষক সংখ্যা ৫০,০০০।[৫১] কওমী মাদ্রসা প্রধানত 'মুহতামিম' (পরিচালক) ও 'মুদাররেছে কেরাম' (সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী) এর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত 'বেফাকুল মাদ্রসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ' এর নির্দেশনা ও পাঠ্যসূচি অনেক মাদ্রাসা অনুসরণ করে। এসব মাদ্রাসায় দশ বছরের শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়। কওমী মাদ্রাসায় এখনও অভিন্ন শিক্ষা মেয়াদ অনুসৃত হয় না। আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম মাদ্রসায় ৫ বৎসরের প্রাথমিক স্তর, তিন বৎসরের মাধ্যমিক স্তর, তিন বৎসরের উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, চার বৎসরের চূড়ান্ত বা স্নাতক স্তর অর্থাৎ মোট ১৫ বৎসর মেয়াদের শিক্ষা প্রদান দাবি করা

হয়। উক্ত মাদ্‌রাসায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকলেও এর জন্য কোন মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়নি।[৫২] তবে অধিকাংশ কওমী মাদ্রাসায় ৭-১০ বৎসর মেয়াদকালীন শিক্ষা দেওয়া হয়।

২.৮ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাঃ

শিক্ষার দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। ভারতীয় উপমহাদেশে ১৮৮২ খ্রি. উইলিয়াম হান্টারের প্রতিবেদনে নৈশ বিদ্যালয়ের ধারণা উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯১৭-১৮ খ্রি. স্থানীয়ভাবে নৈশ বিদ্যালয় চালু করে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ সময়ে অবিভক্ত বঙ্গে ৯২৬ টি নৈশ বিদ্যালয় ও ১৪০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ছিল।[৫৩] প্রাদেশিক সরকার ১৯৩৯ খ্রি. পল্লী পুনর্গঠন দপ্তরের (Bengal Rural Reconstruction Department) এর অধীনে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৯৫৩-৫৫ খ্রি. প্রবর্তিত ভি-এইড (V-AID): Village Agricultural and Industrial Development) কার্যক্রমের আওতায় পাকিস্তানামলে প্রথম নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৬০ এর দশকে কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমি যা বর্তমানে BARD (Bangladesh Academy for Rural Development)-এ বয়স্ক শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়। স্বাধীনতাত্তোর কালে 'ব্র্যাক' (BRAC: Bangladesh Rural Advancement Committee) বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৯৮০ খ্রি. সরকার দেশব্যাপী গণশিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেন। কর্মসূচিটি কিছুকাল স্থগিত থাকার পর ১৯৮৭ খ্রি. পুনরায় চালু করা হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-১৯৯৫ খ্রি.) তিন বছর মেয়াদী 'সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম' (ইনফেপ) চালু করা হয়। ১৯৯৫ খ্রি. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে এই শিক্ষাকে একটি সাব-সেক্টর (Sub-Sector) স্বীকৃতি দিয়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেন।[৫৪] কিন্তু পরবর্তীতে সরকার এটি বিলুপ্ত করে Bureau Non-formal Education চালু করেছে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এন.জি.ও) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২.৯ বিশেষ শিক্ষাঃ

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরসহ সকল বয়সের নানা প্রতিবন্ধীর জন্য বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচী (Special Education Programme) রয়েছে। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি সংস্থার (NGO) পরিচালনায় এসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয় অন্যতম। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা, বয়স্ক, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন, শ্রবণ/বাক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিদ্যালয়, প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রবণ/বাক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন, কর্ম পুনর্বাসন কেন্দ্র, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, Assistance for the Blind Children, Bangladesh National Fedaration for the Deaf, Hi-care, Society for Assistance to Hearing Impaired, বাক প্রতিবন্ধী শিশু কল্যাণ সংঘ-বাংলাদেশ, Society for the care and Education of Mentaly Retarded Children Bangladesh (SCEMRCB), বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন, শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৫৫] এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী শিশু কিশোর ও বয়স্কদেরকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান প্রভৃতি প্রদান করে স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

তথ্যসূত্র ও টিকাঃ

১. অরুণ ঘোষ ও সুশীল রায়, *শিক্ষা বিজ্ঞান*, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ.১।

২. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, *সুশিক্ষক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ.৩।

৩. প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২৬ জুলাই, ১৯৭২ শিক্ষাবিদ ড. কুদরত-ই খুদার নেতৃত্বে গঠিত হয়।

৪. আজহার আলী ও অন্যান্য, *শিক্ষার ভিত্তি*, ঢাকা, ২০০৪, পৃ.২১০।

৫. আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১০৮।

৬. *তদেব*, পৃ. ১১০।

৭. *বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪)*, ঢাকা, পৃ. ২৩।

৮. আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃ.১১৬।

৯. *জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন*, ২০০৩, ঢাকা (প্রকাশিত মার্চ, ২০০৪), পৃ. ২৮।

১০. Ellen Sattar, *Universal Primary Education in Bangladesh*, UPL, Dhaka, 1982, P.28. *Primary Education Statistics in Bangladesh: 2001*, DPE, 2002.

১১. *Primary Education Statistics in Bangladesh, 2001*, DPE, 2002.

১২. ড. কামরুন্নেছা বেগম ও সালমা আকতার, *প্রাথমিক শিক্ষা: বাংলাদেশ*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৬৪।

১৩. *তদেব*, পৃ. ১১১।

১৪. শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রস্তাবিত আই.ডি.এ প্রাথমিক শিক্ষা রিপোর্ট, ঢাকা, ১৯৭৮।

১৫. এ ব্যাপারে সরকারের প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং বিধান স্মারক নং ১০/১০ এম-৫/৮২ পাট-২/৪৪৭-শিক্ষা তারিখ ২৪/০৬/৮৪ইং-এ রয়েছে।

১৬. *বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট*, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ২৯।

১৭. *তদেব।*

১৮. *শিক্ষাবার্তা*, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৮।

১৯. *ব্যানবেইস*, নভেম্বর, ২০০৩ (প্রকাশিত মার্চ, ২০০৪)।

২০. *জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন*, ২০০৩, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৬৮।

২১. *জাতীয় শিক্ষা জরিপ (পোস্ট প্রাইমারি) রিপোর্ট*, ব্যানবেইস, ২০০০।

২২. আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৮।

২৩. *জাতীয় শিক্ষা জরিপ (পোস্ট প্রাইমারি রিপোর্ট)*, ব্যানবেইস, ২০০০।

২৪. *তদেব*।

২৫. মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, *মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা:* ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬১।

২৬. *তদেব*, পৃ. ৬৯।

২৭. *তদেব*, পৃ. ৬৬।

২৮. আবু নাছের টিপু, *শিক্ষা সংস্কারের দুইশ বছর*, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২৩।

২৯. *তদেব*, পৃ. ২৫।

৩০. *তদেব*, পৃ. ২৭।

৩১. *তদেব*, পৃ. ৪০-৪১।

৩২. *বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪)*, ঢাকা, পৃ. ৮৩।

৩৩. *শিক্ষাবার্তা*, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১২।

৩৪.*বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন*, ঢাকা, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৫।

৩৫.*তদেব*।

৩৬.*জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন*, ২০০৩।

৩৭.*বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন*, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৫।

৩৮.*তদেব*।

৩৯.*তদেব।*

৪০.*এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশান সার্ভে (পোস্ট প্রাইমারি)*-২০০৩, ব্যানবেইস, ২০০৪।

৪১.*তদেব*।

৪২.আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৫৩-২৫৪।

৪৩.*তদেব*।

৪৪.*তদেব*, পৃ. ২৫৭।

৪৫.ড. হাসান মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা*, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ২১-২২।

৪৬.*তদেব*।

৪৭.মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৬৪।

৪৮.ড. হাসান মোহাম্মদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩।

৪৯.*জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৪* এবং *জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট*-২০০৩।

৫০.*ব্যানবেইস (BANBEIS)*-১৯৯৯।

৫১.ড. হাসান মোহাম্মদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৯।

৫২.*তদেব*, পৃ. ৪৮।

৫৩.আবু হামিদ লতিফ, *বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা*, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৯।

৫৪.*তদেব*, পৃ. ১৪।

৫৫.আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬০-২৬৩।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে নারী শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের একাংশ মহিলাদের শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক করে গড়ে তোলেন। বিশ শতকে শিক্ষিত মহিলাদের প্রচেষ্টা, সমাজ সংস্কারক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নারী শিক্ষার ধারাটি বিকশিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে নারীর প্রান্তিকতা ও পশ্চাৎপদতার প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নের প্রয়াস উৎসাহব্যঞ্জক। নারী সমাজের উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করার জন্য সরকার জাতীয় সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেছে। এসব নীতি ও আইন প্রণীত হলেও প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নের অভাবে নারী সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও বঞ্চনার শিকার। বাংলাদেশের সংবিধানে ২৮(২) ধারা মতে, রাষ্ট্র ও নাগরিক জীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। বাংলাদেশের সংবিধানে সকলের জন্য শিক্ষার কথা বলা হলেও নারী শিক্ষার চিত্রে বৈষম্যই পরিলক্ষিত হয়।

৩.১ প্রাথমিক শিক্ষা:

বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানব শিশুর শিক্ষার প্রারম্ভিক যাত্রা শুরু হয়। ব্রিটিশ আমল ও পাকিস্তান আমলে স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই সংখ্যাটি পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন শিক্ষা বান্ধব সরকারি নীতির কারণে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের সব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে বালিকা শিক্ষার্থীর হার এখনও কাংখিত পর্যায়ে আসেনি। নিম্নের সারণিতে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় বালিকাদের অংশগ্রহণ ও বৃত্তির ধারা দেখানো হল।

সারণি-১[১]: বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেয়ে শিক্ষার্থী:

সাল	শিক্ষার্থী সংখ্যা		% হার
	মোট	বালিকা	বালিকা
১৯৫০	২৪৪৯৪৩৬	৪৮৫০২২	১৯.৮০
১৯৬০	৩৪৩৩৩০৭	৯৫৪৪৭৯	২৭.৮০
১৯৭০	৫০৭৩২৬৪	১৬২০২১১	৩১.৯৪
১৯৭৫	৮৫৮৮৯৫২	৩০৬৬৬১৬	৩২.২১
১৯৮০	৮২১৯৩১৩	৩০৩৭২৮০	৩৬.৯৫
১৯৯১	১২৬৩৫৪১৯	৫৭২৫৩২৭	৪৫.৩০
১৯৯৪	১৫১৮০৬৮০	৭১৩২৫৬৩	৪৭.০০
১৯৯৮	১৮৩৬০৬৪২	৮৭৮৩৭০০	৪৭.৮০
২০০০	১৭৬৬৭৯৮৫	৮৬৩৫২৮৭	৪৮.৯০
২০০১	১৭৬৫৯২২০	৮৬৬৯৪২৫	৪৯.০০

সূত্রঃ Primary Education Statistics in Bangladesh: 2001, DPE, 2002.

উপরোক্ত সারণির আলোকে বলা যায়, পাকিস্তানামলে মেয়ে শিক্ষার্থীর চিত্র হতাশাজনক। ১৯৫০ খ্রি. হতে ১৯৭০ খ্রি. পর্যন্ত মেয়ে শিশুদের প্রাথমিক স্কুলে গমনের হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে ৩১.৯৪%। যেখানে বালকদের স্কুল গমন হার ৬৮.০৬। কিন্তু ১৯৭১ খ্রি. এর পরবর্তীকালে অবস্থার ধীরে ধীরে উত্তরণ ঘটছে এবং একবিংশ

শতাব্দীর শুরুতে বালিকাদের স্কুলে গমনের হার কাংখিত ভারসাম্য অবস্থার কাছাকাছি এসেছে। তারপরও সংখ্যা বিচারে সমাজের একটি অংশ প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত। যা নিম্নের সারণিতে প্রমাণিত হয়।

সারণি-২[২]: প্রাথমিক শিক্ষায় গমনোপযোগী বয়সের শিশুদের অংশগ্রহণ হার:

সাল	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী (৬-১০ বছর বয়সী) শিশুর সংখ্যা (লক্ষে)	মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা (লক্ষে)	গমনোপযোগী শিশুর তুলনায় শিক্ষার্থীর হার (%)	মেয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা (লক্ষে)	ছেলে, শিক্ষার্থী সংখ্যা (লক্ষে)	মেয়ে শিক্ষার্থী হার (%)
১৯৫০	-	২৪	-	৫	১৯	২০.৮৩
১৯৫৫	-	২৮	-	৭	২১	২৫.০০
১৯৬০	৭৫	৩৪	৪৫.৩৩	১০	২৪	২৯.৪১
১৯৬৫	৮৬	৪৩	৫০.০	১৩	৩০	৩০.২৩
১৯৭১	১০১	৫০	৪৯.৫	১৬	৩৪	৩২.০
১৯৭৬	১১৪	৮৩	৭২.৮	৩১	৫২	৩৭.৫৮
১৯৮০	১২১	৮২	৬৮.৭	৩০	৫২	৩৬.৫৮
১৯৮৪	১৩৮	৮৫	৬১.৬	৩৫	৫০	৪১.১৮
১৯৮৫	১৫০	৮৯	৫৯.৩৩	৩৬	৫৩	৪০.৪৫
১৯৮৭	১৫৪	১১১	৭২.০৮	৪৯	৬২	৪৪.১৪
১৯৯৬	১৮৫	১৭৬	৯৫.০	৮৪	৯১	৪৭.৭২
১৯৯৯	১৮৩	১৭৬	৯৬.৩	৮৬	৯০	৪৮.৮৬
২০০১	১৮১	১৭৭	৯৭.৫	৮৭	৯০	৪৯.১৫

সূত্র: Primary Education Statistics in Bangladesh: 2001, DPE, 2002.

সারণিতে ১৯৯০ এর দশকে প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষত বিদ্যালয়গামী মেয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা উন্নতি হতে দেখা যায়। বিশ শতকের শেষ প্রান্তে প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের ধারাটি ব্যাপকতা লাভ করেছে। তারপরও শিক্ষা বঞ্চিত মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ।

৩.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা:

এই শিক্ষার স্তরটি বাংলাদেশের পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। মাধ্যমিক স্তরের পাঁচ বৎসর ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের দুই বৎসরের শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ উচ্চ শিক্ষার দ্বারকে উন্মুক্ত করে দেয়। কিন্তু এই স্তরে ঝড়ে পড়া বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ প্রশ্নবোধক হয়ে পড়ে। এদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা অব্যাহত রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে। ছাত্রীদের পক্ষে আরো বেশি কঠিন হয়ে যায়।

সারণি-৩[৩]: মাধ্যমিক স্তরে (ষষ্ঠ-দশম শ্রেণী) বালক ও বালিকা শিক্ষার্থী অনুপাত:

সাল	মোট	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		শতকরা হার	
		বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
১৯৮০	২১৪২৩৩৫	১৫৩৫৪২২	৬০৬৯১৩	৭১.৬৭	২৮.৩৩
১৯৮৩	২৪০১০৫০	১৬৩৯৩৩৩	৭৬১৭১৭	৬৮.২৮	৩১.৭২
১৯৮৫	২৫৮৩৩১১	১৭৪২৫০৫	৮৪০৮০৬	৬৭.৪৫	৩২.৫৫
১৯৯০	২৯৯৩৭৩৩	১৯৭৭৯৮৮	১০১৫৭৪৫	৬৬.০৭	৩৩.৯৩
১৯৯৪	৪৫২৪৬৯৬	২৪৪৫৬৪৩	২০৭৯০৫৩	৫৪.৫	৪৫.৯৫
১৯৯৯	৭৩৭৯৭১৬	৩৪৪০৭৯১	৩৯৩৮৯২৫	৪৬.৬২	৫৩.৩৮
২০০৩	৮১২৬৩৬২	৩৮০৩৭৯৪	৪৩২২৫৬৮	৪৬.৮১	৫৩.১৯

সূত্র: Secondary Education in Bangladesh: A Sub-sector study, Report MoE 1992 and BANBEIS 2003.

সারণি-৩ লক্ষ্য করলে আমরা দেখি মাধ্যমিক শিক্ষায় ১৯৯০ দশকের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যালয়গামী ছাত্রীর সংখ্যায় ভারসাম্য ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বালিকাদের অংশগ্রহণ পর্যায়ক্রমে বাড়তে থাকে। যার অনুপাতিক হার বর্তমানে বালকদের তুলনায় বেশি। অপরদিকে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর অতিক্রম করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আশানুরূপ নয়। এখানে ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে বালিকার সংখ্যাই বেশি।

সারণি-৪[৪]: মাধ্যমিক স্তরে সমাপন ও ঝড়ে পড়ার হার:

হার	বছর	বালক	বালিকা	মোট
ঝড়ে পড়া	১৯৯১	৫৭.৬	৬৫.৯	৬০.৫
	১৯৯৩	৪৩.০	৬৩.৭	৫২.০
	১৯৯৪	৪২.২	৫৩.৯	৪৭.৫
	১৯৯৯	৪৬.৭	৫৭.৯	৫২.১
সমাপন	১৯৯১	৪২.৪	৩৪.১	৩৯.৫
	১৯৯৩	৫৭.০	৩৬.৩	৪৮.০
	১৯৯৪	৫৭.৮	৪৬.১	৫২.৫
	১৯৯৯	৫৩.৩	৪২.১	৪৭.৯

সূত্রঃ BANBEIS Report 1995 and 1999.

উক্ত সারণি অনুসারে শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়ার প্রবণতা বেশি। ১৯৯০ এর দশকের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করেছে অর্ধেকের কম (৪৭.৯%) শিক্ষার্থী। মেয়ে শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়ার হার (৫৭.৯%) সবচেয়ে বেশি। ১৯৭৩-৭৪ শিক্ষাবর্ষে কলেজে নারী শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৭.৮%।[৫] উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ খ্রি. ২৭৬৯৫২ জন হয়েছে এবং ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি (১৯৯৩ খ্রি.-১৯৯৯ খ্রি.) ১৮০%।[৬] সুতরাং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.৩ উচ্চ শিক্ষা:

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর ও অংশগ্রহণ এখনও কাংখিত পর্যায়ে আসেনি। ১৯৭৩-৭৪ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত নারী ও পুরুষের অনুপাত ৮৫:১৫।[৭] কিন্তু বিশ শতকের শেষ প্রান্তেও এই আনুপাতিক হার খুব বেশি আশাব্যঞ্জক নয়।

সারণি-৫[৮]: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও ছাত্রী সংখ্যা:

ক্র.নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	শিক্ষার্থী	ছাত্রী সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যার শতকরা হার
১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৭০৭৯	৮২১৪	৩০.৩৩
২.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৬৮২৬	৬৭৭৯	২৫.২৭
৩.	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৯৬৭	৮৪৭	২১.৩৫
৪.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	৭৮৯১	১২২২	১৫.৪৮
৫.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৮৪৪	৩৭৭৮	২৫.৪৫
৬.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৭৩৬৭	২৩৬৫	৩২.১০

৭.	ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়	৮৪৪২	১৫৯০	১৮.৮৩
৮.	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫৮৭৬	১০৭৪	১৮.২৭
৯.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	৩০৪১	৬৩১	২০.৭৪
১০.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	-	-	-
১১.	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	-	-	-
১২.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	৭০৪	২১৬	৩০.৬৮
১৩.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩০৩	৭৩	২৪.০৯
১৪.	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৬৯৫	১৫৭	২২.৫৮
১৫.	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৫৭	৩৯	২৪.৮৪
১৬.	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫৭৮	১০৮	১৮.৬৮
১৭.	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৭০	৩১৬	২৩.০৬
১৮.	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৮০২	১৪২	৭.৮৮
১৯.	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১০৬৯	১১৫	১০.৭৫
২০.	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৬৯	২০৮	১০.৫৬
২১.	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৬৬	৭৯	৫.৭৮
	মোট	১১৫৩৪৬	২৭৮৭৪	২৪.১৭

সূত্র: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বার্ষিক প্রতিবেদন (২০০৫)।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় (Teaching University) নয়।

সারণি-৫ এ আমরা বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষায় নারী অংশগ্রহণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাই। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীর তুলনায় উচ্চ শিক্ষায় আনুপাতিক হার খুবই কম।

সারণি-৬[৯]: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত:

			শতকরা হার	
মোট	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী
৪৪২২৪	৩৩৫৬৯	১০৬৫৫	৭৫.৯১	২৪.০৯

সূত্রঃ Education Institution Survey (Post-Primary), 2003, BANBEIS, 2004.

উপরোক্ত তথ্য উপাত্ত সমূহ পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও ছাত্রী সংখ্যার গড় হার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ। উচ্চ শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ বাল্য বিবাহ। এটি মেধার অপচয় ও জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ হতে বঞ্চিত করছে।

৩.৪ মাদ্রাসা শিক্ষা:

বাংলাদেশ সরকারের পাঁচটি স্তরে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বীকৃতি রয়েছে। এসব মাদ্রাসায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। কিন্তু ছাত্রী সংখ্যার অনুপাত অনেক কম।

সারণি-৭[১০]: মাদ্রাসা শিক্ষার স্তর বিন্যাস ও শিক্ষার্থী:

স্তর	মাদ্রাসার ধরণ	শিক্ষা কার্যকাল	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	শতকরা হার
১.	ইবতেদায়ি মাদ্রাসা	৫ বছর	১৮,২৬৮	১৩,৬৩,৫৭২	-	-
২.	দাখিল মাদ্রাসা	৫ বছর	৯,২০৬	১১,১৯,৫৮৮	৬,৩৫,২০৩	৫৬.৭৪
৩.	আলিম মাদ্রাসা	২ বছর	১,১৮০	৩,১০,০৫৯	১,৪৫,৮৩১	৪৭.০৩
৪.	ফাযিল মাদ্রাসা	২ বছর	১,১৮০	৩,২৮,৬৫৬	১,১৬,৬৩৮	৩৫.৪৮
৫.	কামিল মাদ্রাসা	২ বছর	১৮০	৮৭,৬৩৮	১৪,২৬২	১৬.২৭

সূত্র: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ এবং জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩ প্রতিবেদন।

সারণিতে আলোচিত শিক্ষাস্তরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত। তবে ছাত্রী সংখ্যার অনুপাত উচ্চতর স্তরে পর্যায়ক্রমে কমে আসছে।

সারণি-৮[১১]: মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত:

সাল	শিক্ষার্থী সংখ্যা			শতকরা হার	
	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী
১৯৮৩	৫২৯৯১৭	৪,৯০,০৫৭	৩৯,৮৬০	৯২.৪৮	৭.৫২
১৯৯২	১৫৪০৮৮১	১০,৭৬,৭১০	৪,৬৪,১৭১	৬৯.৮৮	৩০.১২
১৯৯৪	১৭৪১৩৬২	১২,১৭,২৪৬	৫,২৪,১১৬	৬৯.৯০	৩০.১০
১৯৯৯	২৯৩৫৩৪৮	১৭,৭১,৮৩৫	১১,৬৩,৫১৩	৬০.৩৬	৩৯.৬৪
২০০৩	১৮৪৫৯৪১	৯,৩৪,০০৭	৯,১১,৯৩৪	৫০.৬০	৪৯.৪০

সূত্র: BANBEIS: 1999 and RAHMAN: 2006.

সারণি-৮ এর তথ্যাবলীতে দেখা যাচ্ছে ১৯৮০ দশকে মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীর আনুপাতিক হার খুবই ভারসাম্যহীন। ১৯৯০ দশকে অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। একবিংশ শতকের শুরুতে এটি ভারসাম্যপূর্ণ হয়েছে। সাধারণ শিক্ষা ধারার সাথে এই উত্তরণের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

৩.৫ শিক্ষক প্রশিক্ষণ:

বিভিন্ন পেশায় কর্মরত শিক্ষিত মহিলাগণ বিশেষত শিক্ষায় নিয়োজিত মহিলাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই ধরণের প্রায় ৮৯০টি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেশা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

সারণি-৯[১২]: শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক সংখ্যা:

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ব্যবস্থাপনা								
	সরকারি			বেসরকারি			সর্বমোট		
	মোট	মহিলা	শতকরা হার (%)	মোট	মহিলা	শতকরা হার (%)	মোট	মহিলা	শতকরা হার (%)
পিটিআই	৫২০	১৭৪	৩৩.৫	-	-	-	৫২০	১৭৪	৩৩.৫
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	২১১	৭৪	৩৫.১	৬৮৫	৯৯	১৪.৫	৮৯৬	১৭৩	১৯.৩
টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	৩২	-	-	-	-	-	৩২	-	-
ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	১৫	১	৬.৭	-	-	-	১৫	১	৬.৭
ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজ	৪৬	৭	১৫.২	১৬৮	২২	১৩.১	২১৪	২৯	১৩.৬
এইচএসটিটিআই	৬৬	১৯	২৮.৮	-	-	-	৬৬	১৯	২৮.৮
মোট	৮৯০	২৭৫	৩০.৯০	৮৫৩	১২১	১৪.১৯	১৫৪৩	৩৯৬	২২.৭২

সূত্র: BANBEIS: 2004, P.48.

৩.৬ নারী শিক্ষা প্রসারে সরকারের উদ্যোগ:

বাংলাদেশের জনসংখ্যার নারী ও পুরুষের অনুপাত ১০০:১০৬। এই বৃহত্তর জনশক্তিকে উপেক্ষা করে জাতীয় উন্নয়ন অসম্ভব। এজন্য সরকার নারী শিক্ষার অগ্রগতি ও জনসম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য আধুনিক শিক্ষিত নারী সমাজ গঠনে কতিপয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব পদক্ষেপ এদেশে নারীর শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশকে উন্নত করেছে। এইরূপ কয়েকটি কর্মসূচী নিম্নে আলোকপাত করা হল।

৩.৬.১ শিক্ষা উপবৃত্তিঃ

মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ হলো শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প। এটি মূলত বেসরকারিভাবে ১৯৮২ খ্রি. শিক্ষা বঞ্চিতদের শিক্ষায় আকৃষ্ট করা ও শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষার নিমিত্তে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। বর্তমানে দেশের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদেরকে প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সর্বমোট ১,৮৭৯,৭৬,৩৫,৩০০ টাকা উপবৃত্তি হিসেবে প্রদান করা হয়।[১৩]

৩.৬.২ বালিকা বর্ষঃ

আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা বর্ষ হিসেবে জাতিসংঘ ১৯৯০ সালকে ঘোষণা করে। এই বর্ষটিতে বাংলাদেশে বালিকাদের স্বাক্ষর বা অগ্রগামী করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং গ্রামাঞ্চলে বালিকাদের শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করা হয়। এই দশকটি সরকার বালিকা বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে।[১৪] সরকারের এই দূরদর্শী কর্মসূচী নারী শিক্ষার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে এবং বিশ শতকের শুরুতে পুরুষকে ছাড়িয়ে যায়। শিক্ষা প্রশাসন, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ব্যবসা সমাজ সেবাসহ সর্বত্র নারীর অংশগ্রহণ এদেশের উন্নয়নকে সমৃদ্ধ করেছে।

৩.৬.৩ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনঃ

সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নারীদের নিয়ে কোপেন হেগেন ১৯১০ খ্রি. ২৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণা করা হয়। ১৯১১ খ্রি. হতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিবস পালিত হচ্ছে। ১৯৭২ খ্রি. মহিলা পরিষদ বাংলাদেশে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে। জাতিসংঘ ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দকে নারী বর্ষ ঘোষণা করে এবং ১৯৭৫-৮৫ খ্রি. পর্যন্ত সময়কে বিশ্ব নারী দশক ঘোষণা করে।[১৫] এই সময় হতে বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করছে। এইসব কর্মসূচী নারীকে আত্মমর্যাদাশীলও স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে এবং শোষণ, বৈষম্য, বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেয়। বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রতি অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও এদেশের নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম, চাকুরী, মানবাধিকার, নিরাপত্তা, সমতা ও উন্নয়নের ব্যাপক পশ্চাৎপদতা রয়েছে।

৩.৬.৪ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিঃ

৮ মার্চ, ১৯৯৭ খ্রি. বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' ঘোষণা করেন। বিশ্বের ১৮৯টি দেশের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত বেইজিং সম্মেলনে (১৯৯৫ খ্রি.) Flat Form for Action-এ ১২টি বিষয়কে নারী প্রগতি ও উন্নয়ন সমতার বাধা হিসেবে বিবেচনা করে উত্তরণের কৌশল নির্ধারণ করা হয়। বিবেচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে-(ক) নারী ও দারিদ্র্য (খ) নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (গ) নারী ও স্বাস্থ্য (ঘ) নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা (ঙ) নারী ও সশস্ত্র সংঘাত (চ) নারী ও অর্থনীতি (ছ) ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী (জ) নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (ঝ) নারীর মানবাধিকার (ঞ) নারী ও তথ্যমাধ্যম (ট) নারী ও পরিবেশ (ঠ) মেয়ে শিশু।[১৬] বেইজিং কর্মপরিকল্পনার এই ১২টি ইস্যু সহ ১৪টি মূল ইস্যু ও ৬টি সাব ইস্যু জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার বাস্তবায়ন, মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের বিলোপ সাধন এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা, নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূরীকরণ, সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়, নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, গৃহায়ন ও আশ্রয়, নারী ও পরিবেশ, নারী ও গণমাধ্যম, বিশেষ দুর্দশাগ্রস্থ নারী-এই ১৪টি মূল ইস্যু ও ৬টি সাব ইস্যুর (নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারীর কর্মসংস্থান,সহায়ক সেবা, নারী ও প্রযুক্তি, নারীর খাদ্য নিরাপত্তা)[১৭] মাধ্যমে সরকার সার্বিকভাবে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারীদের ভাগ্য উন্নয়নের এই কার্যকরী ভূমিকা নারীর সমষ্টিক উন্নয়ন ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে সহায়তা করেছে।

৩.৬.৫ নারী উন্নয়ন পরিষদঃ

বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫ খ্রি.) নারী উন্নয়ন পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদের সভা প্রধান প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সেক্টরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারী সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এটির উদ্দেশ্য। এজন্য ১৯৯৫ খ্রি. গঠিত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদ' ১৯৯৭ খ্রি. থেকে কাজ শুরু করেছে।[১৮]

৩.৭ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও নারী শিক্ষাঃ

নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮ খ্রি.) হতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। এই সময়ে নারী শিক্ষায় মেয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে গমন, বিয়ের বয়স বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনার কৌশল শিক্ষা, উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিবেচনা করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী ও শিশুদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। মহিলাদের শিক্ষা ও চাকুরীর বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষার চাকুরীতে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত মহিলাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। সরকার প্রতিটি জেলায় একটি মহিলা কলেজ জাতীয়করণ করেছে। ঢাকায় একটি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং মেয়েদের জন্য একটি ক্যাডেট কলেজ করা হয়েছে। পল্লী এলাকায় উপানুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ৪০০টি সমাজ বিদ্যালয়ের মধ্যে ২০০টি মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। চাকুরীর ক্ষেত্রেও ১০% এবং ১৫% যথাক্রমে গেজেটেড ও ননগেজেটেড পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। এসব সরকারি পদক্ষেপ নারী শিক্ষার ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি করেছে। পরবর্তীকালে সরকারি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এসব সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রাখে এবং নতুন নতুন নীতি সহায়তা প্রদান করেছে। সমাজ সচেতনতা, সরকারি প্রচেষ্টা ও চাকুরীর সুবিধায় নারী শিক্ষার অগ্রগতি অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

তথ্যসূত্র ও টিকাঃ

১. *Primary Education Statistics in Bangladesh, 2001, DPE, 2002.*

২. *তদেব।*

৩. *Secondary Education in Bangladesh, A Sub-sector study, Report MoE 1992 and BANBEIS 2003.*

৪. *BANBEIS Report 1995 and 1999.*

৫. *Statistical Year Book 1986,* P. 793.

৬. আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ১২৯।

৭. *Statistical Year Book 1975.*

৮. *বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন (২০০৫)।*

৯. *Educational Institutional Survey (Post-Primary), 2003*, *BANBEIS, 2004*.

১০. *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ এবং জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩ প্রতিবেদন।*

১১. *BANBEIS 1999* and *RAHMAN 2006*,

১২. *BANBEIS, 2004*, P.48.

১৩. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ১১ জুলাই, ২০১৮।

১৪. এ.এন রাশেদা (সম্পাদিত), *পঁচিশ বছরের শিক্ষা ব্যবস্থার দর্পণ*; সম্পাদকীয় *শিক্ষাবার্তা*, প্রথম খন্ড, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩৫।

১৫. *তদেব*, পৃ. ১৪৫।

১৬. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৬৭।

১৭. *তদেব*, পৃ. ২৭০।

১৮. *তদেব*, পৃ. ২৭১।

চতুর্থ অধ্যায়

চট্টগ্রাম জেলার শিক্ষার ইতিহাস

প্রাক-আধুনিক কালে বিদ্যা চর্চায় সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের চট্টগ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত ধর্ম ভিত্তিক ত্রি-ধারায় বিভক্ত। মুসলমানদের জন্য মক্তব-মাদ্রাসা, হিন্দুদের জন্য পাঠশালা বা টোল-চতুষ্পাঠী এবং বৌদ্ধদের জন্য কেয়াং বা বিহার হচ্ছে পঠন-পাঠন কেন্দ্র। অপরদিকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমান মিলন ধর্মী চতুর্থ একটি ধারা মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল। রাজকীয় ভাষা ফারসি বৈষয়িক প্রয়োজনে অনেক হিন্দু শিখতেন। অনেক মুসলমান জ্ঞান অন্বেষণ, রাষ্ট্র পরিচালনা ও জনসংযোগের প্রয়োজনে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করতেন।[১] চতুর্থ ধারার শিক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব বেশি প্রচলিত হয়নি। প্রাচীন প্রথানুযায়ী অংক, হিসাব নিকাশ, জমি মাপ, পত্র লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়। বিদ্যা শিক্ষা অনেকটা আশ্রমিক অর্থাৎ ছাত্ররা শিক্ষকের বাড়ীতেই অবস্থান করত।[২] তিব্বত ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ শরৎচন্দ্র দাসের মতে, অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান আন্দরকিল্লা জেনারেল হাসপাতাল পাহাড়ে অবস্থিত 'পন্ডিত বিহার' চট্টগ্রামের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অনেকের মতে, সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে অথবা পটিয়ার দোয়াঙ পাহাড়ে অবস্থিত পণ্ডিত বিহারটি।[৩] পণ্ডিত বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন তিলপাদ ওরফে প্রজ্ঞা ভদ্র।[৪] গবেষকদের মতে, আশ্রমিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যই মূলত কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবকাঠামো তখনও গড়ে উঠেনি। সতের ও আঠারো শতকে চট্টগ্রামে শিক্ষার সার্বিক চিত্র এমনই ছিল। চট্টগ্রামের মৌলানা আবুল হাসান[৫] (১৮০১-১৮৬৪ খ্রি.) নিজ বাড়ীতেই আরবী শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে তুলেন।[৬]

৪.১ চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষার প্রারম্ভকাল:

১৭৬০ খ্রি. চট্টগ্রাম ইংরেজদের অধিকারে আসে। কিন্তু উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, মক্তব, মাদ্রাসা ও কেয়াং বিহারই শিক্ষার সার্বজনীন মাধ্যম। এসব শিক্ষায়তনে প্রাথমিকভাবে সাধারণ মানের শিক্ষা দেওয়া হতো এবং এ সমস্ত বিদ্যালয়ে কোন মুদ্রিত বই ব্যবহার করা হতো না।[৭] শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় ভাবকে প্রচ্ছন্ন রাখা। বস্তুত খ্রিষ্টান মিশনারিদের হাতেই আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয়।

কলিকাতায় ১৭১৯ খ্রি. The Society for Promoting Christian Knowledge নামক মিশনারির আগমণ ঘটে এবং ১৭৩১ খ্রি. একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে। এই প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের আহার ও পরিধেয় বস্ত্র বিনামূল্যে প্রদান করত। পাশ্চাত্য ধাঁচের এটিই হলো বাংলার প্রথম স্কুল।[৮] যা আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে উল্লেখ করেছি। পরবর্তীতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মিশনারিগণ স্কুল স্থাপন করতে শুরু করে। মিশনারিরা ১৮১৮ খ্রি. এর মধ্যে এলাহাবাদ থেকে আকিয়াব পর্যন্ত ১৮০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলে। এগুলোর মধ্যে শুধু শ্রীরামপুর মিশনারির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণেই ছিল ১১১টি স্কুল।[৯] শ্রীরামপুর মিশনারিদের স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে *John Clark Marshman* বলেন:

> "The plan for the extension of education among the natives which was introduce to public notice in the Hints, had succeeded beyond the most sanguine expectation. Contribution poured in with a degree of liberality which marked the confidence the missionaries enjoyed in Indian Society. Within a twelve months, schools were established in a circle of about twenty miles round serampore, at the earnest request of the inhabitants. The report recorded the opening of forty-five, in which two thousand children received the elements of knowledge in their own language."[১০]

মিশনারিদের এসব বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে চট্টগ্রামেও একাধিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান করা হয়। যা পরবর্তীতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষার গোড়া পত্তন এই সকল মিশনারি স্কুলসমূহের মাধ্যমেই ঘটে।

৪.২ ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিক্ষার স্কুলসমূহঃ

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৮১৩ খ্রি. চার্টার এর মাধ্যমে ভারতে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ, ১৮২৩ খ্রি. জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গঠন, ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের অ্যাক্ট, ১৮৩৫ খ্রি. টি.বি মেকলের বিখ্যাত মিনিট, উইলয়াম এডামের রিপোর্ট (১৮৩৫-১৮৩৮ খ্রি.), ১৮৪২ খ্রি. কাউন্সিল অব এডুকেশন গঠন প্রভৃতি পদক্ষেপ ভারতবর্ষ তথা বাংলায় আধুনিক শিক্ষার বিকাশ দ্রুততর হয়। এ সকল কার্যাবলী পূর্ব বাংলা তথা চট্টগ্রামেও আধুনিক শিক্ষার প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৪.২.ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাঃ

চট্টগ্রামে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ইংরেজদের আগমনের পর পর শুরু হয়। কিন্তু বর্তমান কালের ন্যায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ইংরেজদের উপমহাদেশ ত্যাগের প্রাক্কালেও ছিল না। কিছু বড় বড় শহরে উচ্চ শিক্ষিত ও সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের উদ্যোগে প্রাক-প্রাথমিক বা নার্সারি স্কুল গড়ে উঠে। যদিও এসব স্কুলের সংখ্যা ছিল খুবই অপ্রতুল। স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত এসব স্কুলের কোন মঞ্জুরি ছিল না এবং সরকারি শিক্ষা বিভাগের অনুমোদনও আবশ্যক নয়। চট্টগ্রাম শহরে পাথরঘাটার বর্ষীয়ান ব্লেইস রিবেইরোর বলেন, পাথরঘাটা গির্জার খ্রিষ্টান সন্ন্যাসিনী রিভারেন্ট সিস্টার ভিনসেন্ট ১৯২৭ খ্রি. পাথরঘাটা গির্জার ব্যবস্থাধীন কনভেন্টে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা চালু করেন।[১১] চট্টগ্রামে সম্ভবত এটিই প্রথম প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়। পরবর্তী পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কালীন সময় পর্যন্ত অন্য কোন কে.জি বা নার্সারি স্কুল প্রতিষ্ঠার তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সেন্ট প্লাসিডস ও সেন্ট স্কলাসটিকস ইংরেজি শিক্ষার বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

৪.২.খ. প্রাথমিক শিক্ষাঃ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ১৮১৩ খ্রি. নতুন ধরণের প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করে। এ সকল বিদ্যালয়সমূহে আর্থিক অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে। এই নীতি অনুসারেই ১৮১৮ খ্রি. চট্টগ্রামে প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু চট্টগ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশীয় পদ্ধতিতেই অর্থাৎ

পাঠশালা-টোল, মাদ্রাসা-মক্তব ও সংঘারাম ভিত্তিক শিক্ষার প্রাধান্য ছিল। উইলিয়াম হান্টারের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দেও চট্টগ্রাম জেলায় ১৭০টি বাংলা পাঠশালা, ১১০টি ফারসি অথবা আরবি মক্তব এবং ২০টি টোল ছিল। এই রিপোর্টে, চট্টগ্রাম জেলায় (১৮৭৩ খ্রি. ৩১ মার্চ পর্যন্ত) ইংরেজ প্রর্বতিত শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৫ এবং ছাত্র সংখ্যা ১৫১২ উল্লেখ রয়েছে।[১২]

হান্টার কমিশন[১৩] (১৮৮১ খ্রি.) এর সুপারিশের আলোকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব, নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন অর্পণ এবং শিক্ষা কর ধার্য করা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও সংগঠনে জনগণ উৎসাহিত হয়। ১৯০৮ খ্রি. চট্টগ্রাম জেলায় নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ১০৩৫ এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৭১০৬।[১৪] অবশ্য শিক্ষার সরঞ্জাম, বিদ্যালয় ভবন এবং পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে এসব বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। ১৯০৬ খ্রি. সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য ২৭৬০০ টাকা মঞ্জুরি প্রদানের নীতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু সরকারের ইমারত নির্মাণের শর্ত পালন করা স্থানীয়দের আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে ছিল না। অনুদান গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি তাই অপরদিকে প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯১৯ খ্রি.) এবং বঙ্গদেশ পল্লী প্রাথমিক আইন (১৯৩০ খ্রি.) চালু করা হলেও কর আদায় খুব বেশি হতো না। এজন্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত ছিল মাত্র ১২০০টি এবং শিক্ষার্থী ২১৯৯৭৯ জন।[১৫]

চট্টগ্রাম শহরে প্রাথমিক শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন নূর আহমদ চৌধুরী।[১৬] তিনি চট্টগ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান (১৯২১-১৯৫৪ খ্রি.) থাকাকালীন সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে কতিপয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা বালকদের জন্য অবৈতনিক (১৯২৫ খ্রি.) ও বাধ্যতামূলক (১৯২৮ খ্রি.) এবং বালিকাদের জন্য অবৈতনিক (১৯৩২ খ্রি.) ও বাধ্যতামূলক (১৯৪২ খ্রি.) চালু করেন। তিনি প্রত্যেক মহল্লায় পৌর সভার অধীনে একটি বালক ও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পৌরসভা থেকে পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। ১৯২৭ খ্রি. ভারতীয় উপমহাদেশে তিনিই সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম পৌরসভায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন।[১৭] এটিই চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

৪.২.গ. মাধ্যমিক বিদ্যালয়/ উচ্চ বিদ্যালয়ঃ

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাষ্ট্র ভাষা ইংরেজি ঘোষণার (১৮৩৫ খ্রি.) প্রেক্ষিতে সরকার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিভাগসমূহে পাঁচটি সরকারি ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮৩৬ খ্রি. জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশান চট্টগ্রামে 'চট্টগ্রাম জিলা স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি পরবর্তীতে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে।[১৮] পটিয়ার সুচক্রদন্ডীর অন্নদাচরণ খাস্তগীর এই স্কুলটির পাশ করা প্রথম ছাত্রের অন্যতম। যিনি ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীর নামে পরিচিতি লাভ করেন।[১৯] চট্টগ্রাম জিলা স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চট্টগ্রামে সরকারিভাবে ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়। ১৮৪১ খ্রি. চট্টগ্রামের খ্রিষ্টান মিশনারিরা 'সেন্ট প্লাসিড স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৪ খ্রি. লর্ড হার্ডিঞ্জ সরকারি চাকুরীর জন্য ইংরেজি বাধ্যতামূলক করায় গ্রাম পর্যায়ে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন আরম্ভ হয়। পটিয়ায় দুর্গাচরণ দত্ত ১৮৪৫ খ্রি. একটি মধ্য ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেই প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সরকার মীর এহিয়া স্টেটের আর্থিক সাহায্য এই স্কুলের জন্য নির্ধারিত করেন। পরবর্তীতে এটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং প্রথম প্রধান শিক্ষক রসিক চন্দ্র ব্যানার্জী (১৮৬৪-১৯০৬ খ্রি.)।[২০] বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা বেনী মোহন দাস, মহিম চন্দ্র দাস, জ্যোতি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কালী শংকর চক্রবর্তী, কবি বিপিন বিহার নন্দী, সাহিত্য বিশারদ আব্দুল করিম, ড. আতাউল হাকিম সহ দক্ষিণ চট্টগ্রামের অধিকাংশ কৃতি সন্তান এই বিদ্যালয়ের ছাত্র।[২১] ১৮৫৪ খ্রি. 'উড ডেচপ্যাচ' ঘোষণার পর চট্টগ্রামে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৬ খ্রি. চট্টগ্রাম শহরে কুইনস স্কুল ও এলবার্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুল দুটির স্থায়িত্বকাল খুব বেশি ছিল না।[২২] ১৮৫৭ খ্রি. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। মির এহিয়া ফান্ডের অর্থায়নে মাদ্রাসা পাহাড়ে ১৮৭৬ খ্রি. স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু জনগণ স্কুলের পরিবর্তে মাদ্রাসা স্থাপনের দাবী এবং স্কুলের বিরোধীতা করায় এটি বন্ধ হয়ে যায়। চট্টগ্রাম শহরে ১৮৮০ খ্রি. 'মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসবিদ আব্দুল হক চৌধুরীর মতে এলবার্ট হাইস্কুলের নাম পরিবর্তিত হয়ে মিউনিসিপলে হাই স্কুল নামে খ্যাত হয়।[২৩]

১৮৮৫ খ্রি. শেখ এ চাঁটগাম কাজিম আলী[২৪] 'চিটাগং ইংলিশ স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। একই বৎসর 'হাজারী স্কুল' নামেও আরেকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দুটি স্কুলই 'মধ্য ইংরেজি স্কুল' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অবশ্য ১৮৮৮ খ্রি. 'চিটাগং ইংলিশ স্কুল' উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।[২৫] এরপর ১৯০০ খ্রি. পর্যন্ত শহরে অন্য কোন উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়নি। অবশ্য কিছু সংখ্যক মধ্য ইংরেজি স্কুল (ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজিম আলীর (১৮৫২-১৯২৬ খ্রি.) মৃত্যুর পর চিটাগং ইংলিশ স্কুল ১৯২৮ খ্রি. কাজিম আলী হাই স্কুল হয়।[২৬] গ্রামাঞ্চলে সরকারি চাকুরির সুযোগ গ্রহণের আকাঙ্খায় স্থানীয়ভাবে বেসরকারি উদ্যোগে মধ্য ইংরেজি স্কুল এবং ভার্নাকুলার স্কুল স্থাপনের কাজ শুরু হয়। তাছাড়া উড ডেচপ্যাচে (১৮৫৪ খ্রি.) শিক্ষা বিস্তারে স্থানীয়দের উৎসাহ উদ্দীপনাকে জাগ্রত করার সুপারিশও এটির অন্যতম কারণ। ১৮৭১ খ্রি. পর্যন্ত চট্টগ্রামে এফ. এ কলেজসহ সরকারি ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৮। যার মধ্যে ৩০ টি সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত। এই ৩৮টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৪৭৩।[২৭]

বাংলার গর্ভনর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল (১৮৭১-১৮৭৪ খ্রি.) বেসরকারি বিদ্যালয়কে মঞ্জুরি বা গ্রান্ট-ইন-এইড দেয়ার নীতি চালু করেন। বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত এদেশীয় (ভার্নাকুলার) স্কুলসমূহ এ নীতিতে সরকারি শিক্ষা দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৮৯১ খ্রি. সর্ব প্রকার বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০০৭ এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ১২৩১১। অপরদিকে বেসরকারি বিদ্যালয় ৫৭৫টি এবং শিক্ষার্থী ৯৩০৩ জন। এই বিদ্যালয়সমূহ ছিল দেশীয় অর্থাৎ টোল, মাদ্রাসা, মক্তব, পাঠশালা।[২৮] বিশ শতকের শুরুতে অর্থাৎ ১৯০১ খ্রি. চট্টগ্রামে মোট বিদ্যালয় ১১০৮টি এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩১৮২ জন হয়। আলোচ্য সময়ে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭৪৭টি এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৪০২৩।[২৯] এখানে লক্ষণীয় যে, ১৭৮৪ খ্রি. যেখানে দেশীয় ও বেসরকারি বিদ্যালয় ১৪৮০টি এবং ছাত্র সংখ্যা ২৯৯৫৩ জন সেখানে ১৯০১ খ্রি. বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কমে যায়।[৩০] এটির মূল কারণ হচ্ছে হান্টার কমিশন রিপোর্ট (১৮৯১ খ্রি.)। এই রিপোর্ট চূড়ান্ত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার নতুন বিদ্যালয়ে সাহায্য না করার নীতি গ্রহণ করে।

লর্ড কার্জনের (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রি.) আমলে ১৯০৪ খ্রি. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ সরকারে গ্রহণ করে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদনের জন্য প্রতিষ্ঠিতব্য বিদ্যালয়ের আর্থিক নিরাপত্তার স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করে দেখার শর্ত আরোপ করা হয়। এমতাবস্থায় বিশ শতকে স্কুল গড়ার প্রয়াস সীমিত হয় এবং জনগণ নিজস্ব উদ্যোগ নিতে উৎসাহ দেখায় নি। ১৯০৮ খ্রি. কক্সবাজারসহ চট্টগ্রাম জেলায় উচ্চ বিদ্যালয়

৮টি এবং ছাত্র সংখ্যা ২১৫৪ জন হলেও ১৯৪৭ খ্রি. উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাড়ায় ৯৭টি। এসব উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৫টি সরকারি সাহায্য বিহীন অনুমোদিত।[৩১]

চট্টগ্রামে স্বদেশী আন্দোলন[৩২] এর যুগেও কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এসব স্কুল সমূহের মধ্যে এনায়েত বাজারে ন্যাশনাল স্কুল, দেওয়ান বাজারে উমাতারা হাই স্কুল, ঘাট ফরহাদবেগে ওরিয়েন্টাল একাডেমি, সদরঘাটে গ্র্যাজুয়েট হাই স্কুল ও ফিরিঙ্গি বাজারের জে.এম. সেন হাই স্কুল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিশ শতকের ত্রিশ দশকের মধ্যেই একটি উচ্চ বিদ্যালয় ব্যতিত অপর সকল বিদ্যালয় বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুধুমাত্র জে.এম. সেন হাই স্কুলটি এখনও বর্তমান।[৩৩] স্বদেশী যুগে গ্রামাঞ্চলেও উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ জনগণ গ্রহণ করেছে। বেসরকারি এই সকল উচ্চ বিদ্যালয় সরকারি অনুদানের অভাব এবং বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আওতায় নানাবিধ শর্তারোপ করায় খুব বেশি সফল হয়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮ খ্রি.) পরবর্তী বিশ্ব মহামন্দার প্রভাবে এদেশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গতি মন্থর হয়। স্বাভাবিকভাবে চট্টগ্রামেও ১৯২০ খ্রি. পর বিদ্যালয় স্থাপন খুবই কম হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রি.) চট্টগ্রাম আক্রান্ত হলে মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল ও জে.এম.সেন হাই স্কুলকে পটিয়ার ভাটিখাইন ও কেলিশহরে সাময়িকভাবে স্থানান্তর করা হয়। যুদ্ধোত্তরকালে স্কুল দুটি চট্টগ্রাম শহরে পুনরায় চলে আসলেও এসব স্থানে আরো দুটি নতুন স্কুল স্থাপিত হয়।[৩৪] ব্রিটিশামলে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের স্কুল সমূহের মধ্যে গর্ভনমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল (১৯০৯ খ্রি.), চট্টগ্রাম সরকারি হাই স্কুল (১৯১৬ খ্রি.), প্রর্বত্তক সংঘ (১৯২১ খ্রি.), ফতেয়াবাদ হাই স্কুল (১৮৯৪ খ্রি.), হাটহাজারী পার্বতী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৪ খ্রি.), গহিরা হাই স্কুল (১৯৩০ খ্রি.), মির্জাপুর হাই স্কুল (১৯৪২ খ্রি.), কাটির হাট হাই স্কুল (১৯০৫ খ্রি.), রোসাংগিরি উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৭ খ্রি.), নানুপুর আবু সোবহান বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৬৫ খ্রি.), রাউজান আর.আর. এ.সি আদর্শ বিদ্যালয় (১৮৬২ খ্রি.), আমিলাইশ কাঞ্চনা বঙ্গচন্দ্র ঘোষ ইনস্টিটিউট (১৯২৯ খ্রি.), সাতকানিয়া হাই স্কুল (১৯০২ খ্রি.), পটিয়া আবদুস সোবহান রাহাত আলী স্কুল (১৮৪৫ খ্রি.), পরেকোড়া নয়নতারা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৮৭ খ্রি.), আনোয়ারা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৯০ খ্রি.), গাছবাড়িয়া হাই স্কুল (১৯১৮ খ্রি.), হাবিলা সন্দ্বীপ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৪ খ্রি.), কাট্টলী নূরুল হক চৌধুরী হাই স্কুল (১৯০৬ খ্রি.), কুমিরা আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৮ খ্রি.), ফৌজদার হাট কে.এম. হাই

স্কুল (১৯১৩ খ্রি.), জোরারগঞ্জ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৪ খ্রি.), সীতাকুন্ড হাই স্কুল (১৯১৩ খ্রি.), আবু তোরাব হাই স্কুল (১৯১৪ খ্রি.), বানীগ্রাম সাধনপুর উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৭ খ্রি.), ফটিকছড়ি করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০০ খ্রি.) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৩৫]

৪.৩ পাকিস্তান আমলে ও স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহঃ

ক. প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র চট্টগ্রামে কর্মসূত্রে অনেক বিদেশী বসবাস করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাও চট্টগ্রামে আসেন। এসকল পরিবারে ছেলে-মেয়েদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারি ও কে.জি. স্কুলের প্রয়োজন হয়। ১৯৫৫ খ্রি. খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে সেন্ট মেরিজ গীর্জা সংলগ্ন স্থানে নার্সারি বা কে.জি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালি উচ্চ বিত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৫৮ খ্রি. মডেল কে.জি স্কুল গড়ে উঠে। খ্রিস্টান মিশনারিরা ১৯৬০ খ্রি. ক্রাইস্ট গির্জায় (বর্তমান নুর আহমদ সড়কে) একটি কে.জি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে।[৩৬] অবাঙালীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ছিল হিল সাইড (বৌদ্ধ মন্দির সড়কে) কে.জি. স্কুল।

স্বাধীন বাংলাদেশেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার দ্রুততর হয়। স্বাধীনতার প্রথম দশকেই লিটল জুয়েলস, ফুলকি, শিশুবাগ, কৃষ্ণচূড়া, মর্নিং স্টার প্রভৃতি স্কুল গড়ে উঠে। পর্যায়ক্রমে নার্সারি বা কে.জি স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮০ এর দশকে সামার শাইন গ্রামার স্কুল, সামারফিল্ড টিউটরিয়ালসহ বেশ কিছু ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৭] বর্তমানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধীনে নয়টি নার্সারি/কে. জি স্কুল রয়েছে।

খ. প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

১৯৬০-৬১ খ্রি. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পাকিস্তান সরকার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বারোপ করে। এ সময় পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ সম্পন্ন করে 'বৃত্তি পরীক্ষা' দেওয়া এবং 'ট্যালেন্ট স্কিম' বৃত্তি প্রদানের পদক্ষেপ

গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন কর্মসূচি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রভৃতি উদ্যোগ জনগণকে প্রাথমিক শিক্ষায় আগ্রহী করে এবং ছাত্র সংখ্যাও পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬০-৬১ খ্রি. থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭১টি বৃদ্ধি পায় এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাও ২১৯৯৭৯ থেকে ২৬০৮৫০ জনে উন্নীত হয়।[৩৮] স্বাধীনতার পর প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ সরকারিকরণ করা হয়। এ সময় নব উদ্যোগে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনও শুরু হয়। এ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অনেক বিদ্যালয়কে সরকার অনুমোদন এবং মঞ্জুরি প্রদান করে। প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি, বেসরকারি ও অনুমোদিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সৃষ্টি হয়। ১৯৮৩ খ্রি. তিন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ২৭৬৪। কক্সবাজার মহকুমা ১৯৮৪ খ্রি. জেলায় উন্নীত হলে কক্সবাজারের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিসংখ্যান হতে বাদ দেওয়া হয়। ১৯৯৫ খ্রি. এর পরিসংখ্যানে দেখা যায় চট্টগ্রাম জেলায় ১৬৩৩টি সরকারি, ২৭০টি অনুমোদিত বেসরকারি এবং ১২১টি অননুমোদিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।[৩৯]

২০০০ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪,৪৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।[৪০] ১৯৭৩ খ্রি. প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ এবং ১৯৯৩ খ্রি. প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করায় আধুনিক শিক্ষার প্রতি অভিভাবকরা মনযোগী হয়।

গ. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ

ভারত বিভক্তি ও স্বাধীনতা (১৯৪৭ খ্রি.) আধুনিক শিক্ষার প্রসারকে তরান্বিত করেছে। দেশ ভাগের অব্যাবহিত পরে 'ইস্ট বেঙ্গল এডুকেশন অডিন্যান্স' পাশ হয়। ঢাকাস্থ 'ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড' মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। স্বাধীন পাকিস্তানে নব উদ্দীপনায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। ১৯৫৮ খ্রি. মধ্যে চট্টগ্রামে আরো ২৩টি বালক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা দাঁড়ায় ১২০। যার ২টি সরকারি, ৬৭টি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত এবং ৫১টি মঞ্জুরিবিহীন।[৪১] ১৯৬০-৬১ খ্রি. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা গঠিত হয়। চট্টগ্রাম বিভাগের সকল বিদ্যালয় এই বোর্ডের অধীনে আসে। ১৯৬২-৬৩ খ্রি. চট্টগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়সহ মোট উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪৭ এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৬৫১০।[৪২]

বাংলাদেশ সরকার শিক্ষায় অধিকতর গুরুত্বারোপ করায় বিদ্যালয় সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯৮৩ খ্রি. চট্টগ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ছিল ৫৬৪টি। কিন্তু ১৯৮৪ খ্রি. কক্সবাজার জেলায় উন্নীত হওয়ায় চট্টগ্রাম জেলার বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমে যায়। ১৯৯৫ খ্রি. চট্টগ্রামে উচ্চ বিদ্যালয় সংখ্যা ৫৩৯। এ সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৩টি সরকারি ও ২১টি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়।[৪৩] বর্তমানে চট্টগ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ৬৯৮। এই সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে উত্তর চট্টগ্রামে ২৯৭টি, দক্ষিণ চট্টগ্রামে ২৪২টি এবং চট্টগ্রাম মহানগরে ২৫৯টি রয়েছে।[৪৪] চট্টগ্রাম মহানগরের বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৪১টি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন দ্বারা পরিচালিত হয়।[৪৫]

৪.৪ কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা:

১৮৩৬ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম জিলা স্কুলকে ১৮৬৯ খ্রি. উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়।[৪৬] চকবাজারের প্যারেড গ্রাউন্ডের একটি পর্তুগীজ স্থাপনায় কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ বা চট্টগ্রাম কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ জে.সি. বোস।[৪৭] এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই চট্টগ্রাম কলেজীয় শিক্ষার সূচনা ঘটে। ১৯০৭-০৮ খ্রি. একজন অধ্যক্ষ ও পাঁচ জন প্রভাষক কলেজের পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন। একটি হিন্দু ছাত্রাবাস ও একটি বৌদ্ধ ছাত্রাবাস কলেজ এবং স্কুল ছাত্ররা ব্যবহার করত। ১৯০৯ খ্রি. বিজ্ঞান বিভাগ চালু হয়। জুলাই ১৯১০ খ্রি. 'ল' বিভাগ বন্ধ করা হয়। একই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কলেজটিকে প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রি কলেজের স্বীকৃতি প্রদান করে। এ সময় গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যায় অর্নাস কোর্স চালু করা হয় এবং কলেজটিকে স্কুল হতে পৃথক করা হয়।[৪৮] ১৯১২ খ্রি. কলেজের শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৩৬ এবং ১৯১৭ খ্রি. শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৭৫। ১৯১৭ খ্রি. ৩১ মার্চ কলেজের একজন অধ্যক্ষ, আট জন অধ্যাপক, পাঁচ জন প্রভাষক ও একজন শারিরীক শিক্ষার ইন্সট্রাক্টর ছিল। এ সময়ে কলেজের মোট ব্যয় ৫৩৯৪২ টাকা, যার মধ্যে সরকারি অনুদান ৩৭৯৪৯ টাকা।[৪৯] ১৯২৪ খ্রি. কলেজের প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন কামালুদ্দীন আহমদ। ১৯২৬ খ্রি. এ.কে. ফজলুল হক (১৮৭৬-১৯৬২ খ্রি.) মুসলিম ছাত্রাবাসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন, যা বর্তমানে শেরে বাংলা ছাত্রাবাস নামে পরিচিত।[৫০] চট্টগ্রাম কলেজে সহশিক্ষা ব্যবস্থাও এসময় প্রবর্তন করা হয়। এ কলেজের ছাত্রী ছিলেন বেগম শামসুন নাহার (১৯০৮-১৯৬৪ খ্রি.)।[৫১]

চট্টগ্রামে ১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত মাত্র তিনটি কলেজ যথা: চট্টগ্রাম কলেজ (১৮৬৯ খ্রি.), চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (১৮৭৪ খ্রি.), যা বর্তমানে হাজী মুহাম্মদ মহসিন ডিগ্রি কলেজ[৫২] এবং বোয়ালখালীর স্যার আশুতোষ কলেজ (১৯৩৯ খ্রি.) স্থাপিত হয়।[৫২.ক] ১৯৪৭ খ্রি. চট্টগ্রাম সরকারি কর্মাস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৩] পরবর্তীতে সাতকানিয়া কলেজ (১৯৪৯ খ্রি.), নাজিরহাট কলেজ (১৯৪৯ খ্রি.), সেন্ট্রাল গার্লস কলেজ (১৯৫৭ খ্রি.), ফৌদজারহাট ক্যাডেট কলেজ (১৯৫৮ খ্রি.), চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ (১৯৬০ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ খ্রি. মধ্যে চট্টগ্রামে কলেজের সংখ্যা হয় ১৪টি।[৫৪] বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে পরবর্তীতে কলেজের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। চট্টগ্রামে ১৯৯২ খ্রি. সরকারি ও বেসরকারিসহ মোট ৭৫টি কলেজ পাওয়া যায়।[৫৫] ২০০০ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে সরকারী ও বেসরকারী মোট ৩৬৯টি কলেজ

ছিল।[৫৬] বর্তমানে চট্টগ্রামে ২০৯টি কলেজ রয়েছে। যার মধ্যে উত্তর চট্টগ্রামে ৫৮টি, দক্ষিণ চট্টগ্রামে ৪২টি এবং চট্টগ্রাম মহানগরে ১০৯টি কলেজ রয়েছে।[৫৭] বর্তমানে চট্টগ্রাম মহানগরীর কলেজ সমূহের মধ্যে ১৪টি কলেজ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন তত্ত্বাবধান করে থাকে।[৫৮] চট্টগ্রাম জেলার সরকারি ও বেসরকারী কলেজ সমূহের মধ্যে চাঁন্দনাইশের গাছবাড়িয়া কলেজ, পটিয়া কলেজ, বোয়ালখালী কলেজ, হুলাইন সালেহ নুর কলেজ, রাঙ্গুনিয়া কলেজ, রাউজন কলেজ, ফটিকছড়ি কলেজ, নোয়াপাড়া কলেজ, হাটহাজারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ফতেয়াবাদ কলেজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সীতাকুন্ড কলেজ, কাটির হাট মহিলা কলেজ, নাজিরহাট কলেজ, নিজামপুর কলেজ, মিরশ্বরাই কলেজ, বাড়ৈয়ার হাট কলেজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব কলেজে সহশিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে।[৫৯]

৪.৫ আইন শিক্ষাঃ

চট্টগ্রামে উনিশ শতকের শেষ দিকে এফ. এ অথবা এল.এ (বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষা পাশ শিক্ষার্থীরা আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি গ্রহণের সুযোগ হয়। ব্রিটিশ সরকার বিশেষ ব্যবস্থায় চট্টগ্রাম কলেজে প্রাইভেট পরীক্ষার ব্যবস্থা করে।[৬০] কিন্তু কলেজে ক্লাস হতো না। তাদেরকে কমিটি পাশ উকিল বলা হতো। ১৯৫০ এর দশকে কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি চট্টগ্রামে একটি বেসরকারি নৈশ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে কাজেম আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে এটির অস্থায়ী ক্যাম্পাস হয়। পরবর্তীতে আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ সংলগ্ন ভিক্টোরিয়া ইসলামিয়া হোস্টেলে (ভি.আই. হোস্টেল) স্থানান্তরিত হয়।[৬১]

ভি.আই. হেস্টেলের পাশে নব নির্মিত একটি ভবনের দোতলায় ১৯৫৭ খ্রি. চট্টগ্রাম আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সময়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১৮। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ উবায়দুন নুর ছিদ্দিকী (ইউ.এন.ছিদ্দিকী)।[৬২] চট্টগ্রাম শহরে দ্বিতীয় নৈশ আইন কলেজ 'বঙ্গবন্ধু ল টেম্পল' ১৯৭২ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটির ক্যাম্পাস চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থিত। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এডভোকেট কবির আহমদ মিয়া।[৬৩] বর্তমানে এই কলেজের উপাধ্যক্ষ এডভোকেট মোহাম্মদ সুরত জামাল। ১৯৯২ খ্রি. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদ চালু হয়। আইন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অধ্যাপক ড. শাহ আলম।[৬৪] বর্তমানে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, সার্দান

বিশ্ববিদ্যালয়, পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগ রয়েছে।

৪.৬ চিকিৎসা শিক্ষাঃ

চট্টগ্রামে ১৯২৭ খ্রি. মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রবর্তিত হয়।[৬৫] চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল (বর্তমান আন্দরকিল্লা) ভবনে চালু হয় মেডিকেল স্কুলের এল.এম.এফ কোর্স। চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের চিকিৎসকগণ জেলার আধিবাসীদের স্বাস্থ্য সেবায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৭ খ্রি. ৬ আগস্ট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম ব্যাচে ৭৬ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে প্রথম বর্ষ এম.বি.বি.এস এ ১০০ জন শিক্ষার্থী পড়ার সুযোগ পায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে প্রতি ব্যাচে ১৫০ জন শিক্ষার্থী প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়।[৬৬] অসংখ্য বিদেশী শিক্ষার্থীও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে পড়ালেখা করে। ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ১৯৬৯ খ্রি. চালু হয়। শুরুতে কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। ১৯৭৪ খ্রি. হতে এটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে। ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষ হতে বি.ডি.এস কোর্স শুরু হয়। প্রতি বছর ২০ জন শিক্ষার্থী বি.ডি.এস অধ্যয়নের সুযোগ পায়। বর্তমানে ২৫টি বিভাগে ১২৪ জন শিক্ষক পাঠদান করেন।[৬৭] ফৌজদারহাটে 'চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়' (২০১৭ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা চিকিৎসা শিক্ষার কার্যক্রমকে চট্টগ্রাম জেলায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এখানে সহশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এ অঞ্চলের প্রথম বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইউনির্ভাসিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (ইউ.এস.টি.সি) ১৯৮৯ খ্রি. মেডিকেল শিক্ষা শুরু করে। পরবর্তীতে চট্টগ্রামে বেশ কিছু বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। এসব মেডিকেল কলেজের মধ্যে সাউর্দান মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম মা ও শিশু মেডিকেল কলেজ, মেরিন সিটি মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, বি.জি.সি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজ অন্যতম।[৬৮] এসব মেডিকেল কলেজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৪.৭ নার্সিং শিক্ষাঃ

১৯৬৩ খ্রি. চট্টগ্রাম স্কুল অব নার্সিং প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চট্টগ্রামে নার্সিং শিক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম বছর ৪ বছর মেয়াদি নার্সিং ডিপ্লোমা কোর্সে ১৮ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়।[৬৯] ১৯৮৮ খ্রি. স্কুলটি চট্টগ্রাম নার্সিং ইনস্টিটিউট নামে নতুন নামকরণ করা হয়। এ ইনস্টিটিউটে প্রতি বৎসর ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়।[৭০] বর্তমানে এটি চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজ নামে পরিচিত। এছাড়া ফৌজদারহাট নার্সিং কলেজ (২০০৮) এবং সি.আই.এম.সি.এইচ নার্সিং ইনস্টিটিউট চান্দগাঁও (২০১৮) চট্টগ্রামে নার্সিং শিক্ষায় যুক্ত হয়েছে।

৪.৮ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাঃ

উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের চূড়ান্ত ধাপ । ১৯৬৬ খ্রি. ২৫ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চট্টগ্রাম জেলায় উচ্চ শিক্ষার সংকট দূরীভূত হয়। এছাড়াও বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন যুগের চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়েছে।

৪.৮. ক. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাঃ

১৯৪৭ খ্রি. ভারত বিভক্তি পর্যন্ত চট্টগ্রামের মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের কলেজীয় শিক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অর্পিত হয়। বিগত শতকের চল্লিশের দশকে চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন চট্টগ্রাম পৌরসভার জনাব নূর আহমদ চেয়ারম্যান। তিনি অবিভক্ত বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে ব্রিটিশামলেই এই দাবী উত্থাপন করেন। চট্টগ্রাম পৌরসভার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সহায়তা হিসেবে একটি চেক তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নিকট হস্তান্তর করেন।[৭১] ১৯৬১ খ্রি. বাদশাহ মিয়া চৌধুরীকে সভাপতি ও অধ্যাপক আহমদ হোসেনকে আহ্বায়ক করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।[৭২] ১৯৬২ খ্রি. বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাব্য স্থান হিসেবে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও সিলেটের নাম প্রস্তাব করা হয়। এ সময়ে স্থান নিয়ে বির্তকে যোগ দেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ এনামুল হক সহ বুদ্ধিজীবি, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও সমাজ কর্মীগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬৪ খ্রি. ২৯ আগস্ট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তব স্থাপন করেন। এ সময় তিনি বলেন:

> "আমরা দেশে এমন নারী পুরুষ গঠন করতে চাই, যারা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে ব্যাপক ও ভিন্নতর দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে, যারা চরিত্রবান হয়ে স্বাধীন ও মুক্ত ধারার চিন্তা করতঃ কর্তব্য পথে উন্নতভাব নিয়ে অগ্রসর হবে।[৭৩]

প্রফেসর আজিজুর রহমান মল্লিককে ১৯৬৪ খ্রি. ১ অক্টোবর (এ.আর.মল্লিক) প্রকল্প পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৬৬ খ্রি. ১ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি হয় এবং প্রফেসর এ.আর. মল্লিককে উপাচার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৭৪] ১৯৬৬ খ্রি. ১৮ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর আবদুল মোনেম খান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করেন। বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি ও ইতিহাস বিভাগের মোট ২০০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ২৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস চালু হয়। ১৯৬৭ খ্রি. প্রথম এম.এ প্রিলিমিনারী পরীক্ষা এবং ১৯৬৮ খ্রি. সেপ্টেম্বরে এম.এ. ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত সকল ডিগ্রি কলেজকে ১৯৬৭ খ্রি. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত হয়। ১৯৬৮ খ্রি. জুন-জুলাই মাসে ৬৪৬৯ জন ছাত্র সর্বপ্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি পরীক্ষার অংশগ্রহণ করে। বি.এস.সি, বি.কম ও বি.এ পরীক্ষাতে পাশের হার যথাক্রমে ৪৮.৮, ৩৯.২৭ এবং ৩৪.৬। ১৯৬৮-৬৯ খ্রি. বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং গণিত বিভাগ চালু হয়। এছাড়া বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি ও ইতিহাস বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়। ১৯৬৯-৭০ খ্রি. পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।[৭৫] এ বিশ্ববিদ্যালয় বাধ্যতামূলক তিনটি কোর্স মাতৃভাষায় প্রবর্তন করে পাস কোর্সে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনায়ন করে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়েও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা বাংলাদেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শিরীণ আখতার। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি অনুষদ, ৫৪টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউট, প্রায় ২৮০০০ জন শিক্ষার্থী, ৮৭২ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং ২০৪৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে। এটির মোট আয়তন ১৭৫৪ একর। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও একটি যাদুঘর রয়েছে। লাইব্রেরি প্রায় ৩৫০০০০ বই, ৪০০০০ ই-বুক, প্রায় ৬০০ দুষ্প্রাপ্য পান্ডুলিপি (বাংলা, সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায়) এবং অসংখ্য দেশী-বিদেশী জার্নাল রয়েছে। চিকিৎসা অনুষদের Ophthalmology Department রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত ১৪টি

মেডিকেল কলেজ, ১টি ডেন্টাল কলেজ, ৩টি নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউট, ২টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ২টি মেডিকেল টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, ১টি ফ্যাশন ও টেকনোলজি ইনস্টিটিউট এবং ১টি গার্হস্থ অর্থনীতি কলেজ রয়েছে।[৭৬] উল্লেখ যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, যা নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

৪.৮.খ. চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমেল সায়েন্স ইউনির্ভাসিটিঃ

চট্টগ্রাম শহরের খুলশি এলাকায় এটি ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫-৯৬ খ্রি. চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম সরকারি ভেটেরিনারি কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর গৌতম বুদ্ধ দাস। তিনটি অনুষদের অধীনে ১৮টি বিভাগ এবং ৪টি রিসার্চ সেন্টার ও ইনস্টিটিউট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত হচ্ছে।[৭৭]

৪.৮.গ. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ

বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৯ খ্রি. ১৩ মে ইউনির্ভাসিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম (ইউ.এস.টি.সি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটির মাধ্যমে চট্টগ্রামে বেসরকারিভাবে উচ্চ শিক্ষা দ্বার উন্মুক্ত হয়। জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা।[৭৮] চিকিৎসা শিক্ষাসহ বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (১৯৯৫ খ্রি.), প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় (২০০২ খ্রি.), সার্দান ইউনির্ভাসিটি বাংলাদেশ, (১৯৯৮), চট্টগ্রাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনির্ভাসিটি (১৯৯৯), বি.জি.সি ট্রাস্ট ইউনির্ভাসিটি (২০০১), ইস্ট ডেল্টা ইউনির্ভাসিটি, (২০০৬), পোট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি (২০১৩), ইউনর্ভিসিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি চট্টগ্রাম () প্রভৃতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চট্টগ্রামে উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতিকে অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া এশিয়ান ইউনির্ভাসিটি ফর উইম্যান (২০০৮) নামে আন্তর্জাতিক মানের নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ এশিয়ায় উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

৪.৮.ঘ. প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষাঃ

রাউজান-রাঙ্গুনিয়া থানার সংযোগস্থলে ১৭১ একর জায়গায় ১৯৬৮ খ্রি. চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ড. ওয়াহিদ উদ্দীন আহমেদ। প্রকৌশল শিক্ষার জন্য এ কলেজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ১৯৬৭ খ্রি. ২৮ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। ১৯৮৬ খ্রি. ১ জুলাই এটি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি যা চট্টগ্রাম বি.আই.টি নামে পরিচিতি পায় এবং স্বায়াত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পায়।[৭৯] বর্তমানে এটি একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, যা ২০০৩ খ্রি. ১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম ইউনির্ভাসিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি নামে আত্মপ্রকাশ করে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ রফিকুল আলম। বর্তমানে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৪৫০০। এখন ১৫টি বিভাগ নিয়ে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরো দুটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (চট্টগ্রাম ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, মুরাদপুর এবং চট্টগ্রাম ন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলশী) প্রকৌশল শিক্ষায় যুক্ত হয়েছে।

পশ্চিম নাসিরাবাদে ৩৬ একর জমির উপর ১৯৬২ খ্রি. পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। প্রথম থেকেই এটি ৭টি বিভাগ নিয়ে পরিচালিত হয়েছে বর্তমানে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু আছে। এখানে পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল, শক্তিকৌশল অনুষদে প্রায় ৪৫০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার আবদুর রহিম।[৮০] এছাড়াও চট্টগ্রামে শ্যামলী আইডিয়েল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ডেফোডিল ইনস্টিটিউট অব আই.টি. চট্টগ্রাম, ন্যাশনাল পলিটেকনিক কলেজ চট্টগ্রাম, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি চট্টগ্রাম, প্রগ্রেসিভ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম, ইসলামি ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি চট্টগ্রাম, মিপস ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম, এমপেক কলেজ অব টেকনোলজি চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রভৃতি সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রকৌশল এবং কারিগরি শিক্ষায় অবদান রাখছে। কারিগরি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র নাসিরাবাদে (১৯৬২ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ১৯৬৩ খ্রি. এই কেন্দ্রে ৯টি বিভিন্ন ক্যাটাগরির ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এটি ১৯৬৪ খ্রি. শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত

হয়। বর্তমানে ১২টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।[৮১] এছাড়াও বাংলাদেশে-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি দক্ষ জনশক্তি গড়তে সহায়তা করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশের ৪৩৭টি উপজেলায় টি.টি.সি নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই নীতির প্রথম ধাপে চট্টগ্রামের রাউজান, সন্দ্বীপ, মীরসরাই, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী ও পটিয়ার উপজেলায় ৬টি টি.টি.সি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।[৮২]

৪.৯ চারুকলা কলেজঃ

১৯৭৩ খ্রি. ৩ আগস্ট চারুকলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮৩] এটি চট্টগ্রামের প্রথম চারুকলা কলেজ। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হলেন শিল্পী সাবিহ-উল-আলম। ১৯৭৫ খ্রি. কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায় এবং ১৯৭৬ খ্রি. ডিগ্রি কলেজের মর্যাদা পায়। ১৯৮৪ খ্রি. চারুকলা কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে।[৮৪] ১৯৭৮ খ্রি. প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা বি.এফ.এ পাশ করেছে। ২০১০খ্রি. কলেজটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একীভূত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটিকে আত্মীকরণ করে বাংলাদেশের চতুর্থ ফাইন আর্টস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে।[৮৫] এটি বর্তমানে চট্টগ্রাম শহরের বাদশা মিয়া রোডে অবস্থিত।

তথ্যসূত্র ও টিকাঃ

১. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *হাজার বছরের চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫, পৃ. ১৭৭।

২. ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামে শিক্ষা সাধনা*, জুলাই, ১৯৮৪, চট্টগ্রাম, পৃ. ১।

৩. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৭৭।

৪. তিলপাদ ওরফে প্রজ্ঞা ভদ্র পটিয়ার চক্রশালা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার পরই প্রজ্ঞা ভদ্র নাম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার পরই প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি সংস্কৃত ও পালি মিশ্রিত ভাষায় ছ'টি গ্রন্থ রচনা করেন।

৫. মৌলানা আবুল হাসানকে পান্ডিত্যের জন্য 'সফিনা-ই-ইসলাম' বা বিদ্যার জাহাজ বলা হত। তিনি ১৮০১ খ্রি. চট্টগ্রাম শহরের চান্দগাঁও এ জন্ম গ্রহণ করেন। তাদের পূর্ব পুরুষ মোহাম্মদ মোধা শাহ শুজার সাথে চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি প্রায় ২২টি বিষয়ে পান্ডিত্যে অধিকারী ছিলেন। তাঁর মাদ্রাসায় ৩০০ থেকে ৪০০ জন ছাত্র পড়ালেখা করতে। তিনি তাদের আহার ও বাসস্থান দিতেন। ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, জুলাই, ১৯৮২, চট্টগ্রাম, পৃ.৬৮।

৬. ওহীদুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১।

৭. J.P Naik and S. Nurullah, *A History of English Education in India*, Bombay, Macmilan and Co. Ltd., 1951, P. 11-12.

৮. কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১, পৃ. ৮।

৯. *যুগধর্ম*, জুলাই সংখ্যা, ১৯৩৫। মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৮।

১০. John Clarke Marshman, *The Life and Times of Carey Marshman and Ward,* etc, Vol. II, Langman, 1859, P.157. Jogesh Chandra Bagal, *Women's Education in Eastern India*, Calcutta, 1956, P.54.

১১. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮১।

১২. *তদেব*, পৃ. ১৮০।

১৩. হান্টার কমিশিন অফিসিয়ালি ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নামে পরিচিত। ১৮৮২ খ্রি. গঠিত কমিশনটি আধুনিক ভারতের ইতিহাসে প্রথম শিক্ষা কমিশন। উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে এ কমিশনে আনন্দ মোহন বসু, এ ডব্লিউ ক্রফট, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, কাশীনাথ, সৈয়দ আহমদ খান (পরবর্তীতে তার পুত্র সৈয়দ মাহমুদ) প্রমুখ কাজ করেন। সূত্র: বাংলাপিডিয়া, ঢাকা, ২০০৩।

১৪. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮০।

১৫. *তদেব*।

১৬. নূর আহমদ চৌধুরী ২৫ ডিসেম্বর, ১৮৯০ খ্রি. চট্টগ্রাম শহরের আলকরণে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯১৭ খ্রি. ইতিহাস বিষয়ে এম.এ এবং ১৯১৭ খ্রি. বি.এ পাশ করেন। তিনি পেশায় একজন আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ১৯১৮ খ্রি. চট্টগ্রাম পৌরসভার কমিশনার এবং ১৯২১ খ্রি. চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। চট্টগ্রাম পৌরসভার দীর্ঘ সময়ের চেয়ারম্যান (১৯২১-১৯৫৪ খ্রি.) থাকাকালীন সময়ে চট্টগ্রামের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তিনি চট্টগ্রাম শহর মুসলিম লীগের সভাপতি (১৯১৭ খ্রি.) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ সদস্য ছিলেন।

১৭. *চট্টগ্রাম পৌরসভার ১৫০ বছর পূর্তি স্মারক গ্রন্থ*, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ২২ জুন, ২০১৩।

১৮. ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামে শিক্ষা সাধনা*, পৃ. ১।

১৯. *তদেব*।

২০. আব্দুল হক চৌধুরী, শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা, কথামালা প্রকাশনা, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫, পৃ. ২২৫।

২১. *তদেব*।

২২. *তদেব*।

২৩. *আবদুল হক চৌধুরী, শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫, পৃ. ২২৫।*

২৪. কাজিম আলী ১৮৫২ খ্রি. বর্তমান চাঁন্দগাও থানার ফরিদার পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলী (বর্তমান ভারত) থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে ভারতের লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর সদস্য হন। চট্টগ্রামে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম

নেতা মাস্টার কাজিম আলীকে কারাবরণও করতে হয়। তিনি ১৯২৬ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। ওহীদুল আলম: *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮-১১।

২৫. W.W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol: VI, London, 1876, Reprint, Delhi, 1973. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত): *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮১।

২৬. ওহীদুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২।

২৭. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮১।

২৮. *তদেব*।

২৯. *তদেব*।

৩০. *তদেব*।

৩১. *তদেব*।

৩২. *স্বদেশি আন্দোলন ১৯০৬ খ্রি. শুরু হওয়া বঙ্গভঙ্গের (Partition of Bengal) বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।*

৩৩. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৯।

৩৪. *তদেব*।

৩৫. ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামে শিক্ষা সাধনা*, পৃ. ৭-৬০।

৩৬. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮১।

৩৭. *তদেব*, পৃ. ১৮২।

৩৮. তদেব।

৩৯. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮১।

৪০. *Statistical Pocketbook Bangladesh 2000,* Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, P. 342. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮০।

৪১. *তদেব*, পৃ. ১৮০।

৪২. *তদেব* ।

৪৩. *তদেব*।

৪৪. *ব্যানবেইস জরিপ*, ২০১৯।

৪৫. https://www.ccc.org.bd (Date: 15.07.2020).

৪৬.বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় কলেজ। চট্টগ্রাম কলেজের ওয়েবসাইটে কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় ১৮৩৬ খ্রি. দেখানো হয়েছে। মহাকবি নবীন সেনের (১৮৪৭-১৯০৯ খ্রি.) আত্মজীবনী 'আমার জীবন'-এ বর্ণনা নুযায়ী চট্টগ্রাম কলেজের প্রতিষ্ঠা ১৮৬৯ খ্রি.। ওহীদুল আলম তাঁর 'চট্টগ্রাম শিক্ষা সাধনা' গ্রন্থে ১৯১৯ খ্রি. কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের উল্লেখ করেন। মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত): *হাজার বছরের চট্টগ্রাম* গ্রন্থেও কলেজটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৬৯ খ্রি. উল্লেখ রয়েছে।

৪৭.ওহীদুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬।

৪৮.*তদেব* ।

৪৯.*তদেব*, পৃ.৭।

৫০.*A Profile on Chittagong College*, The Daily Star, Dhaka, Bangladesh, May 2, 2010.

৫১.ওহীদুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭।

৫২.১৮৭৪ সালে মহসিন ফান্ডের টাকায় চট্টগ্রাম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৫ সালে মাদ্রাসার সিলেবাসে ইংরেজি সংযুক্ত করে এটিকে নিউ স্কিম মাদ্রাসার উন্নীত করা হয়। ১৯২৭ সালে নিউ স্কিম মাদ্রাসাটিকে ইসলামি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৮৩ সালে সরকার কলেজটিকে হাজী মুহাম্মদ মহসিন ডিগ্রী কলেজে পরিণত করেন। আব্দুল হক চৌধুরী: *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৮।

৫৩.ক. ওহীদুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯।

৫৪.*তদেব* ।

৫৫.মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৩।

৫৬.*তদেব* ।

৫৭. *Statistical PocketBook Bangladesh,* Dhaka, 2002.

৫৮.*Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics Report*, 2019.

৫৯.www.ccc.org.bd(Dated: 15.7.2020)

৬০.ওহীদুল আলম, *পূর্বোক্ত*।

৬১.মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৫।

৬২. *তদেব* ।

৬৩. *তদেব* ।

৬৪. *তদেব* ।

৬৫. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

৬৬. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৫।

৬৭. *তদেব*, পৃ. ১৮৬।

৬৮. *তদেব* ।

৬৯. *wikipedia.org* (Dated: 15.07.2020)

৭০. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬।

৭১. *তদেব* ।

৭২. *দৈনিক আজাদ*, ২৮ জুলাই, ১৯৪২, পৃ.৩। *চট্টগ্রাম পৌরসভার ১৫০ বছর পূর্তি স্মারক গ্রন্থ*, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ২২ জুন, ২০১৩।

৭৩. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৭। বাদশাহ মিয়া চৌধুরী বিশিষ্ট সমাজ সেবক এবং আহমদ হোসেন সিটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

৭৪. ওহীদুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০।

৭৫. *তদেব।* প্রফেসর আর মল্লিক প্রকল্প পরিচালক ১৯৬৫ খ্রি. ৩ ডিসেম্বর এবং উপাচার্য ১৯৬৬ খ্রি. ৯ অক্টোবর উল্লেখ রয়েছে *হাজার বছরের চট্টগ্রাম* গ্রন্থে।

৭৬. *তদেব*, পৃ.৭০-৭২।

৭৭. চ.বি. অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

৭৮. www.cvasu.ac.bd(dated: 18.07.2020).

৭৯. www.ustc.ac.bd(dated: 18.07.2020).

৮০. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৬।

৮১. চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

৮২.*টি.টি.সি অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।*

৮৩.*দৈনিক আজাদী*, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

৮৪.শিল্পী রশিদ চৌধুরী, কথাশিল্পী আবুল ফজল, শিল্পপতি এ.কে.খান, ডাক্তার, এস.এম ইউসুফ, প্রকাশক সৈয়দ মুহাম্মদ শফি প্রমুখের সর্বাত্মক সহযোগিতায় কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত): *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৬।

৮৫.*তদেব* ।

৮৬.*চ.বি. অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।*

পঞ্চম অধ্যায়

চট্টগ্রাম জেলার নারী শিক্ষার ইতিবৃত্ত

বাংলায় আধুনিক নারীর শিক্ষার সূচনা, বিকাশ ও অগ্রগতি নিয়ে আমার থিসিসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এই আলোচনায় চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার বিকাশ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। খ্রিস্টান মিশনারিগণ বিশেষতঃ শ্রীরামপুর মিশনারি, ব্যক্তি উদ্যোগ ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় চট্টগ্রামেও ধীরে ধীরে নারী সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। চট্টগ্রামের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থা প্রথম দিকে বাঁধা দিলেও নারীর আধুনিক শিক্ষা পর্যায়ক্রমে গতিশীল হয়, যা আলোচ্যাংশে তুলে ধরা হল।

৫.১ আধুনিক নারী শিক্ষার প্রারম্ভকাল:

খ্রিস্টান মিশনারিরা ১৮১৮ খ্রি. মধ্যে এলাহাবাদ থেকে আকিয়াব পর্যন্ত ১৮০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। যার মধ্যে ১১১টি বিদ্যালয় শ্রীরামপুর মিশনারির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।[১] *Jogesh Chandra Bagal* এর মতে, "The Serampore Mission opened girls school at different centres in Bengal and some at such distance station as Akjab, Benares and Allahabad."[২] এজন্য তৎকালীন সময়ে চট্টগ্রামে মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এসকল বিদ্যালয়ের মধ্যে নারী শিক্ষার স্কুলের প্রমাণও পাওয়া যায়।[৩] উনিশ শতকে ত্রিশের দশকের (সম্ভবত শেষ প্রান্তে) কিছু রিপোর্ট *J.C. Bagal* তাঁর *Women's Education in Eastern India* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। চট্টগ্রাম বিষয়ক বিবরণে দেখা যায় যে, চট্টগ্রামে ৪টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম স্কুলটি মাদারবাড়ী (*Mudder Baree*), দ্বিতীয় স্কুলটি মুরাদপুর (*Moradpore*), তৃতীয় স্কুলটি ভেলুয়ার দিঘী (*Bhalooa-diggy*) এবং চতুর্থ স্কুলটি বউত দেওয়ানে (*Baut Dewan*) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবে চতুর্থ স্কুলটি খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। মিশনারীদের রিপোর্টের শুরুতে লিখা হয়:

> "Of the Chittagong Schools, we have recently received very interesting notices. Although they do not enjoy a uniform prosperity, yet their efficiency is always encouraging. In March last, Mr. Johannes held an annual examination of each of the schools, in the presence of the parents and other relatives of the children and sent us the following account of the results…"[৫]

মাদার বাড়ীর প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ে ৫০ জন ছাত্রী রয়েছে এবং ৪৬ জন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে। মুরাদপুর স্কুলে ১৭ জন, ভেলুয়ার দিঘী স্কুলে ৩২ জন এবং বউত দেওয়ানে ১৬ জন ছাত্রীর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া রিপোর্টের আরো বলা হয়:

> "Several respectable Moosoolmans have called on me and said, that if I would employ them, they could easily establish schools in the villages, and over the water. For every girl that leaves the schools spreads the fame of them and the knowledge of our exertions inspires the people with a desire that their villages might profit by them."[৫]

মিশনারীদের সর্বশেষ বিবরণী অনুযায়ী চট্টগ্রামের বালিকা বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে মাদারবাড়ী স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ৩৫, বেলুয়ার দিঘী স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ৩০ এবং মুরাদপুর স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ১২।[৬]

এ সময়ে আরকানের আকিয়াব থেকে এলাহাবাদ এবং বেনারস পর্যন্ত মিশনারি স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীর চিত্র নিম্নরূপ:

সারণি-১[৭]: মিশনারি স্কুল ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা

স্কুলের নাম	শিক্ষার্থী সংখ্যা
শ্রীরামপুর স্কুলসমূহ	২৫০
বীরভূম স্কুলসমূহ	৪৪
ঢাকা স্কুলসমূহ	১৪০
চট্টগ্রাম স্কুলসমূহ	৭৭
যশোর স্কুল	১৫
আকিয়াব স্কুল	০৬
এলাহাবাদ স্কুল	০৫
বেনারস স্কুল	১৩
মোট শিক্ষার্থী	৫৫০

সূত্রঃ *Jogesh Chandra Bagal: Women's Education in Eastern India, Calcutta*, 1956.

১৮৩১ খ্রি. *J.C Marshman* লিখেন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামপুর মিশন সফল হয়েছে এবং ঢাকা চট্টগ্রামসহ সমগ্র অঞ্চলে ৮৪টি বিদ্যালয় স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেনঃ

> "Of the female schools connected with the mission, that in serampore was the most flourishing; the number in attendance was eighty four. At Dacca there were seven schools with two hundred and nine scholars; at Chittagong five, with a hundred and twenty nine; and one at each of the other stations, making an aggregate of four hundred and eighty-four."[৮]

শ্রীরামপুর মিশনের প্রাথমিক লক্ষ্য বাইবেলের প্রচার যা কিছুটা সফল হয়েছে। অন্যটি হচ্ছে দেশের মানুষকে আধুনিক শিক্ষায় দীক্ষা দেওয়া। মিশনারি স্কুল সমূহের প্রাথমিক লক্ষ্য সফলতা ও ব্যর্থতার পক্ষে বিপক্ষে মতামত রয়েছে। কালের পরিক্রমায় এসব স্কুলসমূহ বিলুপ্ত হয়। পরবর্তীতে আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার হয়েছে। তথাপি মিশনারিদের এ সকল স্কুলসমূহের অবদান অসামান্য। মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহন করে শ্রীরামপুর মিশনারীরা মাতৃভাষায় শিক্ষার পথ প্রদর্শক হয়েছেন। আধুনিক শিক্ষায় মিশনারীর অবদান সম্পর্কে Jogesh Chandra Bagal বলেন:

> "But the services rendered to the cause of Indian education, have been imense. The missionaries of serampore are still remembered as pioneers in advocating the cause of our mother-tongue to be the only suitable medium of instruction" [৯]

বিশ শতকে বাংলার নারী শিক্ষা এদেশীয় কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ এবং সরকারের প্রচেষ্ঠায় কিছুটা এগিয়ে যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু মহিলাদের আধুনিক শিক্ষার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে বিশ শতকেই মুসলিম মহিলাদের পশ্চাৎপদতার মানসিকতা পরিবর্তন ঘটে। ১৯০১ খ্রি. আদমশুমারীতে ৪০০ জন শিক্ষিত মুসলিম নারীর তথ্য রয়েছে।[১০] অবশ্য জেনানা শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে এসকল মুসলিম নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খ্রি. সরকারের অধীনে শুধু রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৫৯৮ জন মুসলিম শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করেছে।[১১] অবশ্য হিন্দু নারীরা জেনানা শিক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও গ্রহণ করেছে। পূর্ববাংলা তথা চট্টগ্রাম মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় বাংলা তথা চট্টগ্রামের নারী শিক্ষায় পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার তথ্যচিত্রও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করি। ১৯০৬ সালের আগে পূর্ব বাংলায় ইডেন গার্লস স্কুল ঢাকা (১৮৭৩ খ্রি.), ডা. অন্নদাচারণ খাস্তগীর স্কুল চট্টগ্রাম (১৯৭৮ খ্রি.) এবং ময়মনসিংহের আলেকজান্ডার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২] যা পূর্ব বাংলায় আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং পূর্ব বাংলায় নারী শিক্ষায় নবজাগরনের সৃষ্টি করেছে। ১৯২৮ সালে বাংলার জনশিক্ষা পরিচালক নারী শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের উদাসীনতার বিষয়ে দৃষ্ঠি আর্কষণ করে সর্তক করেন।[১৩] ১৯৩৩ সালে সরকার জেনানা শিক্ষাকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেন, যা পূর্বের আলোচনায় রয়েছে। ১৯৩১ সালে মুসলিম শিক্ষা উপদেষ্ঠা বিষয়ক 'মোমেন কমিটি' কে সরকার মুসলিম নারী শিক্ষা পর্যালোচনা

এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করতে বলেন। এ কমিটির রির্পোটে বলা হয়, অধিকাংশ মুসলিম মেয়ে শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ না করেই স্কুল ত্যাগ করে। স্কুল সমূহে মুসলিম শিক্ষিকা অপ্রতুল রয়েছে এবং মুসলিম বালিকাদের পৃথক স্কুলেরও অভাব রয়েছে। স্কুলের বেতন পরিশোধ করাও দরিদ্র ছাত্রীদের অসাধ্য এবং মুসলিম ছাত্রীর বৃত্তিপ্রাপ্তির হার খুবই কম। মুসলিম নারীদের শিক্ষায় সরকারী অনুদান পর্যাপ্ত নয়, যা নারীদের শিক্ষায় পিছিয়ে রেখেছে। মুসলিম নারী শিক্ষায় মোমেন কমিটির উল্লেখযোগ্য সুপারিশ সমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

ক. ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কলকাতায় মুসলিম ছাত্রীদের জন্য তিনটি সরকারি ছাত্রীবাস অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এছাড়াও অন্যান্য সাহায্য প্রাপ্ত, স্কুলে চাহিদা অনুযায়ী ছাত্রবাস স্থাপন করা হউক। এক্ষেত্রে দারিদ্র আবাসিক মুসলিম ছাত্রীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা উচিত।

খ. চট্টগ্রাম ও কলকাতায় একটি করে মাতৃভাষায় প্রশিক্ষন স্কুলে স্থাপন করা প্রয়োজন।[১৪]

বাংলার মুসলিম নারী শিক্ষায় মোমেন কমিটির সুপারিশসমূহ খুবই কার্যকারী ছিল। ১৯৩৫ সালে শিক্ষামন্ত্রী এম. আজিজুল হকের সিদ্ধান্তে বাংলার মুসলিম নারী শিক্ষার সার্বিক উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়।[১৫] এ সিদ্ধান্তের আলোকে সাখাওয়াত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে (জানুয়ারী, ১৯৩৬ খ্রি.) সম্পূর্ণ সরকারীকরণ করা হয় এবং সরকার পশ্চিম বাংলায় নারী শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে একটি উপদেষ্ঠা পরিষদ গঠণ করেন।[১৬] ১৯৩৭ সালে শিক্ষাণুরাগী প্রধানমন্ত্রী এ.কে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা নারী শিক্ষার বিস্তারে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামে গুলজার বেগম বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বাস ক্রয়ের জন্য ১৯৩৭ সালে সরকার ১৬৩৭ টাকা অনুদান প্রদান করেন।[১৭] একই বছর আরও কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়ে বাস ক্রয়ের জন্য ৪০০২ টাকা অনুদান দেন।[১৮] এভাবে ব্যক্তিগত ও মিশনারী উদ্যোগে এবং সরকারি প্রচেষ্ঠায় বাংলা নারী শিক্ষা তথা চট্টগ্রামের নারী শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ন হয়েছে। নিম্নের আলোচনা চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৫.২ নারী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক স্কুলসমূহঃ

উনিশ শতকে ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীর[১৯] আধুনিক নারী শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭৮ খ্রি. চট্টগ্রাম শহরে একটি মধ্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন[২০] (যা বর্তমানে চট্টগ্রাম শহরের জামাল খান এলাকা)। এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা ঘটে। তাঁর জামাতা চট্টগ্রামে সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ যাত্রা মোহন সেন[২১] (জে.এম. সেন নামে অধিক পরিচিত) একখন্ড জমিতে ভবন নির্মাণ করে ১৯০৭ খ্রি. স্কুলটিকে দান করেন। একই বৎসর স্কুলটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তখন স্কুলটির নামকরণ করা হয় ডা. অন্নদাচরণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং সরকার বিদ্যালয়টি অধিগ্রহণ করেন।[২২] জে.এম.সেন মূলত: শ্বশুরের স্মৃতি রক্ষার্থে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। রক্ষণশীল চট্টগ্রামে ১৮৩৬ খ্রি. প্রথম ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পর নারীদের ইংরেজী বিদ্যালয় গড়ে উঠার কারণ সকল সম্প্রদায়ের নারীরা ছিলেন অন্তঃপুরচারিণী। ডা: খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় চট্টগ্রাম নারী শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। সরকার মুসলমান মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহ সৃষ্ঠির জন্য এই বিদ্যালয়ে ফারসি ও আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।[২৩] বিশ শতকের চট্টগ্রামে শিক্ষিত মহিলাদের অধিকাংশই এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী। উপমহাদেশের বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, অগ্নিকন্যা কল্পনা দত্ত, বাংলা সাহিত্যের লেখিকা মৈত্রেয় দেবী, অধ্যাপিকা ড. শিপ্রা দত্ত, ভারতীয় বিজ্ঞানী শোভনা ধর, শিক্ষাব্রতি প্রণাতি সেন সহ অনেক কৃতবিদ্য মহিলা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করেন। বর্তমানকালেও চট্টগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুনাম অব্যাহত রেখেছে। পূর্বে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধা ছিল। কিন্তু এনাম কমিশনের রিপোর্টে বিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধা বাতিল করা হয়।[২৪]

চট্টগ্রামের শিক্ষানুরাগী কালিতারা দেবী ১৯২৭ খ্রি. শহরের গোপাল সিং লেনে 'নন্দনকানন বালিকা বিদ্যালয়' নামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[২৫] নিজের বসত বাড়ির আঙ্গিনায় যাত্রকালে বিদ্যালয়ে মাত্র ১২ জন ছাত্রী ছিলেন। পরবর্তীতে বর্ধিত ছাত্রীদের জায়গার সংকুলান না হওয়ায় ১৯৩২ খ্রি. বর্তমান স্থানটি বন্দোবস্তি নেয়া হয়। ১৯৩৪ খ্রি. শিক্ষাবিদ ও অনারারি ম্যাজিস্টেট অপর্ণাচরণ রায়ের অর্থায়নে বিদ্যালয়ের পাকা ঘর নির্মিত হয়। তখন মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হওয়া বিদ্যালয়টি তাঁর নামে অপর্ণাচরণ বালিকা বিদ্যালয় নামকরণ করা হয়।[২৬] ১৯৩৭ খ্রি. এটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং ১৯৩৯ খ্রি. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়।[২৭] এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন চট্টগ্রামের বীরকন্যা প্রীতিলতা

ওয়াদ্দাদার এবং শিক্ষাবিদ প্রণাতি সেন। মুলত: প্রণতি সেনের দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর প্রধান শিক্ষিকা পদে কর্মরত অবস্থায় বিদ্যালয়টি খ্যাতি অর্জন করে। এই বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি অনেক সমৃদ্ধ। এখানে প্রায় ৩১০০ গ্রন্থ রয়েছে এবং দুস্প্রাপ্য মূল্যবান গ্রন্থের সংখ্যা ১০০। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীর মধ্যে লেখিকা ফাহমিদা আমিন, অধ্যাপিকা ড. খালেদা হানুম, অধ্যাপিকা ড. জয়নব বেগম, ড. শিপ্রা রক্ষিত, অধ্যক্ষ রওশন আরা বেগম, অধ্যাপিকা হান্নানা বেগম, অধ্যাপিকা উম্মে কুলসুম প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৮] ১৯২৮ খ্রি. রেবতী রমন দত্তের উদ্যোগ ও প্রচেষ্ঠায় কানুনগোপাড়া মৃক্তকেশী উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সময়ে বিধুভূষন চৌধুরী, বংকিম আইচ, হারকৃপা চৌধুরী, অনুকূল দাশ, প্রফুল্ল চৌধুরী প্রমুখের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় 'কধুরখীল উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়' গড়ে উঠে। বংকিম সেনসহ কয়েকজন শিক্ষানুরাগীর প্রচেষ্টায় 'শাকপুরা প্রবর্তক বালিকা বিদ্যাপীঠ' প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৯] ১৯২৭ খ্রি. লালদিঘীর কে. সি. দে রোডে 'প্রবর্তক সংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯২৯ খ্রি. আসকার দিঘীর একটি ভাড়া বাড়িতেও প্রবর্তক সংঘ স্থানান্তরিত হয়। ১৯৩৩ খ্রি. চট্টগ্রামের গোলপাহাড়ে হেমচন্দ্র রক্ষিতের নিজস্ব জমিতে প্রবর্তক সংঘ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় বীরেন্দ্র চৌধুরী প্রবর্তক সংঘের সম্পাদক হন এবং জনকল্যাণ ও সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রমের সূচনা করেন। তিনি অনাথ ও অসহায় মেয়ের আশ্রয় ও শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে 'মৈত্রেয়ী ভবন' ও 'প্রবর্তক নারী শিক্ষা মন্দির' গড়ে তুলেন।[৩০] অপরদিকে কতোয়ালা কৃষ্ণ কুমারী সিটি কর্পোরেশন বালিকা বিদ্যালয় ১৯২৭ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় একই সময়ে বর্তমান জামালখানে অবস্থিত কুসুম কুমারী বালিকা বিদ্যালয়টিও প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩১]

চট্টগ্রামের মুসলিম সমাজে আধুনিক নারী শিক্ষা আন্দোলনে দেওয়ান হাটের পশ্চিমে ঈদগাহ অঞ্চলের ইব্রাহিম কন্ট্রাক্টর একজন পথিকৃৎ। তিনি ১৯১৩ খ্রি. নিজ গ্রামে সর্বপ্রথম একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর কন্যা ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।[৩২] তিনি একই সঙ্গে ঘোষণা করেন, যে মেয়ে প্রথম প্রাইমারি পাশ করবে তিনি সে মেয়ের উচ্চ শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবেন। এই বিদ্যালয়ের জমি ও আসবাবপত্র তিনিই দান করেন। এই বিদ্যালয়ের দু'জন মেয়ে প্রাথমিক বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য আগ্রহী হয়নি। কিন্তু ইব্রাহিম কন্ট্রাক্টর হতোদ্যম হয়নি। তিনি ডা. খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁর তিন কন্যাকে ভর্তি করান।[৩৩] এভাবে বিশ শতকের শুরুতে ইব্রাহিম কন্ট্রাক্টর চট্টগ্রামের মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা রাখেন। পাঠানটুলি অঞ্চলে পাঠানবংশের মাসউদ খান বাড়ী সংলগ্ন নিজ জমির উপর একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যা ১৯১৪ খ্রি. পাঠানটুলি খান সাহেব বালিকা বিদ্যালয় ও বালক বিদ্যালয় নামে পরিচিতি পায়।[৩৪] বর্তমানে বালিকা বিদ্যালয়টি পাঠানটুলি খানসাহেব বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে নারী শিক্ষায় অবদান

রাখছে। ১৯১৮ খ্রি. চট্টগ্রাম শহরের ধানিয়াল পাড়ার আসমা খাতুন[৩৫] নিজ বাড়ীতে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩৬] নারী শিক্ষার এই উদ্যোগে তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। এতদসত্ত্বেও তিনি বিদ্যালয়টি টিকিয়ে রাখেন এবং পাঠানটুলি মোসলেম বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিতি পায়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পর সতীশ চন্দ্র দে এর সহযোগিতায় পৌরসভার অনুমোদন নিয়ে তাঁর পিতৃব্য মোহাম্মদ ইব্রাহিমের জমিতে প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করেন। তিনি নিজেই বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর তিনি শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন এবং নারী শিক্ষার প্রসারে নিরবচ্ছিন্ন কাজ করেন।[৩৭] তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি বর্তমানে চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। এই মহিয়সী নারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং নারী শিক্ষার প্রসারে তাঁর স্বামী মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান এবং শিক্ষানুরাগী আমানত খান বি.এল সার্বিক সহযোগিতা করেন। বর্তমানে বিদ্যালয়টির নাম আসমা খাতুন সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং ঢাকা ট্রাংক রোডে অবস্থিত। আরেকজন মহিয়সী নারী আম্বিয়া খাতুন[৩৮] ১৯২২ খ্রি. নিজ বাসায় 'চন্দনপুরা মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয় শুরু করেন।[৩৯] তিনি ছাত্রীদের যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া ও পরিশোধ করতেন। তিনি চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের জমায়েত করে সভা করতেন এবং চন্দনপুরা স্কুলে মেয়েদের ভর্তি করানোর অনুরোধ করতেন। অনেক সময় অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। সকল বিরোধীতাকে উপেক্ষা করে ১৯২৪ খ্রি. চন্দনপুরা মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এ সময়ে কমিশনার খান বাহাদুর আবদুল মোমেন এবং কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডু বিদ্যালয় পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।[৪০] তাঁর স্বামী শিক্ষাবিদ খলিলুর রহমান এ কাজে সহযোগিতা করেন। তাঁদের প্রথম সন্তান ফাতেমাকে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এদেশে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানোই ছিল মূল লক্ষ্য। চট্টগ্রাম কলেজের প্রভাষক খলিলুর রহমান চট্টগ্রাম পৌরসভায় আধুনিক শিক্ষা বিস্তারেও নিরলস কাজ করেন। তিনি তৎকালীন পৌরসভার চেয়ারম্যান নুর আহমদ (১৯২১-১৯৫৪ খ্রি.) সাথে চট্টগ্রাম শহরে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বৃত্তি প্রদান এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কাজে সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩০ খ্রি. তাঁর স্বামী চট্টগ্রাম কলেজের প্রভাষক খলিলুর রহমান কলকাতার হুগলী কলেজে বদলী হলে স্কুলটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় পড়ে। এ ক্রান্তিকালে খান বাহাদুর ফজলুল কাদির বিদ্যালয়টির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি ও তাঁর ভাই মোহাম্মদ নাসির বিদ্যালয়টিকে নিজ এলাকায় (চন্দনপুরার ইমদাদ ভিলা) স্থানান্তর করেন। ১৯৩৪ খ্রি. বিদ্যালয়টি 'গোল এজার বেগম গার্লস স্কুল' নামে পরিচালনা শুরু করেন।[৪১] বর্তমানে বিদ্যালয়টি গোল এজার বেগম সিটি কর্পোরেশন বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। পূর্বে স্কুলটির সেক্রেটারি আবদুল অদুদ সেরেস্তাদার[৪২] কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন।

চট্টগ্রাম শহরে আধুনিক শিক্ষা তথা নারী শিক্ষায় অসামান্য অবদান রাখেন চট্টগ্রাম পৌরসভার নুর আহমদ চেয়ারম্যান (১৯২১-১৯৫৪ খ্রি.)। তিনি ১৯২৮ খ্রি. প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেন, যা চট্টগ্রামে আধুনিক শিক্ষার স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছে। তিনি এই সময়ে একটি শিক্ষা বোর্ড গঠন করেন। তিনি নিজেই বোর্ডের সভাপতি এবং খলিলুর রহমানকে[৪৩] সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করেন। চট্টগ্রাম কলেজের প্রভাষক খলিলুর রহমান বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নারী শিক্ষার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ফলে চট্টগ্রাম শহরে ২৯টি বালক এবং ৩২টি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠে।[৪৪] চট্টগ্রামে নারী শিক্ষায় নুর আহমদ চেয়ারম্যানের সময়কালীন উদ্যোগ অনন্য নজীর সৃষ্টি করেন। তাঁর সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর চট্টগ্রাম শহরে শিক্ষার উন্নয়ন অতুলনীয়। তিনি প্রত্যেক মহল্লায় পৌরসভার অধীনে একটি বালক ও একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পৌরসভা থেকে পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করেন।[৪৫]

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের (১৯৭১ খ্রি.) পর সরকারি নির্দেশে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করা হয়। পৌরসভার অধীনে শুধুমাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের কর্তৃত্বই অভ্যাহত থাকে। কোন পৌর সংস্থার বিদ্যালয় পরিচালনার উদহারন নেই। একমাত্র নুর আহমদ চেয়ারম্যানের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তেই চট্টগ্রাম পৌরসভায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করে অনন্য দৃষ্ঠান্ত স্থাপন করেন। চট্টগ্রাম পৌরসভা ১৯৮৯ খ্রি. সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়ে 'চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নামে পরিচিত হয়।' চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ.বি.এম মহিউদ্দীন চৌধুরী (১৯৯৪-২০১০ খ্রি.) চট্টগ্রাম শহরে শিক্ষা বিস্তারে অনন্য অবদান রাখেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁকে নুর আহমদ চেয়ারম্যানের উত্তরসূরী বলা যায়। তাঁর একান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৪৪টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৩টি কলেজ, ৬টি কিন্ডার গার্টেন, ৪টি নৈশ গণ শিক্ষা কেন্দ্র, ৪টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, ৪১০টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ৭টি সংস্কৃত টোল, ৪টি কম্পিউটার কলেজ এবং ১টি মিডওয়াইফারি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও পরিচালনা করছে।[৪৬] তিনি মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের জন্য পাঁচটি মাতৃসদন হাসপাতাল নির্মাণ করেন। এগুলো হচ্ছে উত্তর কাট্টলী সিটি কর্পোরেশন মোস্তফা হাকিম মাতৃসদন হাসপাতাল, বন্দরটিলা সিটি কর্পোরেশন মাতৃসদন হাসপাতাল, হাজী ওয়াইজ খাতুন মাতৃসদন হাসপাতাল দক্ষিন বাকলিয়া- নুরুল ইসলাম বি.এস.সি মাতৃসদন হাসপাতাল প্রভৃতি। অন্যদিকে মেমন মাতৃসদন হাসপাতালকে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতালে উন্নীত করেন। এভাবে তিনি নারীর স্বাস্থ্য সেবায়ও মনোনিবেশ করেন। তিনি মহিলা কমিশনারদের অধীনে 'কর্ণফুলী প্রকল্প'

স্থাপন করেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দুস্থ মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন।[৪৭] এছাড়াও তিনি একটি আন্তর্জাতিক মানের বেসরকারি প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ২৪টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে।[৪৮] চট্টগ্রাম শহরে নারী শিক্ষার উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাহাড়িকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, অর্পণাচরণ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সেন্ট স্কলাস্টিকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কৃষ্ণ কুমারী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গুল-এ-জার বেগম সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জামালখান কুসুম কুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বালুয়ারদিঘী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আলকরণ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাগমনিরাম এস.কে সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাথরঘাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৪৯]

চট্টগ্রাম জেলায় নারী শিক্ষার সার্বিক চিত্র আশির দশকেও খুব বেশি আশাব্যাঞ্জক ছিলনা। ১৯৮০-এর দশকে হাটহাজারী থানায় ৪টি, পটিয়ায় ৩টি এবং কক্সবাজার মহাকুমায় ২টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। ২০০০ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩৯৪টি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল।[৫০] বর্তমানে চট্টগ্রামে ৮৮টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে উত্তর চট্টগ্রামে ২৭টি, দক্ষিণ চট্টগ্রামে ২৭টি এবং চট্টগ্রাম মহানগরে ৩৪টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে।[৫১] এসব বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে নাজির হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নানুপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কাটির হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পদুয়া সম্মিলনী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সাতকানিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হাবিলাশদ্বীপ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সীতাকুন্ড বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মিরসরাই বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আমিরাবাদ জনকল্যাণ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাছবাড়িয়া মমতাজ বেগম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চরণদ্বীপ দেওয়ান বিবি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কামাল উদ্দিন চৌধুরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আনোয়ারা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।[৫২] তাছাড়া অধিকাংশ উচ্চ বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। চট্টগ্রামে সহশিক্ষার উচ্চ বিবদ্যালয়সমূহের মধ্যে গহিরা উচ্চ বিদ্যালয়, মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়, রোসাংগিরি উচ্চ বিদ্যালয়, ফটিকছড়ি করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়, পটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সাতকানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, আনোয়ারা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, গাছবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়, কাট্টলী নুরুল হক উচ্চ বিদ্যালয়, হাটহাজারী পাবর্তী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ফৌজদার হাট কে.এম উচ্চ বিদ্যালয়, সীতাকুন্ড উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গুনিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৫. ৩ নারী শিক্ষার কলেজসমূহঃ

চট্টগ্রামে ১৯৫৭ খ্রি. পর্যন্ত কোন মহিলা কলেজ ছিল না। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে চট্টগ্রাম কলেজ, পরবর্তীতে কানুনগোপাড়া কলেজ ও সাতকানিয়া কলেজে সহশিক্ষার ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৫৭ খ্রি. ১ জুলাই এম.ই.এস স্কুল চত্বরে মহিলাদের জন্য পৃথক কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৫৩] ভিক্টোরিয়া ইসলামিক হোস্টেলে নৈশ কলেজের দিবা বিভাগে 'সেন্ট্রাল গার্লস কলেজ' নামে এটির যাত্রা শুরু হয়। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র সিংহ। এটিই চট্টগ্রামে প্রথম মহিলা মহাবিদ্যালয়। ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষে কলেজটি বর্তমান অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে চট্টগ্রামের গর্ভনর জাকির হোসেন চৌধুরী খুলশী পাহাড়ে কলেজের জন্য ২০ একর জায়গার ব্যবস্থা করেন।[৫৪] যা কলেজটিকে পরিপূর্ণতা প্রদানে সহায়তা করেছে। ১৯৬৮ খ্রি. কলেজটি সরকারী করণের পর নাম হয় 'চট্টগ্রাম সরকারী গার্লস কলেজ'। ১৯৬০-৬৮ খ্রি. পর্যন্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ফেরদৌস আরা সাবেত। ১৯৬৪ খ্রি. নির্মিত হয় বর্তমান প্রশাসনিক ও একাডেমিক দু'তলা ভবনটি।[৫৫] ১৯৭৫, ১৯৮৬, ১৯৯০ ও ১৯৯১ খ্রি. সরকারি অনুদানে নির্মিত একাডেমিক ভবন, ছাত্রী আবাসের মাধ্যমে কলেজটি পরিপূর্ণতা পায়। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের 'এ' ক্যাটাগরির একটি কলেজ। ১৯৭০ খ্রি. চট্টগ্রামে কয়েকজন শিক্ষানুরাগী জেলা প্রশাসকের সহায়তায় এনায়েত বাজার মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৬] ১৩৪ জন ছাত্রী নিয়ে কলেজটি যাত্রা শুরু করেন। এটি প্রথম অধ্যক্ষ শিরীণ হায়দার আলী। বর্তমানে কলেজটি বেসরকারিভাবে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা বিভাগে স্নাতক ও অনার্স পর্যায়ে অধ্যয়ণের জন্য ১৫০০ ছাত্রীকে সুযোগ দিয়ে নারী শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।[৫৭] স্বাধীনতাত্তোর কালে আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ (১৯৮৮), পাথরঘাটা মহিলা কলেজ (১৯৯০) প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর চট্টগ্রামের প্রথম মহিলা কলেজ হচ্ছে কাটিরহাট মহিলা কলেজ। এটি ১৯৮৫ খ্রি. ডা. মাহমুদুল হক এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করেন।[৫৮] ২০০০ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে সরকারী ও বেসরকারী কলেজ সহ মোট ৩৬৯টি কলেজ ছিল।[৫৯] বর্তমানে চট্টগ্রামে মোট ৩১টি মহিলা কলেজ রয়েছে। তৎমধ্যে চট্টগ্রাম মহানগরে ১৬টি, উত্তর চট্টগ্রামে ৯টি এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামে ৬টি মহিলা কলেজ রয়েছে।[৬০] চট্টগ্রাম জেলার মহিলা কলেজ সমূহের মধ্যে কাটিরহাট মহিলা কলেজ, বাঁশখালী মহিলা কলেজ, আমানত সাফা বদরুন্নেছা মহিলা কলেজ, আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, এনায়েত বাজার মহিলা কলেজ, হালিশহর মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারী মহিলা কলেজ, কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ, চুনতি মহিলা কলেজ, জোরারগঞ্জ মহিলা কলেজ, খলিলুর রহমান মহিলা কলেজ, রাঙ্গুনিয়া মহিলা কলেজ, অগ্রসর মহিলা কলেজ, আবুল কাশেম হায়দার মহিলা কলেজ, সাতকানিয়া আদর্শ মহিলা কলেজ, সীতাকুন্ড মহিলা কলেজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৬০. ক]

চট্টগ্রামের সহশিক্ষার কলেজ সমূহের মধ্যে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ, হাজী মুহাম্মদ মহসিন সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম সিটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ওমরগনি এস.ই.এস কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজ, হাজেরা-তজু ডিগ্রী কলেজ, পটিয়া সরকারী কলেজ, সাতকানিয়া সরকারী কলেজ, হাটহাজারী সরকারী কলেজ, নাজিরহাট কলেজ, ফটিকছড়ি ডিগ্রি কলেজ, রাউজান কলেজ, গহিরা কলেজ, মোস্তাফিজুর রহমান ডিগ্রি কলেজ, সীতাকুন্ড ডিগ্রি কলেজ, রাঙ্গুনিয়া কলেজ, নিজামপুর কলেজ, বার আউলিয়া কলেজ, গাছবাড়িয়া সরকারী কলেজ, স্যার আশুতোষ সরকারী কলেজ, বাঁশখালী কলেজ, বাকলিয়া সরকারী কলেজ, আনোয়ারা ডিগ্রি কলেজ, উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এসকল সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহশিক্ষায় পাঠদান করা হয় এবং নারী শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখছে।

৫.৪ নারীর উচ্চ শিক্ষাঃ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৯৬৬ খ্রি) মাধ্যমে চট্টগ্রামে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উম্মুক্ত হয় প্রফেসর আজিজুর রহমান মল্লিককে উপাচার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৬১] ১৯৬৬ খ্রি. ১৮ নভেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভণর আবদুল মোনেম খান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ধোধন করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় শুরুতেই নারীরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পান। ১৯৮৯ খ্রি. ১৩ মে বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম (ইউএসটিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বেসরকারিভাবে ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্ঠি হয়। পরবর্তীতে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি চট্টগ্রাম (১৯৯৫ খ্রি.) সার্দান ইউনির্ভাসিটি বাংলাদেশ (১৯৯৮ খ্রি.), চট্টগ্রাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনির্ভাসিটি (১৯৯৯ খ্রি.), বিজিসি ট্রাস্টে ইউনির্ভাসিটি (২০০১), প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় (২০০২ খ্রি.) প্রভৃতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষায় নারীর অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করেছে (এ বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে)।

৫.৫ নারীর চিকিৎসা ও নার্সিং শিক্ষাঃ

চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল ভবনে ১৯২৭ খ্রি. মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চট্টগ্রামে আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষা শুরু হয়। চট্টগ্রাম মেডিকেল করেজ ১৯৫৭ খ্রি. ৬ আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬২] চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে সহশিক্ষা ব্যবস্থায় নারীর চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্ঠি হয়েছে। এ অঞ্চলের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

(ইউএসটিসি) ১৯৮৯ খ্রি. মেডিকেল শিক্ষা শুরু করে। বর্তমানে আরো কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চিকিৎসা শিক্ষার কর্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব বেসরকারি মেডিকেল কলেজে সহশিক্ষার মাধ্যমে নারীরাও চিকিৎসা শিক্ষা গ্রহন করেছেন। তাছাড়া ফৌজদারহাটে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (২০১৭ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৬৩ খ্রি. চট্টগ্রাম স্কুল অব নার্সিং প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চট্টগ্রামে নার্সিং শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এটি চট্টগ্রামে নাসিং কলেজ নামে পরিচিত।[৬৩] এখানেও সহশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও ফৌজদারহাট নার্সিং কলেজ এবং সি.আই.এম.সি. এইচ নার্সিং ইনস্টিটিউট, চান্দঁগাও চট্টগ্রাম নার্সিং শিক্ষায় যুক্ত হয়েছে। এসব ইনস্টিটিউটে নারীদেরও নার্সিং শিক্ষার সুযোগ রয়েছে (এ বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে)।

৫.৬ নারীর প্রকৌশল, কারিগরি ও অন্যান্য শিক্ষাঃ

১৯৬৮ খ্রি. চট্টগ্রাম প্রকৌশল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা ২০০৩ খ্রি. ১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম ইউনির্ভাসিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি নামে আত্মপ্রকাশ করে।[৬৪] এখন ১৫টি বিভাগ নিয়ে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা এই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ববস্থা রয়েছে। এটি চট্টগ্রামে নারীদের প্রকৌশল শিক্ষার দ্বার উম্মুক্ত করেছে। তাছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যিালয়ের অধীনে দুটি প্রকৌশল কলেজ এবং বেসরকারি সার্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৌশল শিক্ষা প্রদান করা হয়। এসকল প্রতিষ্ঠানে নারীরাও প্রকৌশল শিক্ষা গ্রহণ করছে।

চট্টগ্রাম শহরের নাসিরাবাদ এলাকায় ১৯৬২ খ্রি. পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৬৫] বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সরকারি এই কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষার মাধ্যমে এই কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীরাও কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম শহরে গড়ে উঠা প্রায় আরো দশটি সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও নারীদের শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়াও চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও চট্টগ্রাম মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ নারীদের কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশদ বর্ণনা রয়েছে)।

৫.৭ এশিয়ান ইউনির্ভাসিটি ফর উইমেন প্রতিষ্ঠাঃ

চট্টগ্রাম নারীদের উচ্চ শিক্ষায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সহশিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। কিন্তু এশিয়ান ইউনির্ভাসিটি ফর উইমেন (২০০৮) প্রতিষ্ঠা নারী শিক্ষাকে অনন্যতা দান করেছে। এটি আন্তর্জাতিক স্বায়াত্তশাসিত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, যার আচার্য চেরি ব্লেয়ার[৬৬] এবং উপাচার্য প্রফেসর নির্মলা রাও। এখানে বাংলাদেশসহ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের ১৯টি দেশের ৮৫০ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করছে।[৬৭]

২০০০ খ্রি. বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত (জন্ম ১৯৬৫, ঢাকা) আমেরিকান শিক্ষাবিদ কামাল আহমদ, হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন হেনরি রসভস্কি (*Henry Rosovsky*) ও বিশ্বব্যাংকের সাবেক ম্যানেজিং ডিরেক্টর মামপেলা রামফেলে (*Mamphela Ramphele*) নিয়ে গঠিত বিশ্বব্যাকং/জাতিসংঘ টাস্ক ফোর্সের "*Higher Education in Developing Countries; Peril and Promise*" শিরোনামের রিপোর্টের আলোকে এশিয়ান ইউনির্ভাসিটি ফর উইমেন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০০৫-২০০৬ খ্রি. গোল্ডম্যান সাকস্ ফাইন্ডেশন ও বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে প্রাথমিক ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টি শুরু করা হয়। ২০০৪ খ্রি. বাংলাদেশ সরকার চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে ১০০ একর জায়গা প্রদান করেন এবং ২০০৬ খ্রি. পার্লামেন্টে বিশ্ববিদ্যালয় চার্টারে এটিকে স্বায়াত্তশাসিত ও স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অনুমোদন দেয়। ২০০৮ খ্রি. বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার ১০০ জন ছাত্রী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।[৬৮] উল্লেখ যে, একটি অলাভজনক সংস্থা এশিয়ান ইউনির্ভাসিটি ফর উইমেন সার্পোট ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়।

তথ্যসূত্র ও টিকা :

১. যুগধর্ম, জুলাই, ১৯৩৫।

২. Jogesh Chandra Bagal: *Women's Education in Eastern India*, Calcutta, 1966, p.57.

৩. *Ibid*, pp. 56-57.

৪. *Ibid*, P. 65.

৫. *Ibid*, P. 66.

৬. *Ibid*

৭. *Ibid*, P. 67.

৮. Joha Clarke Marshman, *The life and times of carey Marshman and ward etc,* vol. II. Longman, 1859, P. 157.

৯. Jogesh Chandra Bagal, *op.cit.* P. 68.

১০. *Census of India, 1901,* Volume VIA, Lower Provinces of Bengal, part II, the imperial tables, Calcutta, 1902, P. 61.

১১. মো: আবদুল্লাহ আল মাসুম, ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৬০।

১২. Bharati Ray (ed.), *From the seams of History. Essays or Indian women*, Oxford university press. New Delhi, 1995, P. 130.

১৩. সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৪, পৃ. ৮১১।

১৪. *Report of the Moslem Education committee,* 1934.P. 114-115.

১৫. *Government of Bengal, Education Department,* Education Resolution No. 26517 Edn, Calcutta, 27th July, 1935, P.7.

১৬. *Report on public Instruction in Bengal, 1935-36*, Alipure, 1937, pp. 21, 23,28.

১৭. *Government of Bengal: Education Department,* Education proceedings no. 906-909, File-IG-66, December, 1937.

১৮. মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৮।

১৯. পটিয়ার সুচক্রদন্ডীর অধিবাসী ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীর (১৮৩২-১৮৯০ খ্রি.)। তিনি চট্টগ্রাম জিলা স্কুল হতে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং কলকাতা মেডিকেল হতে ডাক্তারি পাশ করে জেলা সিভিল সার্জন পদে যোগ দেন। ১৮৩১ সালে তিনি সিভিল সার্জন হিসেবে চট্টগ্রামে আসেন। তিনি চট্টগ্রামে ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান নেতা। তাঁর চতুর্থ কন্যা কুমুদিনী চট্টগ্রামের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট।

২০. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), হাজার বছরের চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫, পৃ-১৯১

২১. জে.এম. সেনগুপ্ত (১৮৫০-১৯১৯ খ্রি.) বর্তমান চন্দনাইশ উপজেলার বরমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আইনজীবী, রাজনীতি, সমাজসেবক হিসেবে চট্টগ্রাম প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তিনি চট্টগ্রাম শহরে জে.এম.সেন হল ও ওল্ডহ্যাম ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া নিজ গ্রামে স্ত্রীর নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য হাসপাতাল নির্মাণ করেন।

২২. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯২।

২৩. মো. আব্দুল্লাহ আল মাসুম, *বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি (১৮৮৫-১৯২১)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০৭, পৃ-১৯২।

২৪. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯২।

২৫. *তদেব*, পৃ. ১৯৩।

২৬. *তদেব।*

২৭. *তদেব*।

২৮. *তদেব*।

২৯. কমলেশ দাশ গুপ্ত, *প্রাচীন চট্টগ্রাম ও সেকালের হিন্দু সমাজ*, চট্টগ্রাম, ২০১৮, পৃ. ১৫২।

৩০. *তদেব*।

৩১. *অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য*।

৩২. ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামে শিক্ষা সাধনা*, চট্টগ্রাম, ১৯৮৪, পৃ. ২৩।

৩৩. *তদেব*।

৩৪. *তদেব*, পৃ. ৬৭।

৩৫. চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার অগ্রদূত আসমা খাতুন চট্টগ্রাম শহরের ধানিয়াল পাড়ায় ১৮৯৮ খ্রি. এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ খ্রি. তিনি ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হন। চট্টগ্রামে নারী শিক্ষায় অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেন। ১৯৮২ খ্রি. এই মহিয়সী নারী মৃত্যুবরণ করেন।

৩৬. বি.এ আজাদ ইসলামাবাদী (সম্পাদিত), *চট্টগ্রাম স্মরণী*, চট্টগ্রাম, ১৯৮৭, পৃ. ১১।

৩৭. *তদেব*।

৩৮.সৈয়দা আম্বিয়া খাতুন তৎকালীন সময়ে চট্টগ্রামে নারী মহলে নারী শিক্ষা আন্দোলনের জন্য পরিচিতি পান। তিনি ডা. খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

৩৯. ওহীদুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪।

৪০. *তদেব*।

৪১. *তদেব*।

৪২.আবদুল অদুদ সেরেস্তাদার হাটহাজারী থানার ফরহাদাবাদ ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাটির হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। চট্টগ্রামে মুসলমানদের প্রথম ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ইসলামাবাদ ঢাউন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা।

৪৩.খলিলুর রহমান ১৮৯৩ খ্রি. বাঁশখালীর জলদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র হিসেবে ১৯০৩ খ্রি. নিম্ন প্রাথমিক বৃত্তি থেকে ১৯১৯ খ্রি. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে পাশ করেন। ১৯২০ খ্রি. চট্টগ্রাম কলেজের প্রভাষক নিযুক্ত হন। তিনি চন্দনপুরার মনসুর উদ্দীনের কন্য আম্বিয়া খাতুনকে বিবাহ করেন। ১৯৩০ খ্রি. হুগলী কলেজ বদলী হন।

৪৪. *চট্টগ্রাম পৌরসভার ১৫০ বছর পূর্তি স্মারক গ্রন্থ*, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ২০১৩।

৪৫. *তদেব*।

৪৬. *তদেব।*

৪৭. *তদেব*।

৪৮. *চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন অফিস সূত্রে প্রাপ্ত।*

৪৯. *চট্টগ্রাম জেলা অফিসের প্রাপ্ত তথ্য।*

৫০.*Statistical Pocket Book Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics* Dhaka, 2002, P. 343.

৫১.*বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এন্ড স্টটিসটিকস রিপোর্ট*, ২০১৯।

৫২. *Bangladesh Bureau of Educational Information and statistical Report, Dhaka,* 2019

৫৩.চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

৫৪.*তদেব* ।

৫৫.*তদেব* ।

৫৬.এনায়েত বাজার মহিলা কলেজটি এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ব্যাংকার আবদুল কাদের, সাহিত্যিক মাহবুবুল আলম চৌধুরী, প্রধান শিক্ষিকা প্রণতি সেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এবং তৎকালীন জেলা প্রশাসক মোজাম্মেল হকের সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত): *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৬।

৫৭. *চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ অফিস সূত্রে প্রাপ্ত।*

৫৮. *কাটির হাট মহিলা কলেজ অফিস সূত্রে প্রাপ্ত।*

৫৯. চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার অগ্রদূত আসমা খাতুন চট্টগ্রাম শহরের ধানিয়াল পাড়ায় ১৮৯৮ খ্রি. এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ খ্রি. তিনি ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হন। চট্টগ্রামে নারী শিক্ষায় অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেন। ১৯৮২ খ্রি. এই মহিয়সী নারী মৃত্যুবরণ করেন।

৬০. বি.এ আজাদ ইসলামাবাদী (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১।

৬১. ওহীদুল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০।

৬২. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬।

৬৩. *তদেব*।

৬৪. *তদেব*, পৃ. ১৯৬।

৬৫. *চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট অফিস সূত্রে প্রাপ্ত।*

৬৬.*এ.ইউ.ডব্লিউ অফিসে সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।*

৬৭.চেরি ব্লেয়ার (Cherie Blair) জন্ম, ১৯৫৪ খ্রি.। ব্রিটিশ ব্যারিস্টার, শিক্ষক ও লেখক। সাবেক চান্সেলর লিভারপুল জন মোরস ইউনিভার্সিটি (১৯৯৯-২০০৬)। সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের (১৯৯৭-২০০৭) স্ত্রী।

৬৮.*এ.ইউ.ডব্লিউ অফিসে সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।*

ষষ্ঠ অধ্যায়

চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার প্রকার, ধরণ কাঠামো ও অগ্রগতি

ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ (১৮১৭-৪৯ খ্রি.) এবং তাদের উৎসাহে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার প্রকৃত সূচনা ঘটে। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার (১৮৪৯ খ্রি.) মাধ্যমে নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু হয়। পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক নারী শিক্ষার সূচনায় ঢাকা ইডেন গার্লস স্কুল (১৮৭৮ খ্রি.) ও কলেজ (১৯২৬ খ্রি.), চট্টগ্রামে ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীর মধ্য বালিকা বিদ্যালয় (১৮৭৮ খ্রি.) এবং ময়মনসিংহের আলেক্সান্ডার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তথাপি বিশ শতকের শুরুতেও নারী শিক্ষার অগ্রগতি খুব একটা হয়নি। এ সম্পর্কে ড. সোনিয়া নিশাত আমিন বলেন:

> 'Before 1906 there were three high schools for girls in East Bengal: Eden in Dhaka, Khastagir in Chittagong and Alexander in Mymensingh, Official records, however, declared that the state of education in this region was deplorable'.[১]

তারপরও সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় চট্টগ্রামেও নারী শিক্ষা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগ এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ধীরে ধীরে বিস্তৃতি ঘটে। চট্টগ্রামের অতি রক্ষণশীল মুসলিম সমাজেও নারীর আধুনিক শিক্ষার প্রতি উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম মহিয়সী নারীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্কুল প্রতিষ্ঠা সমাজকে আলোড়িত করেছে এবং নারীর শিক্ষায় অগ্রগতি হয়েছে। বৃটিশ আমল, পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুতে ও নারীর পঠন-পাঠনের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অপ্রতুল ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও বেসরকারি উদ্যোগে নূতন নূতন নারী স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সরকারের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং 'শিক্ষা উপবৃত্তি' ব্যবস্থা প্রভৃতি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা বাংলাদেশ তথা চট্টগ্রাম জেলায় নারীর আধুনিক শিক্ষার গতিকে কাঙ্খিত লক্ষ্য মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে।

৬.১ নারী শিক্ষার প্রকরণঃ

বাংলাদেশের বর্তমান আধুনিক শিক্ষার কাঠামোয় সরকার নারী শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করেছে। নারী সমাজকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য বিবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে (যা আমার থিসিসের তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে)। চট্টগ্রাম জেলাসহ সমগ্র বাংলাদেশে নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে এবং সহশিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে।

৬.১.১ চট্টগ্রাম জেলায় নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

১৮৭৮ সালে ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীর মধ্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯০৭ সালে এটি ডা. খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।[২] মূলত এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই চট্টগ্রামে আধুনিক নারী শিক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। বিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত অর্পণাচরণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (১৯২৭), কৃষ্ণ কুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯২৭) এবং কুসুম কুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় চট্টগ্রামে নারী শিক্ষাকে গতিময় করে। অপরদিকে মুসলিম সমাজ সেবক ইব্রাহিম কন্ট্রাক্টর ১৯১৩ সালে নিজ গ্রামে (দেওয়ান হাটের পশ্চিম) একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর তিন কন্যাকে ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি করান।[৩] তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাশ করা ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করারও ঘোষণা দেন।

পরবর্তীতে পাঠানটুলি খান সাহেব বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৪), ধানিয়াল পাড়ায় আসমা খাতুনের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠে, যার বর্তমান নাম আসমা খাতুন সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। আরেকজন মহিয়সী নারী আম্বিয়া খাতুনের পৃষ্ঠপোষকতায় চন্দনপুরা মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠে, যার বর্তমান নাম গুল এজার বেগম সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। চট্টগ্রাম শহরে নারী শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান চট্টগ্রাম পৌর সভার চেয়ারম্যান নুর আহমদ (১৯২১-১৯৫৪ খ্রি.)। তিনি চট্টগ্রাম পৌরসভায় ৩২টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ১৯৩২ সালে বালিকাদের জন্য শিক্ষা অবৈতনিক এবং ১৯৪২ সালে বাধ্যতামূলক করেন।[৪] (এসব বিষয়াবলী পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে)।

১৯৬২ সালে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (বাওয়া) প্রতিষ্ঠিত হয়। যা পরবর্তীতে কলেজে (১৯৯৯) রূপান্তরিত হয়েছে। স্বাধীনতাত্তোরকালে চট্টগ্রাম শহরে নারী শিক্ষায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এ.বি.এম মহিউদ্দীন চৌধুরী (১৯৯৪-২০১০)। তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ৪৪টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৩টি কলেজ, ৬টি কিন্ডার গার্টেন, ৪টি নৈশ বিদ্যালয়, ৪টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, ৪১০টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ৭টি সংস্কৃত ঠোল, ৪টি কম্পিউটার কলেজ, একটি আন্তর্জাতিক মানের মিডওয়াইফারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করেছেন।[৫] চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধীনে বর্তমানে ২৪টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে।[৬] চট্টগ্রামের নারী শিক্ষার উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাহাড়িকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, অর্পণাচরণ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সেন্ট স্কলাস্টিকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কৃষ্ণ কুমারী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গুল-এ-জার বেগম সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জামালখান কুসুম কুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বালুয়ারদিঘী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আলকরণ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাগমনিরাম এস.কে সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাথরঘাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৭]

বিশ শতকে চট্টগ্রাম শহরের বাইরে উত্তর চট্টগ্রাম এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামেও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নাজির হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় উত্তর চট্টগ্রামের প্রাচীন বালিকা বিদ্যালয়সমূহের অন্যতম। দক্ষিণ চট্টগ্রামে প্রাচীন বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে সাতকানিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় অন্যতম। ১৯৯৯ সালের পরিসংখ্যানে চট্টগ্রাম বিভাগে ২৩৪৯টি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল।[৭.ক] বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলায় ৮৮টি বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে। তৎমধ্যে উত্তর চট্টগ্রামে ২৭টি, দক্ষিণ চট্টগ্রামে ২৭টি এবং চট্টগ্রাম মহানগরে ৩৪টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম পাওয়া যায়।[৮] এসব বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে নাজির হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নানুপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কাটির হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পদুয়া সম্মিলনী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সাতকানিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হাবিলাশদ্বীপ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সীতাকুন্ড বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মিরসরাই বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আমিরাবাদ জনকল্যাণ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাছবাড়িয়া মমতাজ বেগম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চরণদ্বীপ দেওয়ান বিবি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কামাল উদ্দিন চৌধুরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আনোয়ারা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।[৯]

চট্টগ্রামে নারীর উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষানুরাগীরা মহিলা কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন (পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে)। এসব কলেজ সমূহের মধ্যে কাটির হাট মহিলা কলেজ (১৯৮৫) উত্তর চট্টগ্রামের প্রথম মহিলা কলেজ। চট্টগ্রাম জেলার মহিলা কলেজ সমূহের মধ্যে কাটির হাট মহিলা কলেজ, বাঁশখালী মহিলা কলেজ, আমানত সাফা বদরুন্নেছা মহিলা কলেজ, আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ, এনায়েত বাজার মহিলা কলেজ, হালিশহর মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারী মহিলা কলেজ, কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ, চুনতি মহিলা কলেজ, জোরারগঞ্জ মহিলা কলেজ, খলিলুর রহমান মহিলা কলেজ, রাঙ্গুনিয়া মহিলা কলেজ, অগ্রসর মহিলা কলেজ, আবুল কাশেম হায়দার মহিলা কলেজ, সাতকানিয়া আদর্শ মহিলা কলেজ, সীতাকুন্ড মহিলা কলেজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১০]

৬.১.২ চট্টগ্রামে সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

চট্টগ্রাম জেলায় নারীদের পৃথক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সহশিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। অধিকাংশ স্কুল ও কলেজে সহশিক্ষার মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। চট্টগ্রামে সহশিক্ষার উচ্চ বিবদ্যালয়সমূহের মধ্যে গহিরা উচ্চ বিদ্যালয়, মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়, রোসাংগিরি উচ্চ বিদ্যালয়, ফটিকছড়ি করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়, পটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সাতকানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, আনোয়ারা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, গাছবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়, কাট্টলী নুরুল হক উচ্চ বিদ্যালয়, হাটহাজারী পাবর্তী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ফৌজদার হাট কে.এম উচ্চ বিদ্যালয়, সীতাকুন্ড উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গুনিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চট্টগ্রাম জেলায় সহশিক্ষার স্কুল এন্ড কলেজ এবং কলেজ সমূহের মধ্যে ইস্পাহানী স্কুল এন্ড কলেজ, চ.বি স্কুল এন্ড কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, বেপজা স্কুল এন্ড কলেজ, মেরিন একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম বন্দর স্কুল এন্ড কলেজ, প্রভৃতি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। চট্টগ্রামের সহশিক্ষার কলেজ সমূহের মধ্যে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ, হাজী মুহাম্মদ মহসিন সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম সিটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ওমরগনি এস.ই.এস কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজ, হাজেরা-তজু ডিগ্রী কলেজ, পটিয়া সরকারী কলেজ, সাতকানিয়া সরকারী কলেজ, হাটহাজারী সরকারী কলেজ, নাজিরহাট কলেজ, ফটিকছড়ি ডিগ্রি কলেজ, রাউজান কলেজ, গহিরা কলেজ, মোস্তাফিজুর রহমান ডিগ্রি কলেজ, সীতাকুন্ড ডিগ্রি কলেজ, রাঙ্গুনিয়া

কলেজ, নিজামপুর কলেজ, বার আউলিয়া কলেজ, গাছবাড়িয়া সরকারী কলেজ, স্যার আশুতোষ সরকারী কলেজ, বাঁশখালী কলেজ, বাকলিয়া সরকারী কলেজ, আনোয়ারা ডিগ্রি কলেজ, উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এসকল সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহশিক্ষায় পাঠদান করা হয় এবং নারী শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখছে (আমার পঞ্চম অধ্যায়ে চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিশদভাবে আলোচনা করেছি)।

৬.১.৩ চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার প্রকৃতিঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত চট্টগ্রাম জেলার আয়তন ৫২৮২.৯৮ বর্গ কি.মি.। ২০০১ সালে চট্টগ্রাম জেলার জনসংখ্যা ৬৬১২১৪০। তৎমধ্যে পুরুষ ৩৪৭৭১৭৮ জন এবং মহিলা ৩১৩৪৯৬২ জন। শিক্ষার হার (৫ বছরের উর্ধ্বে) পুরুষ ৫৬.৩৭% এবং নারী ৪৭.৯০%।[১১] ১৯৮১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত শিক্ষার হার নিম্নে তুলে ধরা হল।

সারণি-১[১২]: চট্টগ্রামে শিক্ষার অগ্রগতি (৫ বৎসরের উর্ধ্বে)

অবস্থান	শ্রেণী	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
গ্রাম	পুরুষ	৩৪.৪৭	৩৯.১৬	৪৯.১২
	নারী	১৮.২০	২৭.১২	৪২.৩৭
শহর	পুরুষ	৪৭.৬২	৫৪.৭৯	৬২.৫৯
	নারী	২৫.৮৩	৩৯.৫৬	৫৩.৪৮

সূত্রঃ *Bangladesh Population Census, 2001, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka*, 2009.

উপরোক্ত সারণিতে চট্টগ্রাম জেলার গ্রাম ও শহরে শিক্ষার তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায় যে, শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে। তবে আশানুরূপ নয়। নারীর শিক্ষার হার পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। চট্টগ্রাম জেলায় ১৯৬১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত শিক্ষার হার নিম্নোক্ত সারণিতে দেখানো হল।

সারণি-২[১৩]: চট্টগ্রাম জেলায় ৫ বছর উর্ধ্বে শিক্ষার হার (১৯৬১-২০০১)

অবস্থান	জিলা			শহর			গ্রাম		
	নারী-পুরুষ(%)	পুরুষ(%)	নারী(%)	নারী-পুরুষ(%)	পুরুষ(%)	নারী(%)	নারী-পুরুষ(%)	পুরুষ(%)	নারী(%)
২০০১	৫৪.৪	৫৬.৪	৪৭.৯	৫৮.৫	৬২.৬	৫৩.৫	৪৫.৮	৪৯.১	৪২.৪
১৯৯১	৪০.২	৪৬.৯	৩২.৫	৪৮.২	৫৪.৮	৩৯.৬	৩৩.২	৩৯.২	২৭.১
১৯৮১	৩১.১	৩৯.৯	২০.৭	৩৯.০	৪৭.৬	২৫.৮	২৬.৪	৩৪.৫	১৮.২
১৯৭৪	৩১.৪	৪২.৭	১৭.৭	৪১.১	৫০.৫	২৬.১	২৮.০	৩৯.৫	১৫.৪
১৯৬১	২৯.৩	৪২.০	১৪.৫	৪৮.০	৫৬.৪	৩০.৬	২৫.৯	৩৮.৫	১২.৫

সূত্রঃ *Bangladesh Population Census, 2001, Zila Series, Zilla: Chittagong, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka, 2009.*

এই সারণিতে বিগত ৫০ বছরের শিক্ষার হার ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে নারী শিক্ষার হার ২০০১-এ ৪২.৪% হয়েছে, যেখানে ১৯৬১ তে ছিল মাত্র ১২.৫%।

অপরদিকে ২০০১ সালে স্কুলে উপস্থিতির হার পর্যালোচনা করলেও বালিকাদের শিক্ষার সার্বিক চিত্র পাওয়া যায়।

সারণি-৩[১৪]: ২০০১ সালে ৫ থেকে ২৪ বৎসরে ছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিতির হার

বয়স ভিত্তিক গ্রুপ	জিলা		শহর		গ্রাম	
	ছাত্রী সংখ্যা	শতকরা হার	ছাত্রী সংখ্যা	শতকরা হার	ছাত্রী সংখ্যা	শতকরা হার
মোট ছাত্রী	৬৩৭৮৮২	৪১.৫৪	৩০৯০২২	৩৯.৫৪	৩২৮৮৬০	৪৩.৬২
৫-৯	১৯৪৯৫০	৫০.০২	৮৯৪৩৭	৫০.৫২	১০৫৫১৩	৪৯.৬১
১০-১৪	২৭৫৯০৭	৬৪.১৭	১৩০৬৩৬	৬১.৯৭	১৪৫২৭১	৬৬.২৮
১৫-১৯	১৩৫৬১৭	৩৬.৬৪	৬৮১৮৭	৩৪.১৮	৬৭৪৩০	৩৯.৫৩
২০-২৪	৩১৪০৮	৯.০৯	২০৭৬২	১০.৬৯	১০৬৪৬	৭.০৩

সূত্র: *Bangladesh Population Census, 2001, Zila Series, Zilla: Chittagong, Dhaka, 2009.*

উপরের সারণিতে ২০০১ সালে বয়স ভিত্তিক মেয়ে শিশুদের (৫-৯) স্কুল উপস্থিতির হার ৪১.৫৪%। কিন্তু ২০-২৪ গ্রুপে উপস্থিতির হার ৯.০৯% মাত্র। এই বয়স ভিত্তিক গ্রুপে শহরে বালিকাদের উপস্থিতির হার ১০.৬৯ এবং গ্রামে ৭.০৩। বাল্য বিবাহ ও আর্থিক অস্বচ্ছলতা এসব ছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিতির হার নিম্নগামীতার জন্য দায়ী।

এখন আমরা ১৯৯১ ও ২০০১ সালে চট্টগ্রামে ৫ বৎসরের উর্ধ্বে ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বোচ্চ পড়ালেখার ধারাটি পর্যালোচনা করব। নিম্নের সারণিতে ৫ বছর উর্ধ্বে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার চিত্র দেখানো হল।

সারণি-৪[১৫]: ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বোচ্চ ক্লাসে উত্তীর্ণ (১৯৯১ ও ২০০১)

বিষয়	১৯৯১			২০০১		
	ছাত্র-ছাত্রী (%)	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)	ছাত্র-ছাত্রী (%)	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)
স্কুল গামী নয়	৪৬.৬১	৩৯.৪৭	৫৪.৮৪	৩১.৮৮	২৭.৭৭	৩৬.৪৩
১ম-৪র্থ শ্রেণী	১৯.৬৩	২০.৫৫	১৮.৫৮	২০.৭৪	২১.১৮	২০.২৬
পঞ্চম শ্রেণী	৮.৯৩	৯.৩৯	৮.৩৯	১১.৬৭	১১.৯২	১১.৩৯
ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণী	৬.৬৭	৭.২৩	৬.০১	৮.৯৭	৯.০১	৮.৯২
অষ্টম শ্রেণী	৪.১২	৪.৭৮	৩.৩৮	৬.৪২	৬.৫৪	৬.৩০
নবম শ্রেণী	৩.৪৩	৪.০২	২.৭৬	৫.২০	৫.১৫	৫.২৭
এসএসসি/সমমান	৬.৩৮	৮.১৭	৪.৩০	৮.৭০	৯.৬২	৭.৬৭
এইচএসসি/সমমান	২.৬১	৩.৮২	১.২০	৩.৫৭	৪.৬০	২.৪৩
স্নাতক/সমমান	১.২৪	১.৯৫	০.৪২	২.১৯	৩.২১	১.০৬
মাস্টার্স এবং তর্দুধ	০.৩৮	০.৬২	০.১২	০.৬৫	১.০০	০.২৬

সূত্রঃ *Bangladesh Population Census, 2001, Zila Series, Dhaka, 2009.*

এ সারণিতে চট্টগ্রামের সাধারণ জনসাধারণের শিক্ষা গ্রহণ এবং উপরে ক্লাসে শিক্ষা গ্রহণ ও ঝড়ে পড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এখানেও নারী শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়ার চিত্র সুস্পষ্ট।

পূর্বের সারণি সমূহে চট্টগ্রাম জেলায় শিক্ষা তথা নারী শিক্ষার হার ও অগ্রগতি উঠে এসেছে। আমি নিম্নের সারণিতে ২০০১ সালে নারী ও পুরুষের স্কুলে গমণের প্রবণতা তুলে ধরছি।

সারণি-৫[১৬]: ছেলে-মেয়ে স্কুলে গমণের বয়স ও সংখ্যা, ২০০১

স্কুলে গমণের বয়স	সাধারণ			কারিগরি/ ভোকেশনাল			ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান		
	নারী-পুরুষ	পুরুষ	নারী	নারী-পুরুষ	পুরুষ	নারী	নারী-পুরুষ	পুরুষ	নারী
১-৪	১১৫৪৬৩১	৬১২৬৩২	৫৪১৯৯৯	-	-	-	৫৯৯৬৭	৩৬৫৪৪	১৮৪২৩
৫-৯	১৮৩৩১৩৫	৯৬৪৬৮৮	৮৬৮৪৮৭	-	-	-	৪৬৮০৪	৩৩৭১৯	১৩০৮৫
১-৯	-	-	-	৬১৯৩	৪৬৮৯	১৫০৪	-	-	-
১০-১১	৪৮৮১০৮	২৭৯২৫৫	২০৮৮৫৩	৫০৩৩	৩৯৫১	১০৮২	১৪৬২৪	১২১৫৪	২৪৭০
১২-১৩	১৯৩৯৩০	১২৮১৮৪	৬৫৭৪৬	৭১৯৯	৬২০৭	৯৯২	৭৪০৮	৬৯৪৪	৪৬৪
১৪	১০২১৩৪	৭৭৬৭৩	২৪৪৬১	৩১৮৩	২৮০০	৩৮৩	৪৪০২	৪২২৮	১৭৪
১৫+	৪৮৪২৯	৩৭৬০৪	১০৮২৫	৪১৩৫	৩৬৮৭	৪৪৮	৩৪৮০	৩৩৬৭	১১৩

সূত্র: *Bangladesh Population Census, 2001, Zila: Chittagong, Dhaka, 2009.*

এ সারণির তথ্যমতে চট্টগ্রামের নারী পুরুষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমণের প্রবণতা আশা ব্যঞ্জক নয়।

চট্টগ্রামে নারী ও পুরুষের উপজেলা/থানা পর্যায়ে শিক্ষার হার আমি নিম্নের সারণিতে তুলে ধরছি।

সারণি-৬[১৭]: চট্টগ্রাম জেলার উপজেলা/থানা ওয়ারি শিক্ষার হার (সাত বৎসরের উর্ধ্বে)

উপজেলা/থানা	১৯৯১			২০০১		
	নারী-পুরুষ (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	নারী-পুরুষ (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)
আনোয়ারা	৩০.৬	৩৮.৪	২২.০	৪৭.২	৫২.৪	৪১.৮
বাকলিয়া	-	-	-	৫০.৫	৫৪.৪	৪৫.৪
বাঁশখালী	২২.৭	২৮.৩	১৬.৬	২৯.৫	৩৩.৮	২৪.৮
বায়েজীদ	-	-	-	৫৯.৫	৬৩.৯	৫৩.৬
বোয়ালখালী	৪৮.৫	৫৪.৫	৪২.০	৭১.৮	৭৫.৩	৬৭.৯
চন্দনাইশ	৩৩.৯	৪০.১	২৭.৪	৫৬.৫	৬০.৬	৫২.২
চাঁন্দগাও	৪৬.৫	৫১.৮	৩৯.৩	৬২.৭	৬৬.৩	৫৮.৩
চট্টগ্রাম বন্দর	৫৬.৫	৬৩.৩	৪৬.৮	৭২.৬	৭৫.৩	৬৯.৩
ডবলমুরিং	৫৬.৬	৬২.২	৪৮.১	৬৩.১	৬৭.৯	৫৬.৮
ফটিকছড়ি	৩২.০	৩৭.৬	২৬.৪	৪৩.২	৪৬.২	৪০.০
হালিশহর	-	-	-	৬২.৪	৬৭.১	৫৬.৯
হাটহাজারী	৪৮.৩	৫৩.৯	৪২.৩	৫৭.৯	৬১.১	৫৪.৬
খুলশী	-	-	-	৬০.৩	৫৬.৮	৫৩.২
কতোয়ালী	৭১.৫	৭৪.৫	৬৬.১	৭৯.৬	৮২.৪	৭৫.৭
লোহাগাড়া	৩৪.০	৪২.৪	২৫.৩	৪৪.৬	৪৮.৪	৪০.৮
মিরসরাই	৩৭.২	৪৫.১	২৯.৩	৫২.০	৫৬.৩	৪৭.৯
পাহাড়তলী	৫৪.০	৬০.৭	৪৪.৫	৬৭.৩	৭১.৭	৬১.৮
পাঁচলাইশ	৫৯.৩	৫৬.৫	৪৯.৭	৬৯.২	৭৩৯	৬২.৮
পতেঙ্গা	-	-	-	৬০.৩	৬৫.২	৫৪.৫
পটিয়া	৪৪.৩	৫১.৫	৩৬.৪	৫৯.১	৬৩.৫	৫৪.৩
রাঙ্গুনিয়া	৩৫.৪	৪২.০	২৮.২	৫৪.৩	৫৭.৪	৫০.৯
রাউজান	৫২.৫	৫৮.৪	৪৬.৬	৬৪.১	৬৭.০	৬১.৩
সন্দ্বীপ	৩৫.০	৪০.৮	২৯.৫	৪৬.১	৪৮.৬	৪৩.৯
সাতকানিয়া	৩০.৪	৩৭.৬	২৩.৩	৪৬.২	৫০.০	৪২.৬
সীতাকুন্ড	৪১.১	৪৯.৩	৩০.৬	৫৪.৬	৫৯.৪	৪৮.৭

সূত্রঃ Bangladesh Population Census, 2001, Community Series, Zila: Chittagong, Dhaka, 2009.

উপরোক্ত সারণির তথ্য মতে ২০০১ সালে চট্টগ্রামে নারী শিক্ষায় চট্টগ্রাম মহানগরে সর্বোচ্চ হার কতোয়ালী থানায় (৭৫.৭%) এবং সর্বনিম্ন হার বাকলিয়া থানায় (৪৫.৪%)। চট্টগ্রাম উত্তর জেলায় নারী শিক্ষার সর্বোচ্চ হার রাউজান উপজেলায় (৬১.৩%) এবং সর্বনিম্ন হার ফটিকছড়ি উপজেলায় (৪০.০%)। অপরদিকে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলায় সর্বোচ্চ নারী শিক্ষার হার বোয়ালখালী উপজেলার (৬৭.৯%) এবং সর্বনিম্ন হার বাঁশখালী উপজেলা (২৪.৮%)। সমগ্র চট্টগ্রাম জেলায় সর্বনিম্ন নারী শিক্ষার হার বাঁশখালী, ফটিকছড়ি ও লোহাগাড়া (৪০.৮%) উপজেলা। এসকল উপজেলায় মূলত: ধর্মীয় প্রভাব সমাজে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান, যা নারী শিক্ষায় অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

৬.২ নারীর ক্ষমতায়নঃ

আধুনিক কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে নারীকে সাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব। নারীর কর্মক্ষেত্রকে নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে দেশে অর্ধেক নারী সমাজকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পৃক্ত করা যাবে। নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান উপদান হচ্ছে আধুনিক শিক্ষিত নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার সুযোগ প্রদান করা। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালের প্রথম সংসদেই ১৫টি সংরক্ষিত নারী আসন রাখেন। বর্তমানে সংসদে এই আসন সংখ্যা ৫০। চট্টগ্রামের নারীরাও সংরক্ষিত নারী আসনে চট্টগ্রাম অঞ্চলের নারীদের প্রতিনিধিত্ব করছে। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সরাসরি ভোটে নারী প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। ২০০৯ সালে উপজেলা নির্বাচনে নারী প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ২০০৮ সালে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও প্রত্যক্ষ ভোটে নারী প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন (যা পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাজনীতি অংশে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে)। ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে নারী ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। চট্টগ্রাম জেলায়ও ইউ.পি নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এরূপ ব্যবস্থা রয়েছে, যা নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করেছে।

অপরদিকে চট্টগ্রামের শিক্ষিত কর্মজীবী মহিলাগণ নিজের কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চট্টগ্রামের নারীরা সুনামের সাথে কাজ করছেন। অনেকেই প্রধান শিক্ষিকা, অধ্যক্ষা প্রভৃতি পদ অলংকৃত করছেন এবং দক্ষতার সাথে নিজের অর্পিত দায়িত্ব

সম্পন্ন করছেন। বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক সমূহেও চট্টগ্রামের অসংখ্য মহিলা ব্যাংকার কাজ করছেন। তাদের মেধা ও কর্মদক্ষতা চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। তাছাড়া চিকিৎসক, নার্স, সাংবাদিক, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী সহ নানা পেশায় চট্টগ্রামের নারীগণ কর্মদক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন এবং বালাদেশের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখছেন।

চট্টগ্রামের নারীরা বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন সরকারী অফিসের উচ্চ পদে নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী শেখ মোমেনা মনি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন।[১৮] চট্টগ্রামের নারীরা প্রশাসন ক্যাডারেও কর্মরত আছেন। কাটিরহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী ইয়াসমিন পারভীন তিবরিজী বান্দরবান জেলার প্রথম মহিলা ডি.সি হিসেবে কর্মরত আছেন। ইতোপূর্বে তিনি সি.ডি.এ এর সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী সাবিকুন নাহার মুন্নী এ.ডি.সি হিসেবে কর্মরত আছেন। তারা সকলে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

বাংলাদেশ সরকারের পুলিশ বাহিনীতেও চট্টগ্রামের নারীরা বিভিন্ন পদে কর্মরত আছেন। হাটহাজারী থানার ফরহাদাবাদ ইউনিয়নের এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী সম্প্রতি বি.সি.এস পুলিশে সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছেন। বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও সেনাবাহিনীতেও চট্টগ্রামের নারীরা কর্মরত আছেন। খাস্তগীর স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ডা. সুরাইয়া রহমান।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী শাহীন আকতার বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের যুগ্ম পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন।[১৯] এভাবে দেখা যাবে বাংলাদেশে প্রতিটি সেক্টরের সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং এনজিওতে চট্টগ্রামের অসংখ্য নারী দক্ষতার সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন।

৬.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অবদান

চট্টগ্রামের নারীরা কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

৬.৩.১ কবি ও সাহিত্যিক

প্রাচীন পদ্যকার হিসেবে হীরামনি নামে একজন মহিলার পরিচয় পাওয়া যায়। বোয়ালখালী থানার একজন বিখ্যাত মহিলা কবি হরিতৃপা চৌধুরী।[২০] আঠারো শতকের প্রথমার্ধে চট্টগ্রামের অর্ধ শতাধিক কাব্য কবিতা রচয়িতা সন্ধান পাওয়া যায়। এসকল কাব্য কবিতা চট্টগ্রামের নারী ও পুরুষরা রচনা করেন। মহাকবি নবীন চন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯ খ্রি.) উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র। পুরুষদের পাশাপাশি চট্টগ্রামের নারীরাও আধুনিক সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা করেন এবং কতিপয় নারী ব্যক্তিত্ব নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এসব নারী ব্যক্তিত্বের মধ্যে উর্দু লেখিকা রাহাত আরা, বেগম রহিমুন্নেসা, কবি আইনুন্নাহার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বিখ্যা উর্দু গল্প লেখিকা রাহাত আরা বেগম (১৯১০-১৯৪৯ খ্রি.) প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দীনের কন্যা। তিনি 'ইনকিলাব', 'সাহাব কি পুকার', 'বাঁশরী কি আওয়াজ', 'প্রেমী', 'দিল নাওয়াজ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[২১] চট্টগ্রামের শোলকবহরে জন্ম নেওয়া কবি রহিমুন্নিসার হস্তাক্ষর খুবই সুন্দর ছিল। তাঁর রচিত 'ভ্রাতৃবিলাপ' নামক একটি বারোমাসী ও 'দুরদর্না বিলাপ' কাব্যের খন্ডিতাংশ পাওয়া যায়।[২২] বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিপ্লবী কাজেম আলী মাস্টারের নাতনি কবি আইনুন্নাহার বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।[২৩] বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের পরিমন্ডলে আধুনিক কালের সাহিত্যে চট্টগ্রামের কবিদের অবদান অনস্বীকার্য। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে নারীদের মধ্যে কাজ চর্চায় যারা এগিয়ে, আসেন তাদের মধ্যে উমরতুল ফজল ও শবনম খান শেরওয়ানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কালে শামসুন নাহার, নুরুন্নাহার, জিনাত আরা রফিক, মর্জিনা আখতার প্রমুখ মহিলা কবি কাব্য চর্চা করেন।[২৪] বেগম মুশতারী শফি সম্পাদিত 'বান্ধবী' এবং লেখিকা সংঘ নারীদের সাহিত্য রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।[২৫] বাংলাদেশের কবিতায় আশি ও নব্বইয়ের দশকের

কবিতায় প্রেম, দ্রোহ, সৌন্দর্য এমনকি উত্তরাধুনিকতার চেতনায় এগিয়ে যায়। এই সময়ে চট্টগ্রামেও সাহিত্য চর্চায় নব উদ্যোম দেখা যায়। বেগম ফজিলতুন কদর, নীলুফার জহুর, ফাহমিদা আমিন, নুরুন্নাহার শিরীন, সেলিনা শেলী, নাসরিন রহমান, আলেয়া চৌধুরী, সালমা চৌধুরী, রমা চৌধুরী, রওশন জাহান রহমান, কবি ফরিদা ফরহাদ, মমতাজ সবুর, জোলেখা খাতুন, হোসনে আরা চৌধুরী, বাসনা গুন, দরিয়ানুর বেবী, শামীমা খান, বেগম রুনু সিদ্দিকী, আইনুন নাহার, সেলিমা সাবিহা, অধ্যাপিকা ফেরদৌস আরা আলীম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[২৬]

কথা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় চট্টগ্রামের নারী সমাজ অনন্য অবদান রেখেছেন। শিপ্রা দত্ত (কলকাতা কেন্দ্রিক) রচনা করেছেন বারটি উপন্যাস ও দুটি গল্প গ্রন্থ। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'চেনা-অচেনা', 'অধ্যাপিকার ডায়েরি', 'কালের ধ্বনি', 'নানা রং' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'কালের ঢেউ' ও 'নষ্ট লগ্ন' গল্প দু'টি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। উমরতুল ফজলের 'এক নদী দুই তীর', হেনা ইসলামের 'জীবন ফিরে এসো', বেগম মুশতারী শফির 'জীবনের রূপকথা' ও 'শংখচিলের কান্না', নীলুফার জহিরের 'কখনো কখনো', ফেরদৌস আরা আলীমের 'কালো জল সাদা ফেনা' প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রাচীন ও নবীন লেখিকাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী হচ্ছে ফজিলাতুল কদরের 'স্মৃতি গোলাপ', সৈয়দ রওশন আরা রহমানের 'স্মৃতি একরাশ যন্ত্রণা', জোলেখা খাতুনের 'হৃদয়ের গভীরে', শামসুন্নাহার পরাণের 'উপলব্ধির আঙ্গিনায়', রওশন জাহান রহমানের 'অনুভবে অনুভূতি', ফরিদা ফরহাদের 'নিঃশব্দ যন্ত্রণা', শিরীণ লতিফের 'স্বাতী নক্ষত্রের আলো' মারলিন ক্লারা 'পিনের পিয়া পিয়া ডাকে' এবং সেলিমা সাবিহ এর 'চর্তুদশ' প্রভৃতি। তাছাড়াও শাহেদা খান, আমেনা বেগম লুসি, শিপ্রা দস্তিদার, মীনাক্ষী সরকার প্রমুখ পত্র-পত্রিকা কথা সাহিত্য রচনায় যুক্ত আছেন।[২৭]

স্বাধীনতা-উত্তরকালে গ্রুপ থিয়েটার চর্চার ফলে নাট্য সাহিত্যের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। নতুন পটভূমিতে সৃষ্টিশীল বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অনেক নাট্যকারের আর্বিভাব ঘটে। এই পর্বের নাটক রচনায় প্রেম, ভালবাসা, দ্রোহ, ব্যঙ্গরসাত্মক ভাবে সমাজ জীবনের নানা অসংগতি, লোকজ সংস্কৃতি প্রভৃতি উঠে আসে। নব্বইয়ের দশকের নাটক রচনায় প্রতিবাদী রাজনৈতিক চরিত্রও প্রাধান্য পায়। বিশেষত স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকে উপজীব্য করেও অনেক নাটক রচিত হয়েছে। এসব ধারার নাটক রচনায় চট্টগ্রামের নাট্যকারগণ ও যুক্ত ছিলেন। সৈয়দা রওশন আরা রহমানসহ অনেক নারী এই সময়ে নাটক রচনা করেছেন।

আবার দেশী-বিদেশী গল্প অবলম্বনে নাট্যরূপ অনুবাদ ও রূপান্তর ধারায় খালেদা হানুম সহ অনেক নারী নাটক রচনায় যুক্ত হয়েছেন।[২৮]

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বন্দরনগীর চট্টগ্রামের শিশু সাহিত্যে পদচারণাও প্রাচীন। আধুনিক শিশু সাহিত্যে চট্টগ্রামের কৃতি লেখকদের অন্যতম উমরতুল ফজল। ১৯৩৫-৩৬ সালে কোহিনূর লাইব্রেরি হতে তাঁর 'পূর্ববঙ্গের গল্প কাহিনী' এবং জিয়াউননাহার বেগমের 'হাদিসের কাহিনী' প্রকাশিত হয়।[২৯] স্বাধীনতা পরবর্তী চট্টগ্রামে দৈনিক আজাদী, দৈনিক নয়া বাংলার 'ছোটদের পাতা'য় প্রকাশিত ছড়া, কবিতা, গল্প, রম্য রচনা প্রভৃতি শিশু সাহিত্যে ব্যাপক অবদান রেখেছে। এসকল পত্রিকা কেন্দ্রিক গড়ে উঠা শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যে সালমা চৌধুরী, ফাহমিদা আমিন, বেগম মুশতারী শফি, শেখ সিতারা জাহান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নারী ব্যক্তিত্ব। শেখ সিতারা জাহানের গল্প 'এক্কা দোক্কা', ফাহমিদা আমিনের উপন্যাস 'প্রজাপতি রং ছড়ায়' এবং বেগম মুশতারী শফির 'একগুচ্ছ গল্প তোমাদের জন্য' প্রভৃতি শিশু সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী।[৩০] চট্টগ্রামে ছোটদের জন্য বিশ্ব সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে যারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের অন্যতম শাহনাজ মুন্নী।[৩১]

চট্টগ্রামের সাহিত্য সমাজে সমাদৃত আরও মহিয়সী নারীরা হলেন ফজিলতুল কদর, রওশন জাহান রহমান, সাহেরা ইসমাঈল, আইনুন নাহার, মমতাজ সবুর, নুরুন নাহার বেগম, জুলেখা খাতুন, বেগম রুনু সিদ্দীকি, ফাতেমা আলী, সালমা চৌধুরী, জিনাত আজম, নীলুফার শামসুদ্দীন, দীপালী ভট্টাচার্য, নুরুন্নাহার শিরীন, ফেরদৌস আরা আলীম, নীলুফার জহুর, শ্যামলী মজুমদার, ড. লায়লা জামান, শুক্লা ইফতেখার, ফরিদা ফরহাদ, সাবিহা মুসা, আনোয়ারা আলম, মর্জিনা আখতার, এডভোকেট কামরুন নাহার, সেলিনা শেলী, মিনতি বিশ্বাস, বদরুননেসা সাজু, শাহীন আনোয়ার, ডেইজি মওদুদ, মৃণালিনী চক্রবর্তী, শিরীন আরা বেগম, শাহানা আকতার, মোরশেদা নাসির প্রমুখ।[৩১.ক]

৬.৩.২ রাজনীতি

ব্রিটিশাসল হতে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের রাজনীতিতে চট্টগ্রামের নারীদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

৬.৩.২.ক নারী ভোটাধিকার আন্দোলনঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে নারী ভোটাধিকার আন্দোলনের মাধ্যমেই ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলিম নারীরা সংঘবদ্ধভাবে রাজনীতি সক্রিয় হয়। ১৯১৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর মন্টেগু চেমসফোর্ড মিশনের নিকট ভারতের বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরা সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে স্মারক লিপি পেশ করেন।[৩২] বাঙালি মহিলার ভোটাধিকার প্রশ্নে আইন পরিষদে ব্রিটিশ মনোনীত সদস্যদের মাধ্যমে দাবী আদায়ের চেষ্টা করেন।[৩৩] ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে লর্ড লিটনের সাথে কামিনী রায়ের নেতৃত্বে মহিলা প্রতিনিধি দল সাক্ষাত করেন। এই মহিলা প্রতিনিধি দল ঢাকা, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য স্থানে স্থাপিত ছোট ছোট নারী সমিতির সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। ১৯২৩ সালে কলকাতা সিটি কর্পোরেশনে বাংলার মহিলারা সর্বপ্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এতে উৎসাহিত হয়ে সমগ্র বাংলায় ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবীতে নারীরা প্রচার কাজ শুরু করেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রামের মহিলা সংগঠনসমূহ এই দাবী সমর্থন করে।[৩৪] ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদ সীমিতভাবে নারী ভোটাধিকার অনুমোদন করে। ১৯৩৫ সালে সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবীতে নারীরা লিনলিথগো কমিটিকে স্মারক লিপি পেশ করেন বেগম হামিদ আলি এবং চট্টগ্রামের মেয়ে শামসুন্নাহার মাহমুদ।[৩৫] শামসুন্নাহার মাহমুদ[৩৬] নিখিল ভারত উইমেন্স কনফারেন্সেও যোগদান করেন।

৬.৩.২. খ. ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামঃ

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম কেন্দ্র চট্টগ্রাম। মাস্টারদা সূর্যসেনের (১৮৯৪-১৯৩৪) নেতৃত্ব সশস্ত্র বিপ্লব। চট্টগ্রাম বিদ্রোহ স্বাধীনতার ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে চট্টগ্রামের নারীরাও বিপ্লবের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে বীনা দাস, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, ইন্দুমতি সিংহ, পুষ্পসেন, নেলী সেন গুপ্ত, আরতি দত্ত, মোহিনী দেবী, সবিত্রী দেবী কুন্দ প্রভা সেন, নির্মলা চক্রবর্তী, সুহাসিনী রক্ষিত, নিরুপমা বড়ুয়া, মুকুল রানী দত্ত, শান্তি

দস্তিদার, শান্তি রাণী ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৩৭] বেথুন কলেজের ছাত্রী বীণা দাস[৩৮] ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হন। তিনি কলকাতার গর্ভনরকে গুলি করার অপরাধে দীর্ঘ দিন জেলে ছিলেন এবং মুক্তি পাওয়ার পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিতে যুক্ত হন। তিনি কংগ্রেসের দক্ষিণ কলিকাতার দীর্ঘ দিন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।[৩৯] প্রীতিলতা (১৯১১-১৯৩২) ১৪ জানুয়ারি ১৯৩২ ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধের মধ্যেও মাস্টারদা সূর্যসেনের জীবন রক্ষা এবং নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসতে সাহসী ভূমিকা পালন করেন।[৪০] ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব দেন এবং আট জন[৪১] সঙ্গীসহ ক্লাবটিতে সফলভাবে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি মারাত্মক ভাবে আহত হওয়ায় পুলিশের নিকট ধরা না পড়ার জন্য পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা নিরাপদে ফিরে আসেন। প্রীতিলতা বাংলার অগ্নিযুগের প্রথম নারী শহীদ।[৪২] কল্পনা দত্ত বিপ্লবীদের পাঠানো ফর্মুলা অনুসরণে গান-কটন তৈরি করেছেন এবং এসিড সংগ্রহ করে বিপ্লবীদের নিকট পাঠাতেন।[৪৩] তিনি ১৯৩৩ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় বন্দী হন।[৪৪] ১৯৩১ এর ডিসেম্বরে স্কুল ছাত্রী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর গুলিতে ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স কুমিল্লায় নিহত হন।[৪৫] সাবিত্রী দেবী বিপ্লবী সূর্যসেন ও তাঁর সহকর্মীদের আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে চার বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন। ইন্দুমতি সিং অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আসামীদের মামলা পরিচালনার অর্থ সংগ্রহ করার জন্য বাংলাসহ সমগ্র ভারত বর্ষে ঘুরেন। ১৯৩১ সালে অর্থ সংগ্রহের জন্য কুমিল্লা গমণ করলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেন।[৪৭] চট্টগ্রামের যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের ইংরেজ স্ত্রী নেলীগ্রে বাংলাদেশে আসেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এর আন্দোলনের অর্থ তহবিলে দুটি সোনার চুড়ি দান করেন।[৪৮] তাছাড়াও পুষ্প সেন, আরতি সেন এবং মোহিনী দেবী ও ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে যোগ দেন।[৪৯]

৬.৩.২.গ. ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধঃ

বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হচ্ছে ভাষা আন্দোলন। এ লক্ষ্য অর্জনে বাঙালি নারী সমাজ ও প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়। ভাষা সংগ্রাম ১৯৪৭ সাল হতে শুরু হলেও ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্তরূপ লাভ করে। এদিন পুলিশ ঢাকায় রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবী রাজপথে বিক্ষোভরত ছাত্র-জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। সালাম, বরকত, জাব্বার, রফিক ঘটনাস্থলেই শহীদ হন এবং ১৭ জন আহত হন এবং ৬২ জন গ্রেপ্তার হন।[৫০] ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলি বষর্ণের সংবাদ সমগ্র বাংলায় গণ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বাংলার নারী সমাজ ও বিভিন্নস্থানে বিক্ষোভ করে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানায় এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী সমর্থন করে। ঢাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলে গুলির সংবাদে চট্টগ্রামের

স্কুল ও কলেজ থেকে রাজপথে স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল শুরু হয় এবং মহিলারাও এসব মিছিলে যোগদান করে। খাস্তগীর গার্লস স্কুলের মেয়েরা দেওয়াল টপকিয়ে মিছিলে যোগ দেয় এবং এসব মিছিলে কোন কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না।[৫১]

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৯ চট্টগ্রামে ধর্মঘট পালিত হয় এবং আইন কলেজ ক্যাম্পাসে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় খালেদা খানম, দীনা জাহেদ, হামিদা চৌধুরী প্রমুখ মহিলা নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।[৫২] চট্টগ্রামে কালো দিবস উদ্‌যাপন করেন ২৮ জানুয়ারি ১৯৬৯। এদিন খালেদ খানমের নেতৃত্বে ছাত্রীরা মিছিল এবং জে.এম. সেন হলে সভা করেন। এ সভায় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী ও কর্মী তাসমিন আরা, রাশেদা খানম, হান্নানা বেগম, মমতাজ বেগম, নাজমা আরা বেগম, রওশন আরা বেগম (আনার), নিশাত পারভীন, দীনা জাহেদ, সাবেরা শবনম, নাজনীন জাহান, আয়শা বেগম, শিরিন কামাল প্রমুখ। ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলনে বেগম মুশতারী শফী বিভিন্ন সভা, সমাবেশে বক্তৃতা ও মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।[৫৩]

স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত ধাপ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধেও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় চট্টগ্রামের নারীরাও জীবনবাজী রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করে। চট্টগ্রামের নারীরা আশ্রয়দাতা, অপারেশনে সহায়তা, চিকিৎসা সেবা, কণ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২৯-৩০ মার্চ ১৯৭১ চট্টগ্রামের জয়নগর পাহাড়ে অবস্থানরত ই.পি.আর বাহিনীর খবর শুনে পাকিস্তান বাহিনী পাহাড়ের উপর উঠে আসে। দিশেহারা ই.পি.আর সৈন্যরা দিলারা ইসলাম নামক এক মহিলার ফ্ল্যাটের ভিতর আশ্রয় নেয়। তিনি তাদেরকে বাথরুমে ঢুকে ভিতর থেকে বন্ধ করে দেন এবং বাইরে থেকেও বন্ধ করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে দু'জন পাকিস্তান সেনা অফিসার স্টেনগান হাতে তার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে কোন বাঙালী আশ্রয় নিয়েছে। কিনা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি ও তাঁর স্বামী ডা: তারেক মঈনুল ইসলাম স্বাভাবিকভাবে উর্দু ভাষায় জবাব দেন। পাকিস্তানি সেনারা তাদেরকে অবাঙালি মনে করেন এবং চা খেয়ে বিদায় নেন। পরবর্তী সময়েও তারা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও গোপন পথে পার করতেন।[৫৪] এরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের চট্টগ্রামের আশ্রয় কেন্দ্র সমূহের মধ্যে পশ্চিম মাদার বাড়ীর কবির তোরণ, চকবাজার আয়েশা হায়দারের বাড়ী, নাসিরাবাদের 'কাকলী', পাথরঘাটা আবু তালেবের বাসা, ফিরিঙ্গি বাজার ব্যাপ্টিস্ট চার্চের এইচ.আর. চৌধুরীর বাসা, সুইপোড়া পাহাড়ে শাহজাহান ইসলামাবাদীর ট্রেনিং সেন্টারসহ অন্যান্য আশ্রয় কেন্দ্রে পরিবারের মহিলাগণ

মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার, সেবা শশ্রুষা, আশ্রয়, অস্ত্র সরবরাহ, খবর সংগ্রহসহ নানাবিধ কাজে সহযোগিতা করেন।[৫৫] চট্টগ্রামের ডা: নুরুন্নাহার জহুর, ডা. শামসুন্নাহার কামাল, ডা. রেনুকনা বড়ুয়া, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী বেবী সহ অনেক মহিলাই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করেন।[৫৬] চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্থাপিত 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে' এবং কলকাতায় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে'র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডা: মঞ্জুলা আনোয়ার, কাজী হোসনে আরা, বেগম মুশতারী শফী, কল্যাণী ঘোষ, শেফালী ঘোষ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।[৫৭] ড. সানজিদা খাতুনের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থায় গানের স্কোয়াডের মহিলা সদস্যদের মধ্যে চট্টগ্রামের শীলা দাস ও শর্মিলা দাস অন্যতম।[৫৮]

৬.৩.৩.ঘ. বাংলাদেশের রাজনীতি

বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী রওশন এরশাদ দু'জনই মহিলা। অন্যদিকে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল বি.এন.পির নেত্রী খালেদা জিয়াও একজন মহিলা। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ষাট এর দশক হতে নারীরা সরকার ও বিরোধী দলের রাজনীতিতে নেতৃত্বস্থানীয় পদে আছেন। রওনক জাহানের মতে,

> "In South Asia since the 1960s, a large number of women gained the highest leadership position in the government and the opposition through their family connections. By their family connections, they could overcome the problems that women other wise face in politics in the world."[৫৯]

১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচনেও নারী প্রার্থী ছিলেন যার সংখ্যা ০.৩%। ১৯৭৯ সালের ২১২৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৭ জন নারী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী। এ সময়ে রাজনৈতিক দল সমূহ জাতীয় নির্বাচনে সরাসরি নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে শুরু করে। ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮ এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনে যথাক্রমে ১৭ (০.৯%), ১৫ (১.৩%), ১৫(১.৩%), ৭ (০.৭%) এবং ৪০ (১.৫%) জন নারী প্রার্থী প্রত্যক্ষ নির্বাচনে দলীয় মনোয়ন লাভ করেন।[৬০] ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৩টি রাজনৈতিক দলের ৩২ জন নারী প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ নির্বাচনে ৫ জন নারী প্রার্থী ১১টি আসনে বিজয়ী হন। আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনা ৩টি, বি.এন.পি প্রধান খালেদা জিয়া ৫টি আসনে বিজয়ী হন।

তাছাড়া আওয়ামী লীগ মনোনীত মতিয়া চৌধুরী, বি.এন.পির খুরশিদ জাহান হক এবং জাতীয় পার্টির রওশন এরশাদ নির্বাচিত হন। জাতীয় নির্বাচনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর বিজয়ের ধারাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৬ সালে এ সংখ্যা ২ জন, ১৯৮৪ তে ৪ জন, ১৯৯১ তে ৫ জন এবং ১৯৯৬ তে ৭ জন।[৬১] উল্লেখ্য যে, নির্বাচিত সাংসদদের পরোক্ষ ভোটে সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নের ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আসন সমূহ অধিকার করে। প্রথম তিনটি সংসদে সরকারী দলে সংরক্ষিত নারী আসন ছিল না। পঞ্চম সংসদে বি.এন.পি সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও জামায়াত ইসলামীকে ২টি নারী সংরক্ষিত আসন দেওয়া হয়। সপ্তম সংসদে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ঐক্যমতের সরকার প্রতিষ্ঠা করায় জাতীয় পার্টিকে ৩টি আসন দেওয়া হয়। নিম্নের সারণিতে অভিজ্ঞ নারী সাংসদদের সংখ্যা দেখানো হল।

সারণি-৭:[৬২] সংসদে অভিজ্ঞ নারী সাংসদদের উপস্থিতি

সাংসদ	মোট নারী সাংসদ	অভিজ্ঞ নারী সাংসদ	শতাংশ
প্রথম (১৯৭৩)	১৫	৫	৩৩.৩
দ্বিতীয় (১৯৭৯)	৩০	৭	২৩.৩
তৃতীয় (১৯৮৬)	৩২	৩	৯.৩
চতুর্থ (১৯৮৮)*	৯	৩	৭৫.০
পঞ্চম (১৯৯১)	৩৫	১২	৩৪.২
সপ্তম (১৯৯৬)	৩৭	১৪	৩৭.৮

সূত্র: আল মাসুদ হাসান উজ্জামান (সম্পাদিত): বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ঢাকা, ২০১৩।

*চতুর্থ সংসদের সংরক্ষিত কোন আসন ছিল না।

চট্টগ্রামের নারীরাও রাজনীতিতে পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি), জাতীয় পার্টি এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টিসহ বামপন্থী দল সমূহে নারীরা সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশের বড় রাজনৈতিক দল সমূহের চট্টগ্রামে মহিলা শাখাও রয়েছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম উত্তর জেলা, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ও মহানগরের মূল কমিটিতেও নারী সদস্যরা কাজ করছেন। চট্টগ্রামের সংরক্ষিত নারী আসনসমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নারী সদস্যরা দক্ষতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন।

সারণি-৮[৬৩]: চট্টগ্রামের সংরক্ষিত মহিলা আসনে নারী সংসদ সদস্য (১৯৭৩-২০০০সাল)

সংসদ	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ	সংরক্ষিত মহিলা আসনের মহিলা সাংসদের নাম
প্রথম সংসদ	৭ মার্চ, ১৯৭৩	চট্টগ্রামে নাই
দ্বিতীয় সংসদ	১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯	মিসেস কামরুন্নাহার জাফর
তৃতীয় সংসদ	৭ মে, ১৯৮৬	মিসেস কামরুন্নাহার জাফর
চতুর্থ সংসদ	৩ মার্চ, ১৯৮৮	মহিলা আসন ছিলনা
পঞ্চম সংসদ	২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১	রোজী কবির
সপ্তম সংসদ	১২ জুন, ১৯৯৬	মিসেস জিনাত হোসেন

সূত্র: এ.এস.এম শামছুল আরেফিন (সম্পাদিত): *বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭০-২০০১*, বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশনন্স, ঢাকা, ২০০৩।

উল্লেখিত সময়ে চট্টগ্রাম জেলার প্রতিনিধিত্বকারী সংরক্ষিত মহিলা আসনে নারী সাংসদ সদস্য দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে মাত্র একজন করে ছিল। যা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের জন্য খুবই অপ্রতুল বলা যায়। অপরদিকে প্রথম জাতীয় সংসদে (১৯৭৩) চট্টগ্রামের কোন মহিলা প্রতিনিধিই ছিল না। অবশ্য একাদশ জাতীয় সংসদে খাদিজাতুল আনোয়ার সনি ও আয়েশা ওয়াসফিয়া দু'জন মহিলা সংরক্ষিত আসনের সাংসদ রয়েছেন।

চট্টগ্রামের প্রথম মহিলা মন্ত্রী কামরুন্নাহার জাফর। তিনি ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৮০-৮১ সালে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি মন্ত্রী, ১৯৮১ সালে শ্রম, সমাজকল্যাণ ও জনশক্তি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি মন্ত্রী এবং ১৯৮২ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৬৪] কবরী সরোয়ার

নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে সাংসদ হিসেবে (২০০৮-২০১৪) দায়িত্ব পালন করেন। চট্টগ্রাম কলেজের প্রাক্ত ছাত্রী লায়লা সিদ্দিকী টাঙ্গাইল-৪ আসনে ১৯৭৯ ও ১৯৮৬ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।[৬৫] নারীর অধিকহারে রাজনীতি অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই নারী উন্নয়ন সম্ভব। এজন্য জাতীয় রাজনীতিতে নারীর প্রতি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরী।

১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশানুসারে মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক প্রতি ইউনিয়নে দুই জন মহিলা সদস্য মনোনয়ন করতেন। ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ বলে মনোনীত মহিলা সদস্য সংখ্যা তিন জনে উন্নীত করা হয়।[৬৬] ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে ১৯৮৩ সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলা প্রতিনিধিদের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।[৬৭] ১৯৯৭ সালে 'ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ' সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতি ৩ ওয়ার্ডে ১ জন নারী হিসেবে প্রতি ইউনিয়নে ৩ জন নারীকে পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। একই বছর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ২০ জন মহিলা চেয়ারম্যান ও ১১০ জন মহিলা সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচিত হন।[৬৮] এ নির্বাচনে সমগ্র দেশের ৪১৯৮টি ইউনিয়নের ১২৮৯৪টি সংরক্ষিত আসনে ৪৬০০০ মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উল্লেখ্য যে, ২২টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।[৬৯] এ সময়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে চট্টগ্রাম জেলার ইউনিয়ন পরিষদ সমূহেও সংরক্ষিত নারী আসনে নারীরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন।

অপরদিকে ২০০২ সালের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নারীরা সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[৭০] ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনে সমগ্র বাংলাদেশের ৪৮০টি সংরক্ষিত আসনে ১৯৩৬ জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[৭১] প্রতিটি উপজেলায় একজন নারী ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং চট্টগ্রাম জেলার ১৫টি উপজেলা সমূহের নির্বাচনেও নারীরা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয় লাভ করেন। এভাবে চট্টগ্রামে নারীরা তৃণমূল থেকে জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আমি মনেকরি, চট্টগ্রামের নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা, বৈষম্য ও অবহেলার সমাপ্তি ঘটবে। জাতীয় উন্নয়নে সমহারে অবদান রাখতে পারবে এবং একুশ শতকের বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বে এগিয়ে নিতে সক্ষমত হবে।

৬.৩.৪ সাংবাদিকতাঃ

উনিশ ও বিশ শতকের শুরুতে চট্টগ্রামের শিক্ষিত সমাজ পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশনার কাজ শুরু করে। এসময় পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নারীরাও কাজ করেছেন। মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা সমূহের মধ্যে 'দৈনিক সরহদ (১৯৪৮)' সম্পাদিকা আয়শা সালাম, ইংরেজি দৈনিক 'ইস্টার্ন এক্সামিনার (১৯৫৫-১৯৭১)' সম্পাদিকা মায়মুনা আলী খান, ইংরেজি সান্ধ্য 'দৈনিক ইস্টার্ণ টাইমস' সম্পাদিকা বিলকিস আজম জহির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৭২] উল্লেখ্য যে, দৈনিক ইস্টার্ন এক্সামিনার চট্টগ্রামের প্রথম ইংরেজি দৈনিক। চট্টগ্রামের নারীরা মুদ্রিত পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি সাময়িকীও প্রকাশ করেন। চট্টগ্রামের মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িকীর নাম 'আন্নেসা'। ১৯২১ সালে এটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এটিকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। চট্টগ্রামের মহিলা সম্পাদিত আরেকটি সাময়িকী 'চয়নিকা ডাইজেস্ট' সম্পাদিকা রাজিয়া শহীদ।[৭৩]

ষাটের দশকে মহিলা সংগঠন 'বান্ধবী' প্রতিষ্ঠিত হয়। বেগম মুশতারী শফির সম্পাদনায় এই সংগঠনের পত্রিকা 'বান্ধবী' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা ও সংগঠনে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন তরুণ মন্ডল, মরিয়ম আনাম চৌধুরী, কবি আইনুন্নাহার, ফাহমিদা আমিন, বেগম উমরতুল ফজল, মাসুদা নবী, আসগরী হোসেন প্রমুখ।[৭৪]

স্বাধীনতাত্তোর কালেও নারীরা সাংবাদিকতায় এগিয়ে আসেন। জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা এবং টেলিভিশন সাংবাদিকতায় নারীরা অবদান রাখছেন। বর্তমানে মহিলা সাংবাদিকদের মধ্যে শামীম আরা লুসি, ইয়াসমিন ইউসুফ, সুচন্দা নন্দী, রেহানা শ্রাবন্ত রাণী, সুমিমা ইয়াসমিন, শাহীন আরা বেগম (ডেইজী মওদুদ), অর্পণা খাস্তগীর, সুমী খান, পূরবী দাশ গুপ্ত, ফেরদৌস লিপি, শিউলি শবনম, আসমা বিথী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৭৫]

৬.৩.৫ সংস্কৃতিঃ

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির উর্বরক্ষেত্র চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের নারীরাও সাহিত্যের ন্যায় সংস্কৃতিতেও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাংলাদেশের জাতীয় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন নাটক ও উপস্থাপনায় চট্টগ্রামের মেয়েরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। ১৯০৬ সালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় উপমহাদেশের দ্বিতীয় এবং অবিভক্ত বাংলার প্রথম সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র বলে পরিচিত 'আর্য সংগীত সমিতি' ১৯২৫ সালে সুরেন্দ্র লাল আর্য সংগীতে ছাত্রীদেরও সংগীত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অন্যতম কণ্ঠ শিল্পী শেফালী ঘোষ ও কল্যাণী ঘোষ চট্টগ্রামের সন্তান। তাঁদের আঞ্চলিক গানের সুনাম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে। আধুনিক বাংলা গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, লোক সংগীত, মাইজভান্ডারী সংগীতসহ সংগীতের বিবিধ শাখায় চট্টগ্রামের নারী শিল্পীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। ১৯৬০-৭০ দশক থেকে চট্টগ্রামের সংগীত জগতের বেলা খান, শিখা গুহ, রুখসানা, মমতাজ, মায়া চৌধুরী, হাসমত আরা বেগম, দিলারা আলো, চমন আফরোজ কামাল, রহিমা খাতুন, গুল নার্গিস, উমা চৌধুরী, জয়ন্তী লালা, সালমা আহমদ, রাজিয়া শহীদ, শীলা মোমেন, কাজী আয়েশা আমান, মায়া চক্রবর্তী, জুলিয়া মান্নান, মঞ্জুশী চৌধুরী, সোহেলা রহমান, অলকা দাশ, সুফিয়া ইসলাম, গুল নার্সিস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৭৬] উপমহাদেশের বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লার মা কণ্ঠশিল্পী অমিয় সেন (আমিনা লায়লা) চট্টগ্রামের মেয়ে। আধুনিক গানে হৈমন্তী রক্ষিত মান, ঝিনুক, বৃষ্টি, চৈতী মুন, নিশিতা বড়ুয়া, রন্টি দাশসহ একঝাঁক তরুণ শিল্পী বাংলাদেশের সংগীত জগতের সম্পদ।[৭৭] বাংলাদেশের পপ সংগীতের অন্যথম উজ্জল নক্ষত্র মিলা ইসলাম চট্টগ্রাম গ্রামার স্কুল এবং চট্টগ্রাম কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী। তাছাড়াও বাংলাদেশ বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ গায়িকা রুবায়াত জাহান চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উপমহাদেশের বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লার মা কণ্ঠশিল্পী অমিয় সেন (আমিনা লায়লা) চট্টগ্রামের মেয়ে।[৭৮]

পূর্ব বাংলায় নির্মিত প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নায়িকা পূর্ণিমা সেন গুপ্ত চট্টগ্রামের মেয়ে।[৭৯] চট্টগ্রামের জাতীয় চলচ্চিত্রে ষাট ও সত্তরের থেকে অভিনেত্রীদের মধ্যে কবরী সরোয়ার উজ্জ্বল নাম। যিনি স্যার আশুতোষ ডিগ্রী কলেজের প্রাক্তনী। তিনি ১৯৭৫ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। এই কৃতী অভিনেত্রী সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদ নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য (২০০৮-২০১৪) ছিলেন। খ্যাতনামা অভিনেত্রী চিত্র লেখা গুহ অপর্ণা চরণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। অভিনেত্রী ও মডেল মেহজাবীন চৌধুরী ও মাসুমা রহমান নাবিলা চট্টগ্রামের সন্তান। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র আফরোজা সুলতানা রত্না ওরফে শাবানার পৈত্রিক বাড়ী রাউজান উপজেলার ডাবুয়ায় বাংলাদেশের জাতীয় চলচ্চিত্রে চার দশকের জনপ্রিয় ও

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী। ডালিয়া হানিফ রীতা ওরফে পূর্ণিমার পৈত্রিক বাড়ী চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায়।[৮০] উপমহাদেশে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ডের অধিকারী ব্যবসায়িক সফল ছবি 'বেদের মেয়ে জ্যোস্না' এর নায়িকা অঞ্জু ঘোষ চট্টগ্রামের শিল্পী। এছাড়াও অঞ্জু ইসলাম, জয়শ্রী কবির, সুমিতা চৌধুরী, শকুন্তলা বড়ুয়া, জয়ন্তী চক্রবর্তী, মিনা খান, খালেদা আক্তার কল্পনা, সেলিনা শিলা মমতাজ, অরুনা বিশ্বাস প্রমুখ চট্টগ্রামে বেড়ে উঠেছেন।[৮১]

বিখ্যাত পর্বতারোহী, সমাজ কর্মী ও লেখক ওয়াসফিয়া নাজনীন চট্টগ্রামের জন্মগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। তিনি প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে ১৮ নভেম্বর ২০১৫ সালে *'Seven Summits'* সম্পন্ন করেন। *National Geographic* তাঁকে ২০১৪-১৫ সালের অন্যতম সেরা দুঃসাহসিক অভিযাত্রিক হিসেবে স্বীকৃতি দেন।[৮২]

বাংলাদেশের বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার ও আন্তর্জাতিক মডেল বিবি রাসেল ১৯৫০ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লন্ডন কলেজ অব ফ্যাশনে হতে পড়ালেখা সম্পন্ন করে আন্তর্জাতিক মডেল হিসেবে (*Vogue, Cosmopolitan and Harper's Bazaar*) ম্যাগাজিনে কাজ করেন। তিনি ফ্যাশন ডিজাইনার এবং উদ্যোক্তা হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার গড়েন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০০৯ (কস্টিউম ডিজাইনার) অর্জন করেন। তিনি স্পেন, *UNESCO* সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে পুরস্কার লাভ করেন।[৮৩] চট্টগ্রাম কলেজের প্রাক্তনী ইয়াসমনি করিম বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার এবং সফল উদ্যোক্তা ব্যবসায়ী।[৮৪]

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মহিলা ভাস্কর ও বাংলাদেশের আইডল নভেরা আহমদ (১৯৩৯-২০১৫) চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার ইজ্জত নগরে জন্ম গ্রহণ করেন।[৮৫] এ কৃতিমান ভাস্কর হামিদুর রহমানের সাথে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ডিজাইন করেন। তিনি ঢাকায় ১৯৫৬-১৯৬০ এর মধ্যে শতাধিক ভাস্কর্য তৈরি করেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন তাঁর কর্মের প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক লাভ করেন। নভেরা আহমদ ১৯৭০ এর দশকে প্যারিসে স্থায়ী হন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।[৮৬]

৬.৩.৬ শিক্ষা:

চট্টগ্রামের আধুনিক শিক্ষিত নারী সমাজ অধ্যাপনা ও শিক্ষা বিস্তার এবং নারী সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসেন। পটিয়ার ডা. অন্নদা চরণ খাস্তগীরের চতুর্থ কন্যা কমুদিনী দাস (খাস্তগীর) চট্টগ্রামের প্রথম নারী গ্রাজুয়েট। তিনি কলিকাতা বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ (১৯০১-১৯১২) দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯১৩ সালে সহকারী স্কুল পরিদর্শক হিসেবে ঢাকায় আসেন এবং এ পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত হন।[৮৭] শিক্ষাব্রতি আম্বিয়া খাতুন ও প্রফেসর খলিলুর রহমান দম্পতির সন্তান ড. ফাতেমা সাদেক (১৯২৯) প্রথম মুসলিম মহিলা হিসেবে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। চন্দনাইশ উপজেলার সাতবাড়িয়ার ড. জোর্তিময়া দেবী লন্ডনের পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। বিখ্যাত আইনজীবি অতুল দত্তের কন্যা শিপ্রা দত্ত কমুদিনী কলেজের (টাঙ্গাইল) অধ্যাপিকা ছিলেন। চট্টগ্রামের শিক্ষাব্রতি আরতি দত্ত সুদীর্ঘ ৩৪ বছর অপর্ণাচরণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন।[৮৮] চট্টগ্রামের অন্যতম শিক্ষক, লেখক ও সংগঠক নুর জাহান বেগম চৌধুরী খ্যাতি অর্জন করেন।[৮৯] চট্টগ্রামের প্রতিযযশা নারী শিক্ষাবিদদের মধ্যে অধ্যাপিকা ড. খালেদা হানুম, অধ্যাপিকা ড. জয়নাব বেগম, অধ্যাপিকা শিপ্রা রক্ষিত, অধ্যক্ষ রওশন আখতার হানিফ (চট্টগ্রাম কলেজের প্রথম মহিলা অধ্যক্ষ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৯০] বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষিত তরুণীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অধ্যক্ষ মওলানা নুরজাহান আকবর চটটগ্রামের প্রথম মহিলা যিনি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনে এম.এ এবং ঢাকা মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে কামিল পাশ করেন। তিনি চট্টগ্রামের হাইধর মহিলা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন।[৯১] ভাষা সৈনিক প্রিন্সিপাল চেমন আরা নিবেদিত প্রাণ একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন।

৬.৩.৭ চিকিৎসা বিদ্যা:

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (১৯৬৯) প্রতিষ্ঠা হওয়ায় চিকিৎসা বিজ্ঞানে চট্টগ্রামের নারীরা অধ্যয়ন ও মানব সেবায় এগিয়ে আসতে সক্ষম হন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও চট্টগ্রামের ডা. নুরুন্নাহার জহুর, ডা. শামসুন নাহার কামাল, ডা. বেনুকা বড়ুয়া যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। চট্টগ্রাম জেলার অনেক তরুণী চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন ও পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। এসব শিক্ষিত চিকিৎসকরা সমগ্র বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন। অনেকে আবার স্বনামে খ্যাতিও অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ডা. তাহমিনা বানু, ডা. চেমন আরা বেগম, ডা. রীনা খান, ডা. লায়লা বেগম, ডা. খালেদা ফারুক, ডা.

নূরজাহান ভূইয়া (চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৯৩] চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের স্মরণীকা ও প্রাক্তন সম্মিলনীর স্মারক গ্রন্থে অনেক ছাত্রীর তরুণ চিকিৎসক হওয়ার তথ্য রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ 'কাকলি'তে ও এরূপ অনেক মহিলা চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়।

৬.৩.৮ ক্রীড়াঃ

আধুনিক খেলাধুলায় চট্টগ্রামের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। চট্টগ্রামের খেলোয়াড়গণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতি অর্জন করেন। চট্টগ্রামের নারীরাও বিভিন্ন ইভেন্ট নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দেন। অ্যাথলেটিক্সে জাহানারা আঙ্গুর, জ্যোৎস্না আফরোজ, শর্মিলা, শর্মিষ্ঠা, লুবনা মাহমুদ, মমতাজ বেগম, আজীজা খানম, রীতা বড়ুয়া, তৌহিদা ইসলাম, লাবলী, প্রীতি কণা চাকমা, স্মরণিকা চাকমা প্রমুখ জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখেন।[৯৪]

চট্টগ্রাম রাইফেল ক্লাব (১৯৪৮ খ্রি.) এবং মেট্রোপলিটন স্পর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়গণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। মহিলা শ্যুটারদের মধ্যে এস. জেড মনসুরের স্ত্রী মিসেস মনসুর, এম.এম জামানের স্ত্রী মিসেস জামান, সারবিনা সুলতানা, আরতি সাহা প্রমুখ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হন।[৯৫] কমনওয়েলথ শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে (১৯৯৭) এবং দক্ষিণ এশিয়া শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ (১৯৯৭) স্বর্ণ অর্জন করে সাবরিনা সুলতানা বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছায়।[৯৬]

চট্টগ্রামের নারীদের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল বিচরণক্ষেত্র দাবা। ১৯৫২ সালে দাবা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চট্টগ্রামে দাবার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। চট্টগ্রামের পুরুষ ও মহিলা দাবাড়ুরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুরস্কৃত হয়। চট্টগ্রামের মহিলা দাবাড়ুদের মধ্যে ইয়াসমিন বেগম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দাবাড়ু। তিনি জাতীয় দাবায় রানার্স আপ (১৯৮৪) ও জাতীয় দাবায় চ্যাম্পিয়ন (১৯৮৫, ১৯৮৬) হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। বাংলাদেশের মহিলা দাবাড়ুদের মধ্যে তিনিই ১৯৮৮ সালে প্রথম গ্রীস অলিম্পিয়াড়ে (বিশ্ব দাবা অলিম্পিক) স্বর্ণ পদক লাভ করেন। দুবাই বিশ্ব দাবা অলিম্পিয়াড (১৯৮৬) লন্ডনে ব্রিটিশ ওপেন চেজ কম্পিটিশন (১৯৮৭), কাতারে এশিয়া জোন চেজ কম্পিটিশন (১৯৮৭) এবং ভারতের হায়দারাবাদে

এশিয়ান ফিমেল চ্যাম্পিয়নশিপ (১৯৮৬) এ অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়। চট্টগ্রামের মেয়ে তনিমা পারভীন জাতীয় মহিলা দাবায় দু'বার চ্যাম্পিয়ন (১৯৯০, ১৯৯২) হয়েছেন। চট্টগ্রামের মাহমুদ ইসলামও একজন খ্যাতিমান দাবাড়ু।[৯৭]

অতএব বাংলাদেশের রাজনীতি শিক্ষা, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, ব্যাংক, বেসরকারী বিভিন্ন অফিস ও সংস্থা, সাংবাদিকতা, চিকিৎসা, সংগীত, চলচ্চিত্র, সাহিত্য, ক্রীড়াসহ প্রতিটি সেক্টরে চট্টগ্রামের নারীরা দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজ করছেন। জাতীয় নীতি প্রণয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের খ্যাতি অর্জনে চট্টগ্রামের নারীরা সমহারে কাজ করছেন। চট্টগ্রামের নারীদের শিক্ষায় অধিক হারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ সফলতা ও খ্যাতির তালিকা আরো দীর্ঘ হবে।

তথ্যসূত্র ও টিকাঃ

১. Sonia Nishat Amin, *The Early Muslim Bhadramahila*, Bharati Ray (ed.): *From the seams of History Essay on Indian Women*, Oxford University Press, 2001. P. 130.

২. ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামে শিক্ষা সাধনা*, চট্টগ্রাম, ১৯৮৪, পৃ. ৭।

৩. *তদেব*, পৃ. ২২-২৩।

৪. *চট্টগ্রাম পৌরসভার ১৫০ বছর পূর্তি স্মারকগ্রন্থ*, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ২২ জুন, ২০১৩।

৫. *তদেব*।

৬. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন অফিসের প্রাপ্ত তথ্য।

৭. চট্টগ্রাম জেলা শিক্ষা অফিসের প্রাপ্ত তথ্য।

৭.ক. *Statistical Pocketbook Bangladesh 2000*, Bangladesh Bureau of Statistis, Dhaka, 2002, P. 342.

৮. *Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistical Report*, Dhaka, 2019.

৯. *Ibid.*

১০. *Ibid*.

১১. *Bangladesh Population Census 2001*, Bangladesh Bureau of Statistis, Dhaka, 2002, P. xi.

১২. *Ibid*.

১৩. *Bangladesh Population Census 2001*, Bangladesh Bureau of Statistis, Dhaka, 2002, P. 21.

১৪. *Ibid*, P. 22.

১৫. *Ibid*.

১৬. *Ibid*, P. 23.

১৭. *Bangladesh Population Census 2001*, Community Series, Zila: Chittagong, Bangladesh Bureau of Statistis, Dhaka, 2007, P. 9-123.

১৮. *সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক 'কাকলি'*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, চ.বি. ২০২০, পৃ. ৩১।

১৯. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০।

২০.আনোয়ারা আলম, *চট্টগ্রামের আলোকিত নারী*, চট্টলশিখা, ঢাকা, ২০০৩।

২১.বি.এ. আজাদ ইসলামাবাদী (সম্পাদিত), *চট্টগ্রাম স্মরণী*, চট্টগ্রাম, ১৯৮৭, পৃ. ১৯।

২২.*তদেব*, *হাটহাজারী পার্বতী উচ্চ বিদ্যালয় শতবর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ*, ১৯৯৫, পৃ. ৮৪। *চট্টগ্রাম কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয় ১৮০ বৎসর পূর্তি স্মারক গ্রন্থ*, পৃ.।

২৩.*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭।

২৪.মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *হাজার বছরের চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫, পৃ. ২১১-২১২।

২৫.আনোয়ারা আলম, *পূর্বোক্ত*।

২৬.*তদেব*।

২৭.*পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৪।

২৮.*তদেব*, পৃ. ২১৬।

২৯.*তদেব*, পৃ. ২২৪।

৩০.*তদেব*।

৩১.*তদেব*।

৩১.ক. জামাল উদ্দীন ও শরীফা বুলবুল (সম্পাদিত), চট্টগ্রামের নারী লেখক, চট্টগ্রাম, ২০০৫।

৩২.আনোয়ার হোসেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৬৮।

৩৩.ভারতী রায়, স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলাদেশের নারী জাগরণ (১৯১১-২৯), রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী (সম্পাদিত), ভারত ইতিহাসে নারী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ.৫০।

৩৪.*তদেব*, পৃ. ৫১।

৩৫.শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক (সম্পাদিত), জানানা মাহফিল, কলকাতা, ১৯০০, পৃ. ২০৬-২০৭।

৩৬.কবি, সাংবাদিক, সংগঠক ও নারী নেত্রী শামসুন্নাহার মাহমুদের পৈত্রিক বাড়ী নোয়াখালী কিন্তু চট্টগ্রামে বসবাস করতেন। চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রী ছিলেন। তিনি বেগম রোকেয়ার আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৩৭.মুহাম্মদ বদিউল আলম (সম্পাদিত), চট্টল শিখা, চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকার ২৫ বছর পূর্তির বিশেষ সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৩। শাহনাজ পারভিন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৪। অদিতি ফাল্গুনী, বাংলার নারী সংগ্রামী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৯, কমলেশ দাস গুপ্ত, প্রাচীন চট্টগ্রাম ও সেকালের হিন্দু সমাজ, চট্টগ্রাম, ২০১৮।

৩৮.বীনা দাস বিপ্লবী ও রাজনীতিবিদ। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে পৈত্রিক নিবাস।

৩৯.বীনা দাস, শৃঙ্খল ঝংকার, কলিকাতা, নতুন সংস্করণ, ২০১৩।

৪০.অদিতি ফাল্গুনী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১।

৪১.প্রীতিলতার অন্যান্য সঙ্গীরা হলেন বীরেশ্বর রায়, প্রফুল্ল দাস, পান্না সেন, কালী কিংকার দে, শান্তি চক্রবর্তী, সুশীল দে, দীনেশ চক্রবর্তী ও মহেন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ। শরীফ শমশির (সম্পাদিত), ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৬০-১৬৪।

৪২.*তদেব*, পৃ. ১৬৫। রেজিনা বেগম, রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী (১৯০৫-৪৭), ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২১৩। কমলেশ দাস গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫৫। মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭।

৪৩.রেজিনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১১।

৪৪.শাহনাজ পারভিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫। কমলা দাশ গুপ্ত; স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, কলকাতা, ১৩৭০, পৃ. ১৩২।

৪৫.রেজিনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১২।

৪৬.কমলা দাশ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৮-১৪৯। চিন্ময় চৌধুরী: স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী নারী, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩৪-১৩৬। রেজিনা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১২। কমলেশ দাস গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭২।

৪৭.কমলেশ দাস গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫০।

৪৮.মুহাম্মদ বদিউল আলম (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, শ্রী যোগেল চন্দ্র বাগল: জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী, কলকাতা, ১৩৬১, পৃ. ২২। মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৯৬।

৪৯.কমলেশ দাস গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫২৪-৫৪৩।

৫০.বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রেক্ষাপট ও ঘটনা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৯।

৫১.ডা: মাহফুজুর রহমান, বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩, পৃ. ২০১।

৫২.*তদেব*, পৃ. ২১৫।

৫৩.*তদেব*।

৫৪.শাহনাজ পারভীন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬।

৫৫.*তদেব*, পৃ. ৯৪-৯৫।

৫৬.*তদেব*, পৃ. ৯৫-৯৬।

৫৭.*তদেব*, পৃ. ১০৬-১০৯।

৫৮. মেজর রফিকুল ইসলাম পি.এস.সি: মুক্তিযুদ্ধ ও বুদ্ধিজীবি, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩৫।

৫৯.সংবাদ, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬।

৬০.Rounaq Jahan, Women in South Asian Politics, Third world Quarterly, 9.3, July, 1987, P. 848-870.

৬১.আল মাসুদ হাসানউজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের নারী, বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১১১।

৬২.*তদেব*।

৬৩.*এ.এস.এম. শামছুল আরেফিন (সম্পাদিত), বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭০-২০০১, বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩।* Bangladesh Parliament Secrateriat অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

৬৪.বি.এ. আজাদ ইসলামাবাদী (সম্পাদিত), চট্টগ্রাম স্মরণী, চট্টগ্রাম, ১৯৮৭, পৃ. (ঐতিহ্য পরিবার) ৪০।

৬৫.চট্টগ্রাম সমিতির ১০০ বছর পূর্তি স্মারক গ্রন্থ 'শতবর্ষে চট্টগ্রাম সমিতি', চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা, ঢাকা, পৃ. ৩৪৯।

৬৬.সৈয়দা রওশন কাদের, ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্যদের ভূমিকা, ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২০।

৬৭.সৈয়দা রওশন কাদের, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভূমিকা ও কার্যাবলি, স্থানীয় সরকার ও নারী সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ শীর্ষক উইমেন ফর উইমেন এর বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন ১৯৯৮-এ উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

৬৮.*তদেব*।

৬৯. ফরিদা আক্তার (সম্পাদিত), সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন প্রসঙ্গে, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৬১।

৭০.The Daily Star, April 25, 2002.

৭১.Farah Deeba Chowdhury, Women's Political Participation in Bangladesh, An Empirical Study, Dhaka, 2013, P. 44.

৭২. মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩২।

৭৩.*তদেব*, পৃ. ২২৭-২৩২।

৭৪.*তদেব*, পৃ. ২৮৯।

৭৫.চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন অফিসের তথ্যসূত্র।

৭৬.চট্টল শিখা, চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা, ঢাকা, ২০০৩।

৭৭.The Independent, 28 November 2020.

৭৮.চট্টল শিখা, চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা, ঢাকা, ২০০৩।

৭৯.*তদেব*।

৮০.www.wikipedia.org.

৮১.চট্টল শিখা, চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা, ঢাকা, ২০০৩।

৮২.www.wikipedia.org.

৮৩.www.wikipedia.org.

৮৪.শতবর্ষে চট্টগ্রাম, পৃ. ৩৫৪।

৮৫. বি.এ. আজাদ ইসলামাবাদী (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫।

৮৬.www.wikipedia.org.

৮৭.কমলেশ দাশ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৩।

৮৮.চট্টল শিখা, ২৫ বছর পূর্তি স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা, ২০০৩।

৮৯.বি.এ. আজাদ ইসলামাবাদী (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. সমাজ সেবায়-২২।

৯০.চট্টল শিখা, চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা, ঢাকা, ২০০৩।

৯১.বি.এ. আজাদ ইসলামাবাদী (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. সমাজ সেবায়-১০।

৯২.শতবর্ষে চট্টগ্রাম, পৃ. ২৫৭।

৯৩.চট্টল শিখা, চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা, ঢাকা, ২০০৩।

৯৪.মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৮।

৯৫.*তদেব*।

৯৬.www.wikipedia.org.

৯৭.মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৮।

উপসংহার

সমাজ বিবর্তনের ধারায় পরিবর্তিত হয়েছে। গণতন্ত্রের বিকাশ হওয়ায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে পরিবর্তন এসেছে এবং প্রতিনিধিত্বশীলতা ও দায়িত্বশীলতার পথও প্রশস্ত হয়েছে। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক অসম ক্ষমতার সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটেছে খুবই কম। মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সমাজ ও সংস্কৃতিতে মিশে থাকা ধর্মীয় প্রভাব এদেশের নারীদের পৃথকীকরণ, বশ্যতা ও অধীনতা প্রতিষ্ঠায় মূল নির্ণায়ক।

মধ্যযুগীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান মক্তব, মাদ্রাসা, পাঠশালা, বিহার, কিয়াং, টোল-চতুষ্পাঠী প্রভৃতিতে ধর্মীয় ভাবধারা প্রকট ছিল। স্বাভাবিকভাবে এ ভাবধারা সমাজেও প্রতিফলিত হয়েছে। যুগে যুগে মানুষের মানস পটে অংকিত ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নারীর শিক্ষা ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান সমাজেও এ ভাবধারার প্রতিফলন দেখা যায়। একুশ শতকের বাংলাদেশকে আমরা অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর, আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাই। এজন্য প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক ও দক্ষ শক্তির একটি জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এ নারী জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। তবেই বাংলাদেশের অর্থনীতি গতিশীলও সমৃদ্ধ হবে।

উনিশ শতকে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ এবং তাদের উৎসাহে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার প্রকৃত সূচনা ঘটে। কলিকাতায় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার (১৮৪৯ খ্রি.) মধ্যদিয়ে বাংলায় নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু। ১৮৫১ খ্রি. জন এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন কৃষ্ণ নগরে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতার সুপারিশ করে দীর্ঘ একটি বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন, যা এখন বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে।

উনিশ শতকে বেথুনের নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি এখনও প্রাসঙ্গিক। আধুনিক নারী শিক্ষার পথ প্রদর্শক বেথুন এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারী শিক্ষার অগ্রগামী নায়ক। ঢাকায় ইডেন গার্লস স্কুল (১৮৭৮ খ্রি.) ও কলেজ (১৯২৬ খ্রি.), চট্টগ্রামে ডা. অন্নদাচরণ খাস্তগীর মধ্য বালিকা বিদ্যালয় (১৮৭৮ খ্রি.), চট্টগ্রামের পাঠানটুলি মোসলেম বালিকা বিদ্যালয় (১৯১৮ খ্রি.) এবং ময়মনসিংহ আলেকজান্ডার স্কুল প্রতিষ্ঠা পূর্ব বাংলায় নারী শিক্ষার নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। ১৮৯৭ খ্রি. কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম সহশিক্ষা

প্রবর্তন নারীর উচ্চ শিক্ষায় নবদ্বার উন্মোচন করেছে। অবশ্য ১৮৪৪ খ্রি. হতে প্রেসিডেন্সি কলেজে নিয়মিত সহশিক্ষা চালু হয়। তাছাড়া লারটো হাউজ কলেজ (১৯১২ খ্রি.), ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৮৩ খ্রি.) লেডি ব্রাবন কলেজ (১৯৩৯ খ্রি.), সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ (১৯৩২ খ্রি.), উইমেন্স কলেজ (১৯৩৭ খ্রি.) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা বাংলার নারী সমাজের উচ্চ শিক্ষার দ্বারকে উন্মুক্ত করেছে।

চট্টগ্রামে নারী শিক্ষা ডা. খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৭৮ খ্রি.) মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয়। পরবর্তীতে পাঠানটুলি মোসলেম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৯১৮ খ্রি.), পাঠানটুলি খান সাহবে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৪ খ্রি.), চন্দনপুরা মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় (১৯২২ খ্রি.), অপর্ণাচরণ বালিকা বিদ্যালয় (১৯২৭ খ্রি.), কৃষ্ণ কুমারী বালিকা বিদ্যালয় (১৯২৭ খ্রি.) প্রভৃতি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নারী শিক্ষার কার্যক্রমকে গতিশীল করে। বিশেষত চট্টগ্রাম পৌরসভার তৎকালীন মেয়র নূর আহমদ চেয়ারম্যানের (১৯২১-১৯৫৪ খ্রি.) নারী শিক্ষা অবৈতনিক (১৯৩২ খ্রি.) এবং বাধ্যতামূলক (১৯৪২ খ্রি.) করেন। তাঁর এ পদক্ষেপ চট্টগ্রামে নারী শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনায়ন করেন। চট্টগ্রাম কলেজে (প্রতিষ্ঠা ১৮৬৯ খ্রি.) প্রিন্সিপাল কামাল উদ্দীন আহমদ ১৯২৪ খ্রি. সহশিক্ষার প্রবর্তন করেন। এ পদক্ষেপ চট্টগ্রাম অঞ্চলে নারীদের উচ্চ শিক্ষার পথকে উন্মুক্ত করে।

স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার নারী শিক্ষার সহায়ক নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। এদেশের শিক্ষানুরাগী জনগণ ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় স্বাধীনতাত্তোর কালে সমগ্র বাংলাদেশে নারীদের জন্য বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী শিক্ষায় অনুপ্রেরণার জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি চালু করা হয়। সরকার বালিকা বর্ষ ঘোষণা (১৯৯০ খ্রি.), আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন (৮ মার্চ), জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা (১৯৯৭), নারী উন্নয়ন পরিষদ (১৯৯৫) প্রভৃতি গঠন করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮ খ্রি.) নারী শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে নারী ও শিশুর জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করেন এবং নারীদের শিক্ষা ও চাকুরীর বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়। চাকুরীর ক্ষেত্রে ১০% এবং ১৫% যথাক্রমে গেজেটেড ও ননগেজেটেড পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এসব সরকারি পদক্ষেপ নারী শিক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি করেছে।

বাংলাদেশ সরকারে উদ্যোগ ও নীতি সহায়তা সমাজে নারী শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে। চট্টগ্রামে শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটান মেয়র এ.বি.এম মহিউদ্দীন চৌধুরী (১৯৯৪-২০১০ খ্রি.)। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বর্তমানে ২৪টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করছে। চট্টগ্রাম শহরের বাইরেও বেসরকারি

ভাবে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলায় ৮৮টি বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে, যার মধ্যে উত্তর চট্টগ্রামে ২৭টি, দক্ষিণ চট্টগ্রামে ২৭টি এবং চট্টগ্রাম মহানগরে ৩৪টি বালিকা বিদ্যালয়। অন্যদিকে চট্টগ্রামে প্রথম মহিলা কলেজ 'সেন্ট্রাল গার্লস সরকারী গার্লস কলেজ (১৯৬৮ খ্রি.)'। বেসরকারী উদ্যোগে উত্তর চট্টগ্রাম ও দক্ষিণ চট্টগ্রামেও ধীরে ধীরে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর চট্টগ্রামের প্রথম মহিলা কলেজ কাটিরহাট মহিলা কলেজ (১৯৮৫)। বর্তমানে উত্তর চট্টগ্রামে ৯টি, দক্ষিণ চট্টগ্রামে ৬টি এবং চট্টগ্রাম মহানগরে ১৬টি মহিলা কলেজ রয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ব্যবস্থায় সহশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এজন্য চট্টগ্রাম জেলায় নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়েছে।

২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী চট্টগ্রামে শিক্ষার হার (৫ বৎসরের উর্ধ্বে) পুরুষ ৪৯.১% এবং নারী ৪২.৮৭%। স্বাধীনতাত্তোর কালে ১৯৭৪ সালে শিক্ষার হার ছিল পুরুষ ৩৯.৫% এবং নারী ১৫.৪%। চট্টগ্রামের পুরুষ ও নারী উভয়ের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নারী শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পুরুষের শিক্ষার হার থেকে প্রায় ৬.৭% পিছিয়ে। সরকারি বিভিন্ন প্রকার কর্ম পরিকল্পনা, নীতি সহায়তা ও উপবৃত্তি ব্যবস্থা এক্ষেত্রে কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। আমরা উপজেলা/থানা ওয়ারি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে শহরাঞ্চলেই নারী শিক্ষিতের হার সর্বোচ্চ (কতোয়ালী, ৭৫.৭%) এবং সর্বনিম্ন হার গ্রামাঞ্চলে (বাঁশখালী, ২৪.৮%) রয়েছে। আবার চট্টগ্রাম জেলায় নারী শিক্ষা গড় হারে (৪২.৪%) থেকে ও নিম্নে শিক্ষিত নারী জনসংখ্যা রয়েছে বাঁশখালী (২৪.৮%), ফটিকছড়ি (৪০.০%), লোহাগাড়া (৪০.৮%) ও আনোয়ারা (৪১.৮%) উপজেলায়। এসব উপজেলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে দেখা যায় আর্থিকভাবে কম সমৃদ্ধ এবং সমাজে প্রচ্ছন্ন ধর্মীয় প্রভাব রয়েছে।

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বসবাস করছে। চট্টগ্রামেও জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান জনগোষ্ঠী। ইসলামি তাহজিব, তমদ্দুন, সংস্কৃতি ও মুল্যবোধ নিয়েই মুসলমানদের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ভারতীয় বিশেষত বাংলার জনসাধারণের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ এবং চিন্তার পরিসরসমূহ দেশি-বিদেশী ঐতিহাসিক এবং পর্যটকরাও তাদের লেখনিতে নানাভাবে তুলে ধরেছেন।

এরূপ সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চিন্তা চেতনা বাংলাদেশ তথা চট্টগ্রামের মুসলমানদেরও ছিল। চট্টগ্রামের মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবাবেগ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বরং বেশি, যা

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। চট্টগ্রামকে বার আউলিয়ার দেশ বলা হয়। আবার চট্টগ্রামের আলীয়া ধারার মাদ্রাসা 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা' এবং কওমী ধারার 'আল জামেয়া মঈনুল উলুম আরাবিয়া বা হাটহাজারী মাদ্রাসা' সমগ্র বাংলাদেশে ধর্মীয় প্রভাব ও সংস্কৃতির নেতৃত্ব প্রদান করছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মানস পট অর্থাৎ 'মুসলিম মানস' ধর্মীয় ভাবধারায় আচ্ছন্ন। সুতরাং চট্টগ্রামের সমাজ ব্যবস্থা রক্ষণশীল এবং নারী সমাজ আন্তঃপুরচারিণী। এ কারণে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ এবং প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠার কাল প্রলম্বিত হয়েছে। কতিপয় ক্ষেত্রে অবশ্য আর্থিক অস্বচ্ছলতাও স্কুল বিমুখীতার জন্য দায়ী। এজন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও নারী শিক্ষা কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে নি।

১৯৩০ সালে গৃহীত 'সারদা আইন' এ বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণে নারীদের জন্য বড় সুযোগ সৃষ্ঠি করে। কিন্তু রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ এই বিল উত্থাপনের শুরু থেকেই প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে। ১৯২৯ সালের ১ জানুয়ারি মৌলবি খন্দকার মুহাম্মদ তজম্মুল হোসেনের সভাপতিত্বে 'বাল্য বিবাহ বিল' এর বিরুদ্ধে গোপালপুরে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বক্তাগণ শরিয়ত বিরোধী আখ্যা দিয়ে 'বাল্য বিবাহ বিল' এর তীব্য নিন্দা জানান। অনুরুপ প্রতিবাদ সভা বাংলাদেশের রংপুর, সিলেট, বগুড়া ও চট্টগ্রামেও অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় 'বাল্য বিবাহ বিল' বিরোধী প্রতিবাদ সভায়ও নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সুতরাং চট্টগ্রামে মুসলমানদের রক্ষণশীল গোঁড়া সমাজ ব্যবস্থায় বাল্য বিবাহ প্রথা ছিল, যা নারীর উচ্চ শিক্ষার অন্তরায়। অন্যদিকে সচেতন শিক্ষিত সমাজে বাল্য বিবাহের প্রতিবাদ এবং নারী শিক্ষাকে সর্মথন করেছে। কিন্তু নারী শিক্ষার প্রকরণ হিসেবে তাঁদের মধ্যে গৃহ ও প্রাতিষ্ঠানিক নারী শিক্ষা, সহশিক্ষা, ধর্ম ও আধুনিক শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে বির্তক অব্যাহত ছিল। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের এই মতানৈক্য পরিস্থিতিও মুসলিম সমাজে শিক্ষার বিস্তারে খুব বেশি কার্যকর হয়নি। তাছাড়াও দারিদ্রতাও গ্রাম্যঞ্চলের মুসলিম নারীদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পিছিয়ে রেখেছিল।

বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষার প্রারম্ভকালে চট্টগ্রামে 'চট্টগ্রাম জিলা স্কুল' (১৮৩৬ খ্রি.), 'চট্টগ্রাম কলেজ' (১৮৬১ খ্রি.), 'ডা. খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়' (১৮৭৫ খ্রি.) প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। ফলশ্রুতিতে আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি রক্ষণশীল সমাজের গন্ডি পেরিয়ে উদার ও প্রগতিশীল সমাজের বিকাশ ঘটায়। চট্টগ্রামের নারী সমাজ শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়াসহ সর্বস্তরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রাচীন মহিলা পদ্যকার হীরামনি, মধ্যযুগের কবি রহিমুন্নেসা, কবি আইনুন নাহার অথবা উর্দু লেখিকা রাহাত আরা প্রমুখ বিখ্যাত হয়েছেন। আধুনিক সাহিত্য চর্চায় উমরাতুল ফজল, সালমা চৌধুরী,

ফাহমিদা আমিন, শামসুন নাহার, বেগম মুশতারী শফি, সেলিনা শেলী, নাসরিন রহমান, মারলিন ক্লারা, সেলিমা সাবিহ, ফজিলাতুল কদর উল্লেখযোগ্য নারী ব্যক্তিত্ব। আয়শা সালাম, বিলকিস আজম জহির, মাসুদা নবী, ডেইজী মওদুদ, অপর্ণা খাস্তগীর প্রমুখ সাংবাদিকতায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আম্বিয়া খাতুন, কমুদিনী দাস, ড. ফাতেম সাদেক, শিপ্রা দত্ত, নুর জাহান বেগম চৌধুরী, আরতি সেন, অধ্যাপিকা খালেদা হানুম, অধ্যক্ষ মওলানা নুর জাহান আকবর, ভাষা সৈনিক প্রিন্সিপাল চেমন আরা প্রমুখ শিক্ষাবিদ চট্টগ্রামের নারী শিক্ষার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছেন। চট্টগ্রামের সংগীত জগতের বেলা খান, শিখা গুহ, মায়া চৌধুরী, শীলা মোমেন, উমা চৌধুরী, আমিন লায়লা, হৈমন্তী রক্ষিত মান, নিশিতা বড়ুয়া সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিল্পী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে সমাদৃত। পূর্ব বাংলায় নির্মিত প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নায়িকা পূর্ণিমা সেন গুপ্ত চট্টগ্রামের মেয়ে। পরবর্তীতে চট্টগ্রামের কবরী সরোয়ার, আফরোজা সুলতানা রত্না ওরফে শাবানা, ডালিয়া হানিফ রীতা ওরফে পূর্ণিমা, চিত্রলেখা গুহ, অঞ্জুঘোষ, খালেদা আক্তার কল্পনা সহ অনেকে বাংলাদেশে চলচ্চিত্রে অবদান রেখেছেন। ফ্যাশন আইকন বিবি রাসেল। বাংলাদেশের আইডল ভাস্কর নভেরা আহমেদ, বিখ্যাত পর্বতারোহী ওয়াসফিয়া নাজনীনসহ অনেক বিখ্যাত নারীর জন্মস্থান চট্টগ্রাম। সুতরাং প্রগতিশীল ধারাটিও চট্টগ্রামের সমাজ ব্যবস্থায় গতিশীল হয়েছে। আধুনিক শিক্ষিত ও বিজ্ঞান মনস্ক সমাজ এবং যুগোপযোগি শিক্ষা ব্যবস্থা রক্ষণশীল ধারাটিকে অতিক্রম করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের নারী শিক্ষা আরো কার্যকর ও সমাজকে গতিশীল করার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহও সুপারিশ করা যেতে পারে -

১. চট্টগ্রামে নারীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
২. নারীদের উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।
৩. নারীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে হোস্টেলের ব্যবস্থা করা।
৪. স্কুলগামী ছাত্রীদের যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং ইভটিজিং থেকে রক্ষা করা।
৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব যানবাহনের মাধ্যমে স্কুল-কলেজে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা।
৬. সহশিক্ষার স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের বৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গি দূর করতে হবে।
৭. আই.টি শিক্ষায় জোর দিতে হবে।
৮. প্রত্যেক থানা/উপজেলায় একটি নারী শিক্ষার স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৯. স্কুল ও কলেজে মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে নারীর মানসিক বিকাশে সহায়তা করতে হবে।
১০. স্কুল ও কলেজে আরো বেশি মহিলা শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

উপরোক্ত সুপারিশের আলোকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার আরো উন্নতি হবে বলে আমরা মনে করি। একুশ শতকের বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে শিক্ষিত কর্মক্ষম নারীকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। কর্মস্থলে নারীর নিরাপত্তা ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগাতে হবে। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর প্রাচ্যের রানী চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ। চট্টগ্রামের নারীদের কর্মমুখী আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্থনীতির গতিকে বেগবান করা যাবে। ২০৪১ সালে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ আমাদের স্বপ্ন। এ লক্ষ্যে অর্জনে চট্টগ্রাম তথা বাংলাদশের নারী সমাজের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ সরকারের জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভলাপমেন্ট গোল ২০৩০ অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করে নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে হবে। পুরুষের পাশাপাশি নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

পরিশিষ্ট-১

চট্টগ্রামের প্রথম নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠা: ১৮৭৮) এর প্রধান শিক্ষকের সাক্ষাৎকার।

১। আপনার নাম : শাহেদা আক্তার

বয়স: ৫০

পদবী/পেশা: প্রধান শিক্ষক, ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

জেলা শিক্ষা অফিসার (বান্দরবান, ২০০৯-২০১৩ইং)।

২। আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও অবস্থান কোথায় :

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম : দক্ষিণ বগাচতর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সীতাকুন্ড।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাম : কমরআলী ইউনিয়ন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, মিরসরাই।

কলেজের নাম : চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (এম.এসসি-পদার্থবিদ্যা)

৩। আপনি অধ্যয়নরত অবস্থায় কি কি সমস্যায় পড়েছেন?

উত্তর: কোন সমস্যায় পড়িনি

৪। কর্মস্থলে নারী হিসেবে কি কি বাধার সম্মুখীন হয়েছেন?

উত্তর: কোন সমস্যা হচ্ছে না।

৫। চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার সমস্যা কি কি বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর: মেয়েদের জন্য আরো বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৬। সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় কি হতে পারে?

উত্তর: মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশু সমান চোখে দেখতে হবে। বুঝতে হবে সবাই আমার সন্তান। তাদের একইভাবে বেড়ে উঠার অধিকার রাখতে হবে।

৭। নারী শিক্ষায় বাংলাদেশ সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ঠ বলে মনে করেন কী? এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি হতে পারে?

উত্তর: আমি মনে করি, বর্তমান সরকার অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়েছেন, যা নারী শিক্ষার বিশাল অবদান রাখছে। সরকার আরো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।

পরিশিষ্ট-২

থানা একাডেমিক সুপারভাইজারের সাক্ষাৎকার

১। আপনার নাম : ইয়াছমিন আক্তার

বয়স: ৩৫

পদবী/পেশা: থানা একাডেমিক সুপারভাইজার, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

২। আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও অবস্থান কোথায় :

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম : পাইন্দং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাম : পাইন্দং উচ্চ বিদ্যালয়, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। কলেজের নাম : বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস (অর্থনীতি), চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। আপনি অধ্যয়নরত অবস্থায় কি কি সমস্যায় পড়েছেন?

উত্তর: অনেক সময় পায়ে হেঁটে যেতে হত। স্কুলে দেরিতে পৌঁছায় পড়া বুঝতে কষ্ট হত। আর্থিক সমস্যাও থাকত।

৪। কর্মস্থলে নারী হিসেবে কি কি বাধার সম্মুখীন হয়েছেন?

উত্তর: অনেক সময় অফিস সময়ের চেয়েও বেশি সময় অন্যান্য দাপ্তরিক কাজে ব্যয় করতে হয়।

ফলে অফিস শেষে বাসায় ফিরতে রাত হয় এবং নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হয়।

৫। চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার সমস্যা কি কি বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর: পর্যাপ্ত সরকারি স্কুলের অভাব রয়েছে, চট্টগ্রাম মহানগরে মাত্র তিনটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। অভিভাবকগণ অনেক সময় আর্থিক সমস্যার ও যাতায়াতের অসুবিধার জন্য স্কুলে পাঠাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে।

৬। সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় কি হতে পারে?

উত্তর: ঢাকা মহানগরীর ন্যায় চট্টগ্রাম মহানগরীতেও আরো বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, হোস্টেল ব্যবস্থা, গাড়ীর ব্যবস্থা, আর্থিক সাহায্য বাড়ানো এবং কম্পিউটার ও অন্যান্য ল্যাব স্থাপন করা।

৭। নারী শিক্ষায় বাংলাদেশ সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ঠ বলে মনে করেন কী? এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি হতে পারে?

উত্তর: নারী শিক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপসমূহ অবশ্যই যথেষ্ট মনে করি। তাছাড়াও নারী শিক্ষার্থীর যাতায়াত ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ বাড়ানো প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং প্রত্যেক থান/উপজেলায় নারীর জন্য পৃথক স্কুল কলেজ স্থাপন করা।

পরিশিষ্ট-৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত নারী ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার

১। আপনার নাম : ড. পারভীন আক্তার

বয়স: ৪১ বৎসর

পদবী/পেশা: সহযোগী অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, চ.বি.।

২। আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও অবস্থান কোথায় :

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম : শহীদ ডা: মকবুল আহমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাম : চট্টগ্রাম সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

কলেজের নাম : চট্টগ্রাম সরকারী মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, Chinese Culture University, Gottingen University (Germany)

৩। আপনি অধ্যয়নরত অবস্থায় কি কি সমস্যায় পড়েছেন?

উত্তর: ইভটিজিং এর শিকার হয়েছি।

৪। কর্মস্থলে নারী হিসেবে কি কি বাধার সম্মুখীন হয়েছেন?

উত্তর: এখন পর্যন্ত হয়নি, তবে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারি না। ৫। চট্টগ্রামে নারী শিক্ষার সমস্যা কি কি বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর: পারিবারিক ও সামাজিক

৬। সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় কি হতে পারে?

উত্তর: প্রথমত পরিবার এই বিষয়ে অবদান রাখতে পারে। সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

৭। নারী শিক্ষায় বাংলাদেশ সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ঠ বলে মনে করেন কী? এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি হতে পারে?

উত্তর: যথেষ্ট মনে করি।

পরামশ: মনিটরিং করতে হবে, শিক্ষার মান তথা, বিদ্যালয়ের মান উন্নত করতে হবে। শক্তিশালী পরিবার গঠনে ভূমিকা রাখতে হবে।

পরিশিষ্ট-৪

উত্তর চট্টগ্রামের প্রথম মহিলা কলেজ, কাটিরহাট মহিলা কলেজে ১৯৮৬-১৯৮৭ সেশনে (প্রথম ব্যাচ) ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের নামের তালিকা

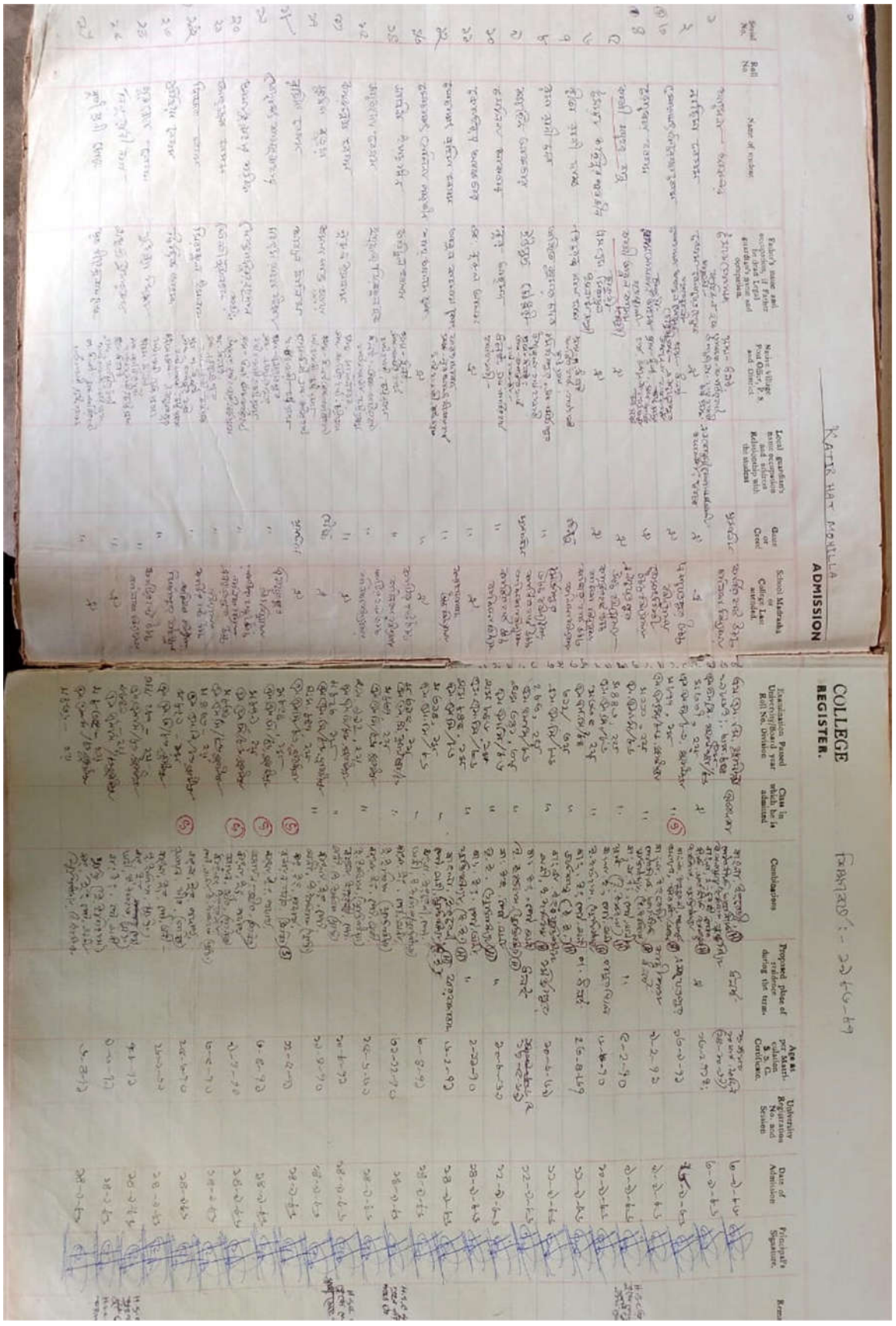

KATIR HAT MOHILA

ধিভাগ্যবর্ষ :- ১৯৮২-৮৩

ADMISSION COLLEGE REGISTER.

Serial No.	Roll No.	Name of student	Father's name and occupation, if Father be dead Legal guardian's name and occupation.	Native Village Post Office, P. S. and District	Local guardian's name occupation and address Relationship with the student	Caste or Creed	School Madrasha or College Last attended.	Examination Passed University/Board year Roll No. Division	Class in which he is admitted	Combinations	Proposed place of residence during the term.	Age as per Matriculation S. S. C. Certificate.	University Registration No. and Session	Date of Admission	Principal's Signature.

COLLEGE REGISTER. ADMISSION

Serial No. | Roll No. | Name of student | Father's name and occupation, if Father be dead Legal guardian's name and occupation | Native Village Post Office, P.S. and District | Local guardian's name occupation and address Relationship with the student | Caste or Creed | School Madrasha or College Last attended | Examination Passed University/Board year Roll No. Division | Class in which he is admitted | Combinations | Proposed place of residence during the term | Age as per Matriculation S.S.C. Certificate | University Registration No. and Session | Date of Admission | Principal Signature

সূত্র: কাটিরহাট মহিলা কলেজ, হাটহাজারী, চট্টগ্রামের অফিস থেকে প্রাপ্ত

পরিশিষ্ট-৫

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জনগণনা জরিপ (১৯৭৪)-এ চট্টগ্রামে শিক্ষার চিত্র

TABLE 6—LITERATES BY SEX: 1974-1961

(Subdivision/District/Division)

Locality	No. of Literates 1974 Both Sexes	1974 Male	1974 Female	1961 Both Sexes	1961 Male	1961 Female
1	2	3	4	5	6	7
76 **Noakhali District** ..	**7,04,366**	**4,93,570**	**2,10,796**	**4,51,809**	**3,41,015**	**1,10,794**
77 Chittagong Sadar (N) Subdivision	5,96,910	4,37,414	1,59,496	3,94,411	3,09,868	84,543
78 Chittagong Sadar (S) Subdivision	3,79,619	2,35,682	1,43,937	1,65,455	1,26,484	38,971
79 Cox's Bazar Subdivision ..	98,190	73,260	24,930	50,700	41,786	8,914
80 **Chittagong District** ..	**10,74,719**	**7,46,356**	**3,28,363**	**6,10,566**	**4,78,138**	**1,32,428**
81 Bandarban Subdivision ..	9,077	7,580	1,497	5,032	4,668	364
82 Rangamati Subdivision[1] ..	39,418	30,588	8,830	27,581	24,202	3,379
83 Ramgarh Subdivision[1] ..	29,356	22,766	6,590	12,268	11,109	1,159
84 **Chittagong Hill Tracts District**	**77,851**	**60,934**	**16,917**	**44,881**	**39,979**	**4,902**
85 CHITTAGONG DIVISION ..	**38,17,230**	**26,89,814**	**11,27,416**	**25,31,119**	**19,39,167**	**5,91,952**
86 **BANGLADESH** ..	**1,31,88.608**	**93,00,767**	**38,87,841**	**82,77,867**	**63,76,386**	**19,01,481**

See foot notes printed at the end of table 1.

Locality	Literacy Percentage 1974 Both Sexes	1974 Male	1974 Female	1961 Both Sexes	1961 Male	1961 Female	Variation of Literates over 1961 (In percentage) Both Sexes	Male	Female
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76 Noakhali District	**26·2**	**35·6**	**16·2**	**23·2**	**34·6**	**11·6**	**55·9**	**44·7**	**90·3**
77 Chittagong Sadar (N) Subdivision	31·8	42·2	19·0	30·8	43·5	14·9	51·3	41·2	88·7
78 Chittagong Sadar (S) Subdivision	35·0	41·9	27·6	21·6	32·3	10·4	129·4	86·3	269·3
79 Cox's Bazar Subdivision	15·0	21·3	8·0	11·6	18·3	4·3	93·7	75·3	179·7
80 Chittagong District	**29·7**	**38·5**	**19·6**	**24·6**	**35·9**	**11·5**	**76·0**	**56·1**	**148·0**
81 Bandarban Subdivision	9·2	14·3	3·2	6·9	12·0	1·1	80·4	62·4	311·3
82 Rangamati Subdivision	23·1	32·1	11·7	17·8	26·6	5·3	42·9	26·4	161·3
83 Ramgarh Subdivision	18·5	27·3	8·7	13·1	21·9	2·7	139·3	104·9	468·6
84 Chittagong Hill Tracts District	**18·2**	**26·3**	**8·6**	**13·9**	**22·1**	**3·5**	**73·5**	**52·4**	**245·1**
85 CHITTAGONG DIVISION	**24·5**	**32·9**	**15·2**	**22·6**	**33·1**	**11·0**	**50·8**	**38·7**	**90·5**
86 BANGLADESH	**22·2**	**29·9**	**13·7**	**19·9**	**29·3**	**9·6**	**59·3**	**45·9**	**104·5**

Source: Bangladesh Census of Population-1974, Bulletin-2

পরিশিষ্ট-৬

মাসিক বঙ্গনুর পত্রিকায় 'শিক্ষিতার উক্তি' নামক কবিতায় বিশ শতকে গোঁড়াপন্থীদের আধুনিক শিক্ষিত নারীকে ব্যঙ্গ করে লিখিত কবিতা

শিক্ষিতার উক্তি

মোহাম্মদ সুরত আলী,
ধামরাই, ঢাকা

ইংরাজী পড়িয়া হয়েছি শিক্ষিতা
রমণী পুরুষে না জানি ভিন্ন
পুরুষের কাজ করিয়া আমরা
যোগাড় করিব পেটের অন্ন
আমাদের মুখ দেখিলে তাহারা
পাবে কি চাকুরী পুরুষ জাত
রমণী কদর বুঝে ভাল তারা
দেখিলে অমনি বাড়ায়ে হাত।
শেক হ্যান্ড করি বসিব চিয়ারে
ফুলাইয়া বুক সম্মুখে তার
চলিবে তখন চায়ের পিয়ালা
সরাব মিশান লিমনেড আর
পুরুষের মুখ চাহিয়া ধরায়
থাকিব না আর আমরা কভু।
পাঁচটা বাজিলে অফিস হইতে
দুলিতে দুলিতে বাসায় গিয়ে
ছাড়িয়া কাপড় করি জলযোগ
ভ্রমণে যাইব বাহির হয়ে।
শিক্ষিত সমাজে মিশিব যাইয়া
নবীন সুন্দর যুবক দলে,
বুঝিবে তাহারা মনের যে ভাব
কহিব যাহা কে.শলে ও ছলে।
ইংরাজী পড়িয়া হয়েছি শিক্ষিতা
শিক্ষার যে গুণ বুঝেছি মোরা
বাছিয়ে বাছিয়ে বরণ কবির
মনের মতন সুন্দর ছোঁড়া।
বিয়ে না হতেই সঙ্গেতে তাহার
হাসিব খেলিব কহিব কথা
আহার-বিহার একত্র কবির

একত্র ভ্রমিব যথা ও তথা।

এমন যে সুখ এমন আনন্দ
এমন কে.তুক বিলাস ছাড়ি
থাকিব কি ঘরে আবন্ধ হইয়ে
পিঞ্জরে যথা পাখীটি পড়ি?
সুশিক্ষার স্রোত চলিছে যখন
ঘোমটা তখন বিদায় দিয়া
শ্বশুর আলয়ে যেতে হয় যদি
করিব না গিয়ে কোনই কাজ
যা কিছু যখন হবে দরকার
হুকুম করিব ত্যজিয়া লাজ।
রান্না বাড়া করা অসভ্যের কাজ
ফেলিয়া সে সব পড়িব পুঁথি
বাটনা বাটন কুটনা কোটন
সবার কপালে মারিব লাথি।
ঘর ঝাঁটি দেওয়া বর্ব্বরতার কাজ
ফেলে দিয়ে তাহা চিয়ারে বসি
বাজাইব বাজা হারমোনিয়াম
ভুলিয়া কলঙ্ক সরম রাশি।
শিক্ষিতা সমাজে চলিছে এসব
কলঙ্ক বালাই কিছুই নাই
বাগানে ও মাঠে বেড়াব খেলাব

যার সনে ইচ্ছা তার সনে যাই ॥

সূত্রঃ বঙ্গনুর, ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩২৭, পৃ.-৫১২১৪

পরিশিষ্ট-৭

চট্টগ্রামের নারী বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সম্পর্কে বেঙ্গল ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্সির রিপোর্ট

Miscellaneous Notices, including Deserters.

1 2

Reward, Rs. 50.

I. B., C. I. D., Bengal (Miss Prithi Waddadar—Reward for tracing of). The above reward is offered for the tracing of Miss Prithi Waddadar, whose photographs are published above. Photograph No. 1 was taken about 2 years ago when Miss Prithi was a student of the Dacca Eden Intermediate College and photograph No. 2 (sitting posture), which is a more recent one, was found at the time of the search of one Apurba Sen ..... Bhoia (since deceased), in connection with the Dhalghat shooting affray at Chittagong.

A special "look-out" should be kept for her and when traced, the I. B., C. I. D., Bengal, Calcutta, should be informed by wire. A close, though unobtrusive, surveillance should at the same time be kept on her movements.

Description Miss Prithi Waddadar, daughter of Jagabandhu Waddadar (Baidya by caste), of Dhalghat, Patiya and Jamat-khana, Chittagong town: age 20 21 (looks younger than her age); dark; medium build; short; ugly in appearance.

সূত্রঃ রেজিনা বেগমঃ রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী (১৯০৫-৪৭), ঢাকা, ২০১৬।

পরিশিষ্ট-৮

চট্টগ্রামের নারী বিপ্লবী কল্পনা দত্ত সম্পর্কে জেলা ইন্টেলিজেন্স অফিসারের রিপোর্ট

FILE NO: 285/28.

Copy of a Report dated 19.3.31 from a District Intelligence Officer (IV). - received with S.P. Chittagong Memo No. 697/10-31 dated 21st March 1931.

I beg to submit that I made confidential enquiries and came to learn as follows:-

Kalpana Datta is the daughter of Babu Benode Behari Datta, Sub. Registrar on leave, of Sripur, P.S. Boalkhali, district Chittagong and Anderkilla, Chittagong Town. She is the grand daughter of late Rai Durga Das Datta Bahadur. She is going to appear at the next I.Sc. examination from Chittagong after changing her centre from Bethune College. While a student of the Bethune College she is reported to have been living in the College Boarding. She came down to Chittagong about 3 months back, that is after her last examination. She is reported to be an expert in dagger and lathi play which she picked up at Calcutta as a means of defending her person against molestation. During the last Bethune College strike she is reported to have taken an important part, is also reported to be one whose ideals are to bring womanhood on the same level with manhood. Nothing more could be reported against her.

RA.
22/2/32.

FILE NO: 283/28.

Copy of letter No. 416/10-31 dated 25th Feb. 1931, from S.P. Chittagong.

One Kalpana Dutta, a female student of the Bethune College, Calcutta, has arrived at Chittagong intends to appear at the ensuing I.Sc. examination from the Chittagong centre. It is reported that this woman is acquainted with Surjya Sen and is an expert shot. It is also said that she may attempt to shoot one of the Europeans here, and that she is going to Calcutta shortly to bring up some gun cotton for Surjya Sen's party. I am keeping this person under watch but in the meantime I would like to know if you have anything on record in the I.B. or if anything is known against her.

RA.
22/2/32.

সূত্রঃ রেজিনা বেগমঃ রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী (১৯০৫-৪৭), ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৯০-২৯১।

পরিশিষ্ট-৯

সারণিসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.	বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রী সংখ্যা	২৯
২.	উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীদের শিক্ষার হার, ১৯০১	৩০
৩.	বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রসংখ্যা, ১৮৮১-৮২	৩২
৪.	বাংলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নারী অংশগ্রহণের পরিস্থিতি ১৯০১-১৯০৭	৪০
৫.	বাংলার হিন্দু ও মুসলিম নারীর স্বাক্ষরতার হার, ১৯২৭ খ্রি.	৪৪
৬.	বাংলার নারী সমাজে শিক্ষার প্রসার, ১৯১২-১৯৪১	৪৪
৭.	বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃদ্ধির ধারা	৬৩
৮.	প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী বৃদ্ধি ধারা	৬৪
৯.	বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষকের চিত্র	৬৬
১০.	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (২০০২)	৭০
১১.	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি ধারা	৭১
১২.	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বৃদ্ধি ধারা	৭২
১৩.	মাধ্যমিক শিক্ষক বৃদ্ধি ধারা	৭৩
১৪.	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইনস্টিটিউট, অনুষদ ও বিভাগ	৭৭
১৫.	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	৭৯
১৬.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ	৮১
১৭.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালসমূহে ইনস্টিটিউট, অনুষদ, বিভাগ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	৮৩
১৮.	সরকারি ও বেসরকারি (টিচিং) বিশ্ববিদ্যালয়ে বাৎসরিক ধারণ ক্ষমতা (২০০৪ সাল)	৮৫
১৯.	সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী তুলনা	৮৬
২০.	মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও শিক্ষার্থী	৮৯
২১.	মাদ্রাসা বৃদ্ধির ধারা	৯০

২২.	বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেয়ে শিক্ষার্থী	৯৬
২৩.	প্রাথমিক শিক্ষায় গমনোপযোগী বয়সের শিশুদের অংশগ্রহণ হার	৯৭
২৪.	মাধ্যমিক স্তরে (ষষ্ঠ-দশম শ্রেণী) বালক ও বালিকা শিক্ষার্থী অনুপাত	৯৮
২৫.	মাধ্যমিক স্তরে সমাপন ও ঝড়ে পড়ার হার	৯৯
২৬.	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও ছাত্রী সংখ্যা	১০০
২৭.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত	১০২
২৮.	মাদ্রাসা শিক্ষার স্তর বিন্যাস ও শিক্ষার্থী	১০৩
২৯.	মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত	১০৩
৩০.	শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক সংখ্যা	১০৫
৩১.	মিশনারি স্কুল ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১৩৬
৩২.	চট্টগ্রামে শিক্ষার অগ্রগতি (৫ বৎসরের উর্ধ্বে)	১৫৬
৩৩.	চট্টগ্রাম জেলায় ৫ বছর উর্ধ্বে শিক্ষার হার (১৯৬১-২০০১)	১৫৭
৩৪.	২০০১ সালে ৫ থেকে ২৪ বৎসরে ছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিতির হার	১৫৮
৩৫.	ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বোচ্চ ক্লাসে উত্তীর্ণ (১৯৯১ ও ২০০১)	১৫৯
৩৬.	ছেলে-মেয়ে স্কুলে গমণের বয়স ও সংখ্যা, ২০০১	১৬০
৩৭.	চট্টগ্রাম জেলার উপজেলা/থানা ওয়ারি শিক্ষার হার (সাত বৎসরের উর্ধ্বে)	১৬১
৩৮.	সংসদে অভিজ্ঞ নারী সাংসদদের উপস্থিতি	১৭২
৩৯.	চট্টগ্রামের সংরক্ষিত মহিলা আসনে নারী সংসদ সদস্য (১৯৭৩-২০০০সাল)	১৭৩

গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রাথমিক উৎসঃ

Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics 1999.

Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics 1995 and 1999.

Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, 2004.

Bangladesh Bureau of Statistics, *Bangladesh Population Census*, *1991*, Zilla Chittagong, Dhaka, 1992.

Bangladesh Bureau of Statistics, *Statistical Pocket Book Bangladesh 2000,* Dhaka, 2002.

Bangladesh Bureau of Statistics, *Bangladesh Population Census*, *2001,* Dhaka, 2009.

C.G.H. Allen, *Final Report of the Survey and settlement of the District of Chittagong,* Calcutta, 1900.

Calcutta University Calendar, 1911.

Census of India, 1902.

Educational Institutional Survey (Post-Primary), 2003, *BANBEIS, 2004*.

F.D. Ascoli, *Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report*, Oxford, 1917.

General Report on Public Instruction in Bengal Presidency 1880-81, Calcutta, 1881.

General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency 1844-45, Calcutta, 1945.

General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency 1844-45, Calcutta, 1845.

Govt. of Bengal, *Quinquenial Report of the Chittagong Madrasha, 1927-1932*.

H. Sharp, *Selection from Education Records, Part I, 1781-1839*, Calcutta, 1920.

Hundred Years of the University of Calcutta, University of Calcutta, 1957.

Primary Education Statistics in Bangladesh, 2001, DPE, 2002.

Primary Education Statistics in Bangladesh, 2001, DPE, 2002.

Proceedings of the Female Education Commission, Eastern Bengal and Assam, 1909.

R.H.S. Hutchinsen, *East Bengal and Assam District Gazetters Chittagong Hill Tracts*, Allahabad, 1909.

Report of the Calcutta School Society, 1819-1833, Calcutta, 1834.

Report of the General Committee of Public Instruction of the Presidency of Fort William in Bengal, 1835-36.

Report on Public Instruction in Bengal 1924-25, Calcutta, 1926.

Reports on Public Instruction in Bengal 1912-13, Calcutta, 1914.

Secondary Education in Bangladesh, A Sub-sector study, Report MoE 1992 and BANBEIS 2003.

Statistical Year Book 1975.

Statistical Year Book 1986.

T.G. Geddes: *Report on Chittagong Tenures*, Calcutta, 1868.

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন (২০০৫)।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ এবং জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩ প্রতিবেদন।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ১১ জুলাই, ২০১৮।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪), ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন, ২০০৩, ঢাকা (প্রকাশিত মার্চ, ২০০৪)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রস্তাবিত আই.ডি.এ প্রাথমিক শিক্ষা রিপোর্ট, ঢাকা, ১৯৭৮।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ঢাকা, ১৯৭৪।

শিক্ষাবার্তা, ঢাকা, ২০০১।

ব্যানবেইস, নভেম্বর, ২০০৩ (প্রকাশিত মার্চ, ২০০৪)।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন, ২০০৩, ঢাকা, ২০০৪।

জাতীয় শিক্ষা জরিপ (পোস্ট প্রাইমারি) রিপোর্ট, ব্যানবেইস, ২০০০।

জাতীয় শিক্ষা জরিপ (পোস্ট প্রাইমারি রিপোর্ট), ব্যানবেইস, ২০০০।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪), ঢাকা।

শিক্ষাবার্তা, ঢাকা, ২০০১।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৫।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন, ২০০৩।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৫।

এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশান সার্ভে (পোস্ট প্রাইমারি)-২০০৩, ব্যানবেইস, ২০০৪।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৪ এবং *জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-২০০৩*।

২. স্মারক গ্রন্থঃ

গৌররে ১০০ বছর উদ্‌যাপন স্মারক ২০১৩, হাটহাজারী পাবর্তী উচ্চ বিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

১৭৫ বছর পূর্তি স্মারক গ্রন্থ, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট, ডিসেম্বর, ২০১১।

চট্টগ্রাম সমিতির ২৫ বছর পূর্তি সংখ্যা, চট্টল শিখা, ২০০৩, চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা, ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৩।

'*প্রতিভাস*' কলেজ বার্ষিকী-২০০৬, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, জুন ২০১৬।

সরওয়ার জাহান (সম্পাদিত): *দখিনা*, চট্টগ্রাম, আগস্ট, ২০১৬।

আজকের প্রজন্ম, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, ২০০০।

'*অন্বেষা*', *চট্টগ্রাম কলেজ বার্ষিকী*, '০৭, চট্টগ্রাম কলেজ, ২০০৮।

'*মনীষা*', *পশ্চিম বাঁশখালী উপকূলীয় ডিগ্রী কলেজ*, চট্টগ্রাম, ২০০৫।

কলেজিয়েট ১৮০, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, ১৮০ বছর পূর্তি স্মারক গ্রন্থ, চট্টগ্রাম, ২০১৬।

শতবর্ষে চট্টগ্রাম সমিতি, চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা, ঢাকা, ২০১১।

ডা: খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ১০০ বৎসর পূর্তি স্মারক গ্রন্থ, চট্টগ্রাম, ২০০৭।

ডা: খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ১১১ বৎসর পূর্তি স্মারক গ্রন্থ, চট্টগ্রাম, ২০১৯।

চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ ১৫০ বছর স্মারক গ্রন্থ, চট্টগ্রাম, ২০১৯।

মোয়াজ্জেমুল হক, স্বপ্নের ফেরিওয়ালা (এ.বি. মহিউদ্দিন চৌধুরীর আত্মজীবনী), চট্টগ্রাম, ২০০৫।

৩. দ্বৈতীয়িত উৎস (ইংরেজি):

A.F Salauddin Ahamed and Bazlul Mobin Chowdhury (ed.), *Bangladesh National Culture and Heritage, An Introductory Reader*, Dhaka, 2004.

A.F Salauddin, *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835*, Calcutta, 1976.

A.F.A Husain, *Employment of Middle Class Muslim Women in Dhaka*, Dhaka, 1958.

A.J. Arberry, *Sufism, an Account of the Mystics of Islam*, London, 1963.

A.R Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal 1857-1856*, Dacca, 1977.

Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, Dacca, 1963.

Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal (Down to A.D 1538)*, Dacca, 1967.

Abdul Momin Chowdhury, *Dynastic History of Bengal (C 750-1200)*, Dacca, 1967.

Abhay Charan Das, *The Indian Rayot, Land Tax, Permanent Settlement and the Famine*, Howran, 1881.

Ahmed Hassan Dani, *Dacca-A Record of the Changing Fortunes*, Dacca, 1956.

Ain O Salish Kendro, *Human Rights in Bangladesh 1998*, Dhaka, 1999.

Akther Hamid Khan, *The Role of Women in a Country's Development*, Comilla, 1963.

Alamgir Muhammad Serajuddin, *The Revenue Administration of the East India Company in Chittagong, 1761-1785*, Chittagong, 1971.

B.B Kling: Partner in Empire, *Dwarkanath Tagore and the Age of Enterprise*, Berkeley.

B.D Bhatt: *Educational Documents in India (1831-1965)*, New Delhi, 1969.

C. Rover, Love: *Morals and the Feminists*, London, 1970.

D.P Sinha, *The Educational Policy of the East India Company in Bengal to 1854*. Calcutta, 1964.

Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, Calcutta, 1931.

Dipak Kumar Aich, *Emergence of Modern Bengal Elite*, Calcutta, 1995.

Dr. A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Dacca, 1956.

Dr. Percival Spear, *India, Pakistan and the West*, London, 1952.

Ellen Sattar, *Universal Primary Education in Bangladesh*, UPL, Dhaka, 1982.

F.E. Keay, *A History of Education in India and Pakistan*, London, 1964.

Farah Deeba Chowdhury, *Women's Political Participation in Bangladesh,* An Empirical Study, Dhaka, 2013.

Ferdous Azim: *Infinite Variety, Women in Society and Literature*, Dhaka, 1994.

H. Dodwell, *Dupleix and Clive*, London, 1920.

H.A Stark, *Vernacular Education in Bengal from 1813-1912*, Calcutta, 1916.

Hamid Ullah Khan Bahadur, *Ahadith Al Khawanin*, Calcutta, 1871.

Hamida Begum A. Najma Chowdhury, Jahanara Huq, Salma Khan and Rashna Chowdhury K. (ed.), *Women and National Planning in Bangladesh*, Dhaka, 1990.

Hamish Hamilton, *Benazir Bhutto, Danghter of the East*, London, 1988.

J.C Marshman, *Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. II,* London, 1859.

J.J.A Campos, *The History of the Portuguese in Bengal*, Calcutta and London, 1919.

J.N Sarkar, *India Through the Ages,* Calcutta, 1979.

J.P Naik and S. Nurullah, *A History of English Education in India*, Bombay, Macmilan and Co. Ltd., 1951.

Jogesh Chandra Bagal, *Women's Education in Eastern India*, Calcutta, 1956.

Jogesh Chandra Bagal, *Women's Education in Eastern India*, Calcutta, 1956.

John Clarke Marshman, *The Life and Times of Carey Marshman and Ward,* etc, Vol. II, Langman, 1859.

John Clive Macaulary, *The Shaping of the Historian*, New York, 1973.

K.K Aziz (ed.), *Ameer Ali: His Life and work*, Lahore, 1968.

Kalikinkar Datta, *Alivardi and His Times*, Calcutta, 1939.

M.A Rahim, *Social and Cultural History of Bengal, Vol-II, (1576-1757)*, Karachi, 1967.

M.K.D. Molla, *The New Province of Eastern Bengal and Assam 1905-1911*, Rajshahi, 1981.

M.N Roy, *India in Transition*, Calcutta, 1941.

Mahabubul Haq, *Chittagong Guide*, Chittagong, 1981.

Mohammad Enamul Haq, *A History of Sufism in Bengal*, Dacca, 1975.

Muhammad Mahor Ali, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities (1833-1857),* Chittagong, 1965.

Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal*, Riadh, 1985.

N. Mukharji, *A Bengal Zamindar: Jaykrisna Mukharji to Uttarpara and His Times,* Calcutta, 1974.

Nizam Ahmed, *From Monopoloy to Competition: Party Politics in the Bangladesh Parliament (1973-2001)*, Pacific affairs 76: 1, 2003.

P.J Hartog, *Some Aspects of Indian Education: Past and Present*, London, 1939.

Primary Education Statistics in Bangladesh, 2001, DPE, 2002.

R. Strachy, *The cause*, New York, 1969.

R.C Dutta, *Economic History of India Under Early British Rule*, London, 1906.

Ramesh Chandra Majumder (ed.), *History of Bengal*, Vol. I, Dacca, 1943.

Richard M. Eaton, *India's Islamic traditions, 711-1150*, Oxford University Press, New Delhi, 2006.

Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics: Problem and Issues*, Dhaka, 1987.

Rounaq Jahan, *Pakistan, Failure in National Integration*, New York, 1972.

Rounaq Jahan, Women in South Asian Politics, Third world Quarterly, 9.3, July, 1987.

S. Bhattacharya, *Dictionary of Indian History*, Calcutta, 1992.

S.K De, *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century*, Calcutta, 1919.

S.K Dey, *History of Bengal Literature in the Nineteenth Century*, Calcutta, 1919.

S.N.R Rizvi, *Bangladesh District Gazetters*, Chittagong, 1975.

Salma Khan, *The Fifty Percent: Women in Development and Policy in Bangladesh,* Dhaka, 1988.

Shamima Hamid, *Why Women Count: Essays in Women in Development in Bangladesh*, Dhaka, 1996.

Shamsul Hossain, *Art and vintage*, Chittagong, 1988.

Sohrab Ali Khan Arzoo (ed.), *Towards Equality: An Impact study on Gender,* Dhaka, 1997.

Sonia Nishat Amin, *The Early Muslim Bhadramahila*, Bharati Ray (ed.): *From the seams of History Essay on Indian Women*, Oxford University Press, 2001.

Sukumar Sen, *History of Bengali Literature*, New Delhi, 1971.

Suniti Bhushan Qanungo, *A History of Chittagong*, Chittagong, 1988.

Syed Ahmadul Haq, *History of Chittagong*, 1948.

Syed Mahmood, *A History of English Education in India,* Aligarh, 1895.

Syed Murtaza Ali, *History of Chittagong*, Dacca, 1964.

T.B Macauley, *Minutes on Indian Education*, Calcutta, 1835.

T.C Dasgupta (ed.), *Aspects of Bangalee Society*, Calcutta, 1939.

T.G. Geddes, *Report on Chittagong Tenures*, Calcutta, 1868.

T.W Beale, *An Oriental Biographical Dictionary*, London, 1894.

Tahaziba Khatun, *Women's Education and Home Development Programme*, Comilla, 1974.

Thomas Costs, *Beyond Empowerment: Changing Power Relations in Rural Bangladesh,* Dhaka, 1999.

W.W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol: VI, London, 1876, Reprint, Delhi, 1973

W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal, Vol. IV*, London, 1878, Reprint Delhi, 1973.

W.W. Hunter, *The Indian Mussalmans, Reprinted*, Lahore, 1964.

৪. দ্বৈতীয়িত উৎস (বাংলা):

মোহাম্মদ যাকারিয়া আবুল কালাম, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* ঢাকা, ১৯৮৪।

মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *হাজার বছরের চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫।

আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, চট্টগ্রাম, ১৯৭৬।

আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি*, চট্টগ্রাম, ১৯৮০।

আবদুল হক চৌধুরী, *বন্দর শহর চট্টগ্রাম*, ঢাকা, ১৯৯৪।

আবদুল হক চৌধুরী, *শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা*, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫।

আহমদ শরীফ, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ*, ঢাকা, ১৯৮৭।

আহমদ শরীফ, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, ঢাকা, ২০০১।

আম্বিকা চৌধুরী, *চট্টলা*, কলকাতা, ১৯৭৭।

এ.বি.এম ছিদ্দিক চৌধুরী, *শাশ্বত সন্দ্বীপ*, চট্টগ্রাম, ১৯৮৮।

এম.নুরুল হক, *বৃহত্তর চট্টলা*, চট্টগ্রাম, ১৯৭৭।

এস.এম.এ.কে. জাহাঙ্গীর, *পটিয়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, চট্টগ্রাম, ১৯৯৪।

ওয়াকিল আহমদ, *মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, ঢাকা, ১৯৬৮।

কাযী আযিয উদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত), *প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম স্মারক গ্রন্থ*, চট্টগ্রাম, ১৯৯১।

তারক চন্দ্র দাশ গুপ্ত, *চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত*, চট্টগ্রাম, ১৮৯৭।

নবীন চন্দ্র সেন, *আমার জীবন, ৫ খন্ড*, কলিকাতা, ১৯০৭-১৯১৩।

নূর মোহাম্মদ রফিক, *খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরী*, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার, *বীরকন্যা প্রীতিলতা*, চট্টগ্রাম, ১৯৭০।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭।

বি.এ আজাদ ইসলামাবাদী (সম্পাদিত), *চট্টগ্রাম স্মরণী*, চট্টগ্রাম, ১৯৮৭।

বেগম মুশতারী শফি, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম, ১৯৯২।

মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস কোম্পানী আমল*, চট্টগ্রাম, ১৯৪৭।

মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫।

মাহবুব উল আলম, *বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত, ৪ খন্ড*, চট্টগ্রাম, ১৯৭৩।

মাহবুব হাসান (সম্পাদিত), *চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, চট্টগ্রাম, ১৯৯১।

মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত*, ঢাকা, ১৯৭৭।

শামসুজ্জামান খান, *একুশের স্মারক গ্রন্থ '৮৭*, ঢাকা, ১৯৮৭।

শামসুজ্জামান খান, *একুশের স্মারক গ্রন্থ '৮৮*, ঢাকা, ১৯৮৮।

শামসুল আলম সাঈদ, *চট্টগ্রামের মানস সম্পদ*, চট্টগ্রাম, ১৯৯১।

শামসুল আলম সাঈদ (সম্পাদিত), *বিপ্লবের মহানায়ক মাস্টারদা সূর্যসেন*, চট্টগ্রাম, ১৯৯৪।

সুকোমল চৌধুরী, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শোর বছর*, কলিকাতা, ১৯৬১।

সৈয়দ আহমদুল হক, *চট্টগ্রামের শিল্প বাণিজ্য*, চট্টগ্রাম, ১৩৯৫, বঙ্গাব্দ।

ড. হরিসাধন গোস্বামী, *ভারতের শিক্ষার ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৮৯।

অধ্যাপক শ্যামা প্রসাদ চট্টরাজ, *ভারতের শিক্ষার ইতিহাস*, কলিকাতা, ২০১৬।

আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *দৌলত উজীর বাহরাম, লায়লী*, মজনু, ঢাকা, ১৯৫৫।

সুপর্ণা গুপ্ত (সম্পাদিত), *ইতিহাসে নারী: শিক্ষা*, কলকাতা, ২০১৪।

কৃষ্ণ দাশ কবিরাজ, *চৈতন্য চরিতামৃত*, কলিকাতা, ১৩৬১।

দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৯০১।

দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়*, কলিকাতা, ১৯১৪।

সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, ১৯৪৮।

আহছান উল্লাহ, *বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৮৩।

কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, কলিকাতা, ১৩৬৩।

গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, ঢাকা, ২০১৩।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ১ম খন্ড, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১।

মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, *বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি ১৮৮৫-১৯২১*, ঢাকা, ২০০৪।

যোগেশ চন্দ্র বাগল, *ডিরোজিও*, কলিকাতা, ১৯৭৬।

সুনীল কুমার চ্যাটার্জী, *বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরি ও তাঁর পরিজন*, কলিকাতা, ১৯৭৪।

যোগেশ চন্দ্র বাগল, *বাংলার উচ্চ শিক্ষা*, কলকাতা, ১৩৬০।

মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, ঢাকা, ২০০৮।

বিনয় ঘোষ: *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, ঢাকা, ২০০০।

অনাথ নাথ বসু, *আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা*, কলকাতা, ১৩৫১।

গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণী*, ঢাকা, ২০১৬।

রাজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, দুই খন্ড, কলকাতা, ১৯৭১-৭৭।

আনোয়ার হোসেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১*, কলকাতা, ২০১৪।

আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর*, ঢাকা, ১৯৬৯।

মুহাম্মদ জাকারিয়া খান, *বাংলাদেশের নারী শিক্ষায় জন এলিয়ট ড্রিংক ওয়াটারের ভূমিকা*, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৩৯৪।

ঋষি দাশ, *বিদ্যাসাগর*, কলিকাতা, ১৯৭১।

রাধা রমন মিত্র, *কলিকাতায় বিদ্যাসাগর*, কলিকাতা, ১৯৭৭।

মুহাম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত), *ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ*, ঢাকা, ১৩৬৯।

মন্মথ নাথ ঘোষ, *কর্মবীর কিশোরী চাঁদ মিত্র*, কলকাতা, ১৯২৭।

Dhaka University Institutional Repository

চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়, *বিদ্যাসাগর*, কলকাতা, ১৩৭৬।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *মানকুমারী বসু*, কলকাতা, ১৯৬২।

গোলাম মুরশিদ, *হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাট্য রচনা*, কলকাতা, ২০১৪।

অমলেন্দু দে, *বাঙালি বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, কলিকাতা, ১৯৭৪।

বিনয় ভূষণ রায়, *অন্ত:পূরে স্ত্রী শিক্ষা*, কলকাতা, ১৯৯৮।

বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা, ১৯৮৪।

লায়লা জামান, *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা*, ঢাকা, ১৯৮৯।

খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ, সমাজচিন্তা ও সাহিত্য কর্ম*, ঢাকা, ২০১৫।

বেগম রওশন আরা, *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, ঢাকা, ১৯৯৩।

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৪।

মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চট্টগ্রাম, ১৩৮৯।

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, ঢাকা, ১৯৮৫।

গোলাম মুরশিদ, *রাস সুন্দরী থেকে রোকেয়া*, ঢাকা, ১৯৯৩।

শাহিদা খাতুন ও মাহবুব আজাদ (সম্পাদিত), *রবীন্দ্র অভিভাষণ পূর্ববঙ্গ ও অন্যত্র*, ঢাকা, ২০১২।

তাহমিনা আখতার, *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, ঢাকা, ১৯৯৫।

আরতি গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসে নারীর ভূমিকা ও সংগ্রাম*, কলিকাতা, ১৯৯২।

ফরিদা আখতার (সম্পাদিত), *শত বছরে বাংলাদেশের নারী*, ঢাকা, ১৯৯৯।

আনিসুজ্জামান, *বাঙালি নারী, সাহিত্য ও সমাজে*, ঢাকা, ২০০০।

হাসিনা আহমেদ (অনুদিত), *বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য*, ঢাকা, ১৯৮৯।

এম.এ. জামান, *কিশোর কিশোরী উন্নয়ন ধারণা*, ঢাকা, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

হেনা দাস, *নারী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা*, ঢাকা, ১৯৯৯।

নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, *নারীর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা: প্রাথমিক শিক্ষার আলোকে পর্যালোচনা*, ঢাকা, ১৯৮৬।

মালেকা বেগম, *নারী মুক্তি আন্দোলন*, ঢাকা, ১৯৮৯।

ফেরদৌস সুলতানা বেগম, *নারী পুরুষ সম্পর্ক ও উন্নয়ন রিপোর্ট*, ঢাকা, ১৯৯৮।

আনশী বিয়াজ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নারী, চারদিক*, ঢাকা, ১৯৯৫।

শওকত আরা হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঢাকা, ১৯৯৯।

জাহানারা হক, হামিদা আখতার বেগম (সম্পাদিত), *নারী ও গণমাধ্যম*, ঢাকা, ১৯৯৭।

এম.এম. এমরান চৌধুরী, *মীরসরাই'র ইতিহাস*, ঢাকা, ২০০৪।

কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, কলকাতা, ২০১০।

শতদল বড়ুয়া, *চট্টগ্রাম মহানগরীর ইতিহাস, ঐতিহ্য*, চট্টগ্রাম, ২০০৬।

মুহাম্মদ সিরাজুল হক চৌধুরী, *প্রাচ্যের রাণী চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম, ২০০৭।

জামাল উদ্দীন ও শরীফা বুলবুল (সম্পাদিত), *চট্টগ্রামের নারী লেখক*, চট্টগ্রাম, ২০০৫।

আবদুল করীম, *সমাজ ও জীবন*, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, চট্টগ্রাম, ২০০৮।

ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামে শিক্ষা সাধনা*, চট্টগ্রাম, ১৯৮৪।

জামাল উদ্দীন ও শরীফা বুলবুল (সম্পাদিত), চট্টগ্রামের নারী লেখক, চট্টগ্রাম, ২০০৫।

আনোয়ার হোসেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১, কলকাতা, ২০১৪।

ভারতী রায়, স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলাদেশের নারী জাগরণ (১৯১১-২৯), রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী (সম্পাদিত), ভারত ইতিহাসে নারী, কলকাতা, ১৯৮৯।

শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক (সম্পাদিত), জানানা মাহফিল, কলকাতা, ১৯০০।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ বদিউল আলম (সম্পাদিত), চট্টল শিখা, চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকার ২৫ বছর পূর্তির বিশেষ সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৩।

অদিতি ফাল্গুনী, বাংলার নারী সংগ্রামী, ঢাকা, ১৯৯৭।

কমলেশ দাস গুপ্ত, প্রাচীন চট্টগ্রাম ও সেকালের হিন্দু সমাজ, চট্টগ্রাম, ২০১৮।

বীনা দাস, শৃঙ্খল ঝংকার, কলিকাতা, নতুন সংস্করণ, ২০১৩।

রোজিনা বেগম, রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী (১৯০৫-৪৭), ঢাকা, ২০১৬।

চিন্ময় চৌধুরী, স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী নারী, কলকাতা, ১৯৯৮।

মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৮৯।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রেক্ষাপট ও ঘটনা, ঢাকা, ২০০৯।

ডা: মাহফুজুর রহমান, বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩।

মেজর রফিকুল ইসলাম পি.এস.সি, মুক্তিযুদ্ধ ও বুদ্ধিজীবি, ঢাকা, ১৯৯২।

আল মাসুদ হাসানউজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের নারী, বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ঢাকা, ২০১৩।

এ.এস.এম. শামছুল আরেফিন (সম্পাদিত), বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭০-২০০১, বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩।

চট্টগ্রাম সমিতির ১০০ বছর পূর্তি স্মারক গ্রন্থ 'শতবর্ষে চট্টগ্রাম সমিতি', চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা, ঢাকা।

সৈয়দা রওশন কাদের, ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্যদের ভূমিকা, ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৭।

ফরিদা আক্তার (সম্পাদিত), সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন প্রসঙ্গে, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ খালেদ (সম্পাদিত), *হাজার বছরের চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫।

ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামে শিক্ষা সাধনা*, জুলাই, ১৯৮৪, চট্টগ্রাম।

ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, জুলাই, ১৯৮২, চট্টগ্রাম।

কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১।

আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৭।

এ.এন রাশেদা (সম্পাদিত), *পঁচিশ বছরের শিক্ষা ব্যবস্থার দর্পণ*; সম্পাদকীয় *শিক্ষাবার্তা*, প্রথম খন্ড, ঢাকা, ২০১৬।

আল মাসুদ হাসানুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩।

অরুণ ঘোষ ও সুশীল রায়, *শিক্ষা বিজ্ঞান*, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৭।

মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, *সুশিক্ষক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩।

আজহার আলী ও অন্যান্য, *শিক্ষার ভিত্তি*, ঢাকা, ২০০৪।

আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০০৭।

ড. কামরুন্নেছা বেগম ও সালমা আকতার, *প্রাথমিক শিক্ষা: বাংলাদেশ*, ঢাকা, ২০০০।

মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, *মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা:* ঢাকা, ২০১৩।

আবু নাছের টিপু, *শিক্ষা সংস্কারের দুইশ বছর*, ঢাকা, ২০১৭।

আব্দুল মালেক ও অন্যান্য, *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ২০০৭।

ড. হাসান মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা*, ঢাকা, ২০০৪।

মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা, ১৯৯৯।

আবু হামিদ লতিফ, *বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা*, ঢাকা, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

৫. পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

দৈনিক আজাদী

দৈনিক পূর্বকোণ

দৈনিক জনকণ্ঠ

দৈনিক প্রথম আলো

দৈনিক যুগান্তর

দেশপ্রিয় (সাপ্তাহিক)

যুগধর্ম (সাপ্তাহিক)

সীমান্ত (মাসিক)

সাধনা (মাসিক)

মোহাম্‌দী (মাসিক)

দেশ (মাসিক)

মাসিক মোহাম্মদী

বামাবোধিনী পত্রিকা

নবনূর

The Daily Star

The Daily Independent

The Daily Bangladesh Observer

The New Nation

Dhaka University Institutional Repository

৬. Journal (জার্নাল)

ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা

বাংলা একাডেমি পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

Journal of Chittagong University Studies

Journal of Pakistan Historical Society.